ম্যাক্সিম গোর্কি

আমার ডায়েরি থেকে

অনুবাদ ও সম্পাদনা

সুশীল জানা

★

॥ পরিবেশক ॥

বুক মার্ক

প্রকাশক :
আনন্দ অধিকারী ;
৪৯এম, সুইন্‌হো লেন
কলকাতা-৪২ ।

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

প্রচ্ছদ শিল্পী : সৃজন সেন ।

মুদ্রক :
কালান্তর প্রেস ; ৩০/৬,
কলকাতা-১৭ ।

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ : ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও ।

গোর্কির স্মৃতি-শতবার্ষিকীর
শ্রদ্ধার্ঘ

সূচীপত্র

অর্ধশতাব্দীর যাত্রাপথে

অর্ধশতাব্দী কাটিয়ে দিলেম এই ধরনের সব মানুষগুলির মধ্যে।

আমি আশা করি, এ বইতে আমার তেমন প্রমাণ যথেষ্ট আছে যে, সত্যকে আমি এড়িয়ে যাইনি—এবং তাকে আমার এড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছেও হয়নি। আমার অবশ্য মনে হয়, কি বিস্তারে আর কি সর্বাঙ্গীন বর্ণনায় সত্যের ততোটা প্রয়োজন নেই,—যাকে নাকি সত্য কল্পনা করেই মানুষে আনন্দ পায়। সেই সব সত্য, যা নিষ্ঠুরভাবে আত্মাকে আঘাত করে এবং শেখায় না কিছুই; মানুষকে অবনমিত করে অথচ তাকে বোঝবার মতো কোনো বিশ্লেষণই উপস্থিত করে না, আমি তাকে বর্জন করাই ভালো মনে করেছি।

সুদৃঢ় প্রত্যয়েই আমি বলতে পারি—এমন সব সত্য আছে যাকে আর মনে না আনাই ভালো। সেই সব সত্যের জন্ম মিথ্যার মধ্যে এবং বিষাক্ত অসত্যের উপকরণ দিয়ে তা গড়ে উঠেছে। তা বিকৃত করে দেয় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, জীবনকে করে তোলে নরক, নোংরা এবং অসঙ্গত। সেগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্মূল হয়ে যাওয়াই ভালো—তাকে মনে গেঁথে রাখার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে মানব সমাজের? জীবনের কুৎসিত জিনিসগুলোকে ধরে রাখার এবং মেলে ধরার কাজ একটা নোংরা দায়িত্ব।

প্রথমে আমার মনে হয়েছিল এ বইটার নাম রাখি—**The Book of Russians as they have been** (রুশ জীবন—তারা যেমন)। পরে মনে হয়েছিল ওটা বড় ভাবগম্ভীর শোনায়। এই সব মানুষগুলি অন্য রকম হয়ে উঠুক,—এ আমি আন্তরিক ভাবেই কামনা করি। আবেগমূলক অন্যান্য ব্যাধি আমার কাছে যতই অগ্রহনীয় হোক—আমার চোখে রাশিয়ার এই মানুষগুলি বিশেষভাবে, অবিশ্বাস্য ভাবে, নানা গুণে গুণী এবং অসাধারণ। এ বুঝতে আমার ভুল হয় নি। এমন কি, রাশিয়ার নির্বোধ মানুষগুলোও অদ্ভুত এক ধরনের নির্বোধ তাদের আপন আপন বৈশিষ্ট্যে—ঠিক যেমন এক এক ধরনের অলস মানুষের নিজস্ব এক এক ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকে।

আমার মনে হয়, এই বিস্ময়কর মানুষগুলি যখন তাদের ভোগ করা পীড়নের

দিনগুলোকে অতিক্রম করে এসেছে ও সমস্ত যন্ত্রণা থেকে নিজেদের মুক্ত করে ফেলেছে এবং মনে ধাঁধা লাগিয়ে দেয় এমন পরিপূর্ণ এক সাংস্কৃতিক চেতনা—শ্রমের সম্মিষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ চেতনা নিয়ে সুরু করে দিয়েছে কর্মযজ্ঞ—যা নাকি সমগ্র পৃথিবীকে এক সূত্রে গেঁথে তুলছে, এবার সুরু হবে তাদের কল্প-কথার সেই বীরত্বপূর্ণ জীবন। বহু যুদ্ধে অবসিত, বহু অপরাধে উন্মত্ত প্রায় এই পৃথিবীটাকে তারা নানা দিক থেকেই করে তুলবে আলোকোজ্জ্বল।

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ অভিজ্ঞ পর্যটক

পশ্চিমে মেঘের দল তখন নীল আর কমলালেবু রঙে স্পষ্টত রঙীন হয়ে উঠছিল। ঝাঁকড়া পাইন গাছের মাথার উপরে মুক্তোর মতো আকাশে প্রায় নিভে যাওয়া চাঁদের একটা টুকরো ঝুলছে। জলাভূমি থেকে সুরু হয়ে পাইনের বন দিগন্ত ছুঁয়েছে এবং সেই দিগন্তপারে একটা কারখানা-চিমনির উদ্যত রক্তিম আঙুলের শাসানির সামনে যেন গাছগুলো সভয়ে গাদাগাদি করে জড়ো হয়ে আছে অন্ধকার একটা স্তূপের মতো।

মধ্যাহ্নের দিকে মাটিটাকে ভিজিয়ে দিয়ে গিয়েছিল এক পশলা বৃষ্টি, কিন্তু অপরাহ্নের দিকে সূর্যাস্ত নাগাদ মাটি শুকিয়ে উঠেছে ম্লানায়মান আলোয়: একটা দমচাপা স্যাঁৎসেঁতে ভাব যেন এখন ভরে তুলেছে বাতাসকে। বোধ হচ্ছে যেন জলাটা ফেঁপে উঠেছে এবং তার আনন্দহীন নীরসতা চারদিকের পরিব্যাপ্ত মুহ্যমান আবহাওয়ার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।

পাখি-ধরা জালটা গুটোতে গুটোতে এ্যাসিসট্যান্ট সার্জন সাসা ভিনোকুরফ রাইসর্ষে বোনা পাহাড়ের গা বেয়ে প্রায় ভালুকের মতো নেমে আসছে হাত-পায়ে ভর দিয়ে। আমি তখন এলডার গাছের ঝোপের তলায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম—সরবে:

"এটা ভারি সুন্দর হত যদি নতুন করে আবার জীবনটা সুরু করা যেত—ধরো, এই বছর পনেরো বয়েস থেকে।"

এমন সময় সাসা এসে আমাদের আগের এক আলোচনার সূত্র ধরে ভারি গলায় বলে উঠলো:

"জীবনের যে পরিবেশে রয়েছি তা কারুকেই খুশি করতে পারছে না।"

পাহাড় বেয়ে বরাবর সে আমার ঝোপের কাছে এগিয়ে এলো। কাদামাখা

হাতটা জুতোয় মুছে নিলে এবং পাখি-ধরা জালটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। মাথার চাঁদিতে পড়েছে টাক, কপালে তার গভীর বলিরেখা, চোখ দুটোকে মনে হচ্ছে মাছের মতো গোল গোল।

মানুষটা চিত্তাকর্ষক। উনি একজন ব্যারিস্টারের সন্তান, কিন্তু তার নিজের কথায়—"স্কুলে তার ওপরে জ্ঞানের যে গুরুভার চাপানো হয়েছিল তা সহ্য করতে না পেরে এবং তার বাবার বর্বরোচিত নির্যাতনে" বাড়ি ছেড়ে সে উধাও হয়। প্রায় দুটো বছর সে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়—গারদে এবং বাউণ্ডুলেদের নামগোত্রহীন মামুলি নানা আস্তানায়। তারপর "যে সব বিষয়ে সকলেই সব সময় সচেতন সে সব বিষয় সম্পর্কে বোধশক্তি একেবারেই নিঃশেষিত করে" ফিরে এল সে বাপের আস্তানায় এবং "মরা ইঁদুরকে যেমন পিঁপড়ের গাদায় ছুঁড়ে দেওয়া হয়" তেমনি হলো তারও হালৎ। অর্থাৎ একটি পদাতিক বাহিনীতে তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো এবং সেনাবাহিনীর ডাক্তারী স্কুলে লাগিয়ে দেওয়া হলো পড়াশোনায়। সৈনিক হিসেবে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর প্রায় সাতটি বছর শিক্ষানবিস্মী করে সে ঘুরে বেড়ায় জাহাজে।

"সব জাতের মদই আমি চেখে দেখেছি হে", সে বললে, "তার কারণ এ নয় যে, স্বভাবে আমি মাতাল, কিন্তু একজনের যা হওয়া সম্ভব—সেটা ফুটে বেরুবার একটা পথ থাকবে তো। পরিমাণে আমি এমনি মদ খেতাম যে, আমাকে দেখবার জন্যে ইংরেজরাও ছুটে আসতো। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মোহিত হয়ে আমাকে দেখতো। তারপর কাঁধে একটা ঝাঁকি দিয়ে হাসতো: নিশ্চয়ই তারা খুব আমোদ পেত—যেন এতদিনে একটা জবরদস্ত মদ-খাইয়ে দেখতে পেয়েছে। এমন একজনকে দেখতে পেয়েছে যার জন্যে জিন আর হুইস্কি চোলাই করা সার্থক। এমন কি তাদের মধ্যে একজন আমাকে শুধিয়েছিল: আচ্ছা—কোনোদিন হুইস্কিতে চান করবার চেষ্টা করেছ?

"এই সব ব্যাপারে ইংরেজরা একটা চমৎকার জাত; কেবল ওদের ওই—ওই ভাষাটা যা ··· যেটা চীনেদের চেয়েও ঢের খারাপ। ···

"কিভাবে কি হয়ে গেল— কোনো ভাবনা-চিন্তা না করেই একদিন দেখি, আমি পারস্যে হাজির হয়েছি, বিয়েও হয়ে গেল এক ইংরেজ বানিয়ার মেয়ের সঙ্গে। দিব্যি চমৎকার মেয়ে, তবে সে হয়ে উঠলো আস্ত একটি মাতাল—অবিশ্যি আমিই হয়তো তাকে এই পানাসক্তির দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম। বছর দুই বাদে—সে মরলো কলেরায় আর আমি চলে এলাম পৃথিবীর

সবচেয়ে নিকৃষ্ট শহর—বাকুতে। সেখান থেকে এসেছি—ব্যাঙের এই গর্তে। এই হলো তোমার শহর, যদি একে তোমার ভাল লাগে—শয়তান যাকে ছিঁড়ে টুকরো করছে!"

আমি বললাম, "সাসা, তোমার চীন ঘুরে আসার গল্প বলো।"

"কোথাও যাওয়া খুবই সোজা ব্যাপার, তুমি শুধু জাহাজে চড়ে বসো আর বাকি সব ছেড়ে দাও ক্যাপ্টেনের ওপর। ক্যাপ্টেনগুলো সব্বাই মাতাল, সব কটা দিব্যি গালতে আর গলাবাজিতে ওস্তাদ—এই হলো প্রাকৃতিক নিয়ম। তোমার একটা সিগ্রেট দাও তো হে।"

সে সিগারেট ধরালে এবং এক নাক দিয়ে ধোঁয়ার তাল ছেড়ে বললে:

"বড্ড হাল্কা তামাক; যাকে বলে একেবারে ছিঁচ্‌কে খুকী।"

ভিনোকুরফের বয়স প্রায় পঞ্চাশের ওপর, কিন্তু এখনও সে শক্তসমর্থ মানুষ। তার কাঠে খোদাই সৈনিকসুলভ মুখটা উজ্জ্বল করে দিয়েছে দুটি প্রদীপ্ত চোখ। তোমার দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে থাকবে সে দুটো চোখ। দেখবে—দৃষ্টিতে মাখানো এমন একটা ভাব—যে অনেক দেখেছে, যার কোন বিষয়েই আর অবাক হওয়ার অভ্যাস নেই এবং সমস্ত দুশ্চিন্তার সঙ্গে যে অপরিচিত। মানুষজনের দিকে তাকায় সে চোখের কোণে, সোজাসুজি নয় এবং আচরণ করে যেন করুণার সঙ্গে—কিঞ্চিৎ সহিষ্ণুতায়। সে আর চিকিৎসা ব্যবসা করে না সে বলে—"আমি আবিষ্কার করেছি ওষুধ-বিষদ অন্ধ বিজ্ঞান।"

শহরে আছে তার এক টুপির দোকান আর এক বুলগেরিয়ার ঘোলের কারখানা, মেচনিকফ কোম্পানীর চাহিদা মতো মাল তৈরি হয়। বাড়ি বাড়ি যোগানও দিয়ে থাকে।

"তোমার নিজের কথা কিছু বলো সাসা।" আমি নাছোড়বান্দা হয়ে বলি।

"তোমার এই কৌতূহল আমাকে অবাক করে। কোথায় রেখেছ বলো তো তোমার এই বাজে কথার চুপড়িটি? বলো—কি শুনতে চাও?"

"যা তুমি দেখেছ।"

"অ, ওই সব। সে তোমাকে বলতে গেলে একটি বছর লাগবে। যা দেখবার ছিল—দেখেছি আর [illegible] যতো অসম্পূর্ণতা। অসম্পূর্ণতা? হ্যাঁ, তাকে আর কি-ই বা বলা যায়? তোমার জাহাজ বন্দর ছাড়লো, তুমি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে বললে: 'এবার জাহাজটির সঙ্গে ধাতস্থ হও—যেখানে যাচ্ছ নির্বিঘ্নে

সেখানে পৌঁছে দাও।' এবং ভেসে চলো দিন আর রাত্তির—দিন আর রাত্তির। চারপাশ ঘিরে তোমার সমুদ্র আর আকাশের শূন্যতা ছাড়া কিছুই নেই। আমি শান্ত প্রকৃতির মানুষ; তাই ওসব আমার ভাল লাগে। তারপর, শুনবে একদিন জাহাজের ভোঁ—তার মানে পৌঁছে গেছ। কিন্তু আমি তো থামতে চাইনে। বলতে গেলে এই ধরো—প্রথম অসম্পূর্ণতা। এ যেন তুমি বেড়ার ওপর গিয়ে পড়লে—যখন তুমি ধরো কোনো গ্রামে রাত্রে বেড়াতে বেরিয়েছ। তারপর ধরো সুরু হলো ডেকের ওপরে যাত্রীদের ক্ষ্যাপা দৌড়ঝাঁপ। যাত্রীরা হলো আলাদা এক ঢঙের, ভীষণ বোকা বোকা ধরনের। জাহাজে থাকতে থাকতে সামুদ্রিক মাথা ঘোরানিতে চরম লাঞ্ছনা ছাড়াও লোকগুলোকে হাস্যকর একধরনের ছেলেমানুষী স্বভাব পেয়ে বসে। এবং ডাঙায় যতোটা না হয়—তার চেয়ে সমুদ্রেই লোকে তীব্রভাবে বুঝতে পারে, মানুষ কতো অসহায়। সমুদ্র যাত্রা সেই মর্মকথাটিকে শিখিয়ে দেয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে আমি নিশ্চিন্তে বলতে পারি যে, পৃথিবীর সর্বত্র—কি জলে আর কি স্থলে, যাত্রীদের চেয়ে নচ্ছার আর কিছুই নেই। গারদের বন্দীর জীবন একটা লম্বা অসহনীয় জীবন। কিন্তু সমুদ্রের অসহনীয়তা অত্যন্ত বিষাক্ত আর যাত্রীরা হলো একেবারে জাত অলস। শুধু এই অসহনীয়তা থেকেই লোকগুলো তাদের ব্যক্তিত্ব এতদূর পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে যে, মস্ত পদবী, খেতাব, দৌলৎ বা অন্যান্য খ্যাতি ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও তারা জাহাজের সামান্য একটা ফায়ারম্যানের সঙ্গেও সমান সমান আচরণ করে। ওদের বিস্কুট দেখে কুকুরগুলো যেমন করে—তেমনিভাবে ডেকের দিকে সব ছোটে বিদেশের তটভূমির দৃশ্য দেখবে বলে। দেখবে বৈকি—দ্যাখ না বাবা, তা অত দৌড়ঝাঁপ কেন? কিন্তু না, তারা পা ঠুকবে এবং মতবিরোধ ঘটাবে: 'আহা—ওই দিকে দেখ। ওটা লক্ষ্য করো।' বাস্তবিক পক্ষে সেখানে দেখার মতো কিছুই নেই, যেমন ধারা সব হয় তেমনি: মাটি, ঘরদোর, মানুষজন—সব দেখাচ্ছে ইঁদুরের চেয়েও খুদে খুদে। এবং ঠিক সেই সময়ে দুর্ভাগ্যজনক কিছু দুর্ঘটনাও ঘটে: যেমন আলেকজেন্দ্রিয়ায় ঘটলো একবার, ওই রকম গোলমালের মধ্যে জাহাজের পরিচারিকা ঠাকরুণ আমার সুটকেশের ভেতরে আট আউন্সের কার্বোলিক এ্যাসিডের শিশিটা ভেঙে বসলেন। তার দুর্গন্ধ অচিরে ছড়িয়ে পড়লো প্রথম শ্রেণীর কেবিনে কেবিনে। ফার্স্ট অফিসার তো পাগলের মতো আমার চারদিকে নেচেকুঁদে বেড়াতে লাগল। এমন সাংঘাতিকভাবে আমাকে শাসাতে লাগলো যে, তার দমকে এক ভদ্রমহিলা

স্নায়বিক অবসন্নতায় ঢলে পড়লেন এবং ক্যাপ্টেনের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন—ভুল করে অবিশ্যি। কারণ আসলে তিনি আমার বিরুদ্ধেই অভিযোগ করতে চেয়েছিলেন। অথবা আর একটা ঘটনা ধরো : আমার ডাক্তারখানার কেবিনের দরজায় একটা বাচ্চা মেয়ে আঙুল পিষে ফেললে, এবং তার বাবা যেহেতু একজন কূটনীতিবিদ, সেহেতু তিনি অবলীলায় ধরে নিলেন—তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে আমার পেটে খোঁচা মারার তাঁর অধিকার অবশ্যই আছে। সব সময়ে এই ধরনের সব ঘটনা আর কি—যত অসম্ভব আর অপ্রত্যাশিত।

"সংক্ষেপে, সারা পৃথিবীর কোথাও আমি বিশেষ করে চিত্তাকর্ষক কিছুই দেখি নি। সর্বত্র একজন একইভাবে কথায় অথবা কাজে অপমানিত হচ্ছে—বিশেষ ক'রে অন্যান্য দেশের চেয়ে এশিয়াতেই এটা বেশী। এই সব আর কি। গোলার্ধ দুটো, তোমরা তাই বলো না? ওটা সাধারণ ভুল : ব্যাপার-টার দিকে তোমরা যদি সঠিক ও বাস্তব দৃষ্টিতে তাকাও এবং মেরু অংশ থেকে সুরু করে পৃথিবীটাকে তোমার খুশি মতো যতগুলো অক্ষাংশে কেটে কেটে ভাগ করতে পারো করো—গোলার্ধও ঠিক ততোগুলো এবং সম্ভবত তারও বেশী। দাও, একটা সিগ্রেট বাড়িয়ে দাও।"

সিগারেট ধরিয়ে এবং চোখ বুজে সে বিড়বিড় করে বললে : "সত্যিই সিগ্রেট খাওয়া ভাল নয়, ভারুই পাখিগুলো পছন্দ করে না।"

আবার সে সুরু করলো শান্ত মৃদুকণ্ঠে :

"মাঝে মাঝে চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটে কিন্তু আত্মার শান্তির জন্য ওগুলো না ঘটলেই ভালো। যেমন ধরো : চীন সমুদ্রে—ওই নামে একটা সমুদ্র আছে বটে, তবে অন্যান্য সমুদ্র থেকে তার কোনো তফাৎ নেই—একবার ভেসে চলেছি হংকঙের দিকে। দৃশ্য-দ্রষ্টার দল একদিন রাত্রে একটা অদ্ভুত আলো দেখতে পেলে—কালির মতো অন্ধকারে তা জ্বলে উঠছে। আমরা চারজনে তাস খেলছিলুম—আমি, সেকেণ্ড অফিসার, সারেঙ সাহেব আব রসুই ঘরের কর্তা। সহসা একটা চেঁচানি শুনলাম :

'সমুদ্রে আগুন!'…

"খেলা অসমাপ্ত রেখেই আমরা দেখবার জন্য লাফ দিয়ে উঠলাম। দীর্ঘদিন যখন কোনো মানুষকে সমুদ্রে থাকতে হয়, তখন অতি তুচ্ছ ব্যাপারও তাকে উত্তেজিত করে। এমন কি শুশুক দেখেও সে আনন্দ পায়—যদিও ওই অখাদ্য

মৎস্য বস্তুটা অন্য কিছুর চেয়ে দেখতে প্রায় শূয়োরের মতোই—সমুদ্রের যাত্রীরা যে কতটা উজবুক হয়ে যায়—এ থেকেই তার প্রমাণ পাবে।

"যাক, আমার কাহিনী বলি। আমি ডেক-ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম দেখবার জন্যে এবং দেখলাম গরম স্নানাগারের মতো গুমোটভরা সাধারণ রাত, কালো কম্বলে ঢাকা আকাশ এবং ঠিক সমুদ্রের মতই অসমতল। অন্ধকার অবশ্য খুব গভীর এবং অনেক দূরে ফুলের মতো ছোট্ট আগুন একটু জ্বলছে এবং অগ্নিশিখার এক প্রান্ত সমুদ্রে এসে মিশেছে। বলতে গেলে—যেন শজারুর মতো খাড়া খাড়া কাঁটা—অবশ্য বড় সাইজের সজারু, ভেড়ার মতো বড়। শজারুর কাঁটার মতো শিখাগুলো ছিটকে বেরুচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে এবং বেড়ে উঠছে। বিশেষ চিত্তাকর্ষক কিছু নয়—তা ছাড়া, তাস খেলায় তখন আমি জিতছিলাম।

"আমি এটা লক্ষ্য করেছি যে, আগুন সম্পর্কে মানুষের একটা যেন দৈবী আবেগ দেখা যায়।··· এক শবযাত্রা ছাড়া তাবড় তাবড় উৎসব, রাজকীয় অনুষ্ঠান, জন্মোৎসব, বিয়ে বা অন্যান্য সামাজিক আনন্দোৎসবে আতসবাজী ও রোশনাই থাকেই। পূজা-পার্বণেও হয়—শবযাত্রাতেও লোকের ওটা গ্রহণ করা অবশ্যই উচিত। বাচ্চা ছোকরাদের কাঠ-কুটো গাদা করে আগুন জ্বালিয়ে আমোদ করতে দেখা যায়, এমন কি গ্রীষ্মকালেও। এর জন্যে নির্মমভাবে ওদের থাপড়ানো উচিত, কারণ এই সব আনন্দের খেলা থেকে জঙ্গলে আগুন লেগে যায়। যাই হোক, আগুন সম্পর্কে মানুষের কেমন একটা অদ্ভুত আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়, পতঙ্গের মতো সবাই ছোটে তার দিকে। বড়লোকের ঘর জ্বলতে দেখলে গরীব লোকে খুশি হয়; বাস্তবিক পক্ষে যার দেখার চোখ আছে সে আগুনের শিখায় আকৃষ্ট হবেই। এ কথা তো সুবিদিত।

"সব যাত্রী ছুটলো ডেকের ওপরে এবং দেখতে দেখতে তর্ক সুরু হলো—ওটা কি জ্বলছে। নিরেট একটা বোকাও বুঝতে পারছে যে, ওটা কোনো জাহাজ-টাহাজ হবে, কারণ সমুদ্রে খড়কুটোর গাদা ইতস্তত ভেসে বেড়ায় না। কিন্তু বোবা এবং কালা একটা বাচ্চার কাছেও যা পরিষ্কার—ওদের কাছে তা মোটেই পরিষ্কার নয়। সব সময়ে এটা আমার কাছে তাজ্জব লেগেছে যে, যাত্রীরা খুব সহজতম জিনিসটাও বোঝে না। ফালতু কথার ফুলঝুরি জীবনের জমাট অসহনীয়তার ভার লাঘব করতে পারে না।

"আগুনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গরম গরম কথাবার্তা হচ্ছিল—আমি

শান্তভাবে শুনছিলাম। সহসা একজন মহিলা চিৎকার করে উঠলেন: 'আহা, হয়তো ওতে লোকজন আছে।'

"কী সূক্ষ্ম বুদ্ধি! লোকজন ছাড়া সমুদ্রে কখনো জাহাজ যায় না! কিন্তু ভদ্রমহিলা এইমাত্র সেটি আবিষ্কার করলেন!

"তিনি আবার চীৎকার করে উঠলেন: 'ওদের বাঁচাতেই হবে।'

"এতে আবার নতুন করে বিতর্ক সুরু হলো। কেউ কেউ বললে—এক্ষুণি আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত। আবার অন্যদের কেউ কেউ হিসেবীর মতো বললে যে, গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে যথেষ্ট দেরি তো হবেই—তার ওপরে আবার নতুন ঝামেলার সম্মুখীন হওয়া কেন? কিন্তু মহিলাটি গলাবাজিতে যেমন—উৎসাহেও তেমনি। পরে তাঁর খবরাখবর নিয়ে জেনেছিলাম—কারস্ থেকে তিনি জাপানে যাচ্ছেন তাঁর বোনের কাছে। বোনটি ওখানে টোকিওর পররাষ্ট্র দপ্তরের কাকে যেন বিয়ে করেছেন। তা ছাড়া তাঁর এই সমুদ্রযাত্রার আর একটা কারণ—ফুসফুসটি তাঁর যক্ষ্মাক্রান্ত। যাই হোক, আমি বলতে চাচ্ছিলুম—তিনি রীতিমতো বিরক্তিকর হয়ে উঠলেন। দাবী করতে লাগলেন—জ্বলন্ত জাহাজের লোকগুলোকে রক্ষা করা উচিত এবং আগুন-লাগা জাহাজটাকে সাহায্য করবার জন্য যাত্রীদের উত্তেজিত করে ক্যাপ্টেনের কাছে প্রতিনিধি দল পাঠাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ অবিশ্যি প্রতিবাদ করতে লাগল এই বলে যে, জাহাজটা হয়তো চীনেদের এবং জাহাজে যারা আছে তারাও হয়তো চীনে। কিন্তু মহিলা তাতে কিছুমাত্র ঘাবড়ালেন না। তাঁর হিস্টিরিয়াগ্রস্ত বিস্ফোরণ জনা তিনেকের ওপর এমনি প্রভাব বিস্তার করলো যে, ক্যাপ্টেনের কাছে আবেদন নিয়ে তাঁরা হাজির হলেন। ক্যাপ্টেন যদিও বললেন যে, তাঁরা যা চাইছেন তাতে আরও দেরি হবে—তাতে তাঁরা আইন দেখিয়ে ভয় দেখালেন। প্রবল কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—সামুদ্রিক আইন অনুযায়ী বিপদাপন্ন কোনো জাহাজকে সাহায্য করতে যেতে তিনি বাধ্য এবং তিনি যদি তা না করেন তা হলে হংকঙে পৌঁছেই তাঁর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবেন।

"শেষ পর্যন্ত গোলমেলে লোকগুলো জিতে গেল এবং ক্যাপ্টেনও আগুন-লাগা জাহাজটার দিকে অগ্রসর হলো। আমরা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের পাহাড় প্রমাণ ঢেউ ভেঙে গভীর অন্ধকারে এগিয়ে চললাম। খালাসীরা রীতিমত বিরক্ত, বোট নামাতে লাগল এবং যখন আমরা কাছাকাছি গেলাম তখন দেখতে পেলাম—

একটা যাচ্ছেতাই ধরনের দু-মাস্তুলের চীনে জাংক্ জ্বলছে। লোকে ঠাসা দুটো ছোট বোট ওটার চারপাশে দাঁড় বেয়ে বেয়ে ঘুরছিল, সকলেই চেঁচামেচি হৈ হৈ করছে আর নৌকোর পেছন দিকে একটা রোগাটে লম্বা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে—অনড় অটল। ওদিকে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন, ধোঁয়ার জন্যে প্যাটাতনটা দেখা যাচ্ছিল না। মাস্তুল দুটো জ্বলছিল মোমবাতির মতো, সেখান থেকে অগ্নিশিখার হল্কা গিয়ে লাগছিল নৌকোর গায়ে; কিন্তু মানুষটা একেবারে অনড়, যেন কর্তব্যরত প্রহরী। তাকে স্পষ্টই সবাই দেখতে পাচ্ছে।

"আমরা একটা বোট থেকে যাত্রীদের জাহাজে তুললাম! অন্য বোটটায় ছিল জনা তিনেক লোক—তারা ভয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সব কটাই ডুবে গেল। উদ্ধার পাওয়া মানুষগুলোর কাছ থেকে জানা গেল—তাদের ক্যাপ্টেন তখনো জ্বলন্ত নৌকোয় এবং তিনি চান তাঁর সব ধনসম্পদ সহ তিনি খতম হবেন। আমাদের নাবিকেরা তাকে চিৎকার করে বললে: 'জলে ঝাঁপ দিয়ে পড না শয়তান; আমরা তোমাকে তুলে নেবো।' কিন্তু সে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলে না এবং আমরা তো তাকে দড়ির ফাঁস লাগিয়ে টেনে আনতে পারি না? যাই হোক, তার এই একগুঁয়েমী নিয়ে আমাদের আর অপচয় করবার মতো সময় ছিল না, ওদিকে বোটগুলোকে ফেরার জন্যে আমাদের ক্যাপ্টেন জাহাজের ভেঁা দিচ্ছিলেন। চীনে নৌকোটার পেছন দিকে যখনি আগুন ধরে গেল—আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, এশিয়াবাসীটি লাফিয়ে উঠেছে, যেন আগুন তাকে গ্রাস করল। লোকটা দুহাতে মাথা চেপে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিলে—যেন অতলে তলিয়ে গেল।

"কিন্তু ঘটনার মর্মার্থটা চীনেটির আচরণের মধ্যে নেই—কারণ আত্মজ্ঞান সম্পর্কে ওদের জাত পুরাদস্তুর উদাসীন। ওদের বিপুলায়তন জনসংখ্যা ও তার চাপ হয়তো এর জন্যে দায়ী। বাস্তবিক পক্ষে এই ব্যাপারটা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, যে-সব ক্ষেত্রে এই সংখ্যা বৃদ্ধি একটা বাধাস্বরূপ সেখানে তারা ভাগ্য নিয়ে জুয়া খেলে এবং ভাগ্য-হারার নিষ্ঠার সঙ্গেই আত্মহত্যা করে মরে। যখনই কোনো পরিবারে দ্বিতীয় কন্যা জন্মায় তাকে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়—পরিবার পিছু একটির বেশি মেয়ে ওরা সহ্য করে না।

"যাক, যা বলছিলুম—ওই ঘটনার মর্মকথাটা, যা চীনে লোকটির আচরণের মধ্যে নেই, কিন্তু আছে ওই যক্ষ্মাগ্রস্ত ভদ্রমহিলাটির মধ্যে। তিনি ছুটে গেলেন

ক্যাপ্টেনের কাছে এবং চেঁচামেচি করে বলতে লাগলেন যে, উক্ত চীনে নৌকো-টির আগুন নেভাবার জন্যে তিনি কোনো আদেশই দেন নি।

"ক্যাপ্টেন বেশ সসম্ভ্রমেই বললে, 'দেখুন, আমি তো দমকল নই।'

"মহিলা আর্তনাদ করে বলে উঠলেন, 'কিন্তু একটা মানুষ যে ওখানে শেষ হয়ে গেল!'

"ক্যাপ্টেন তাঁকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগলেন যে, ওটা এমন অসম্ভব ব্যাপার কিছু নয়—এমন কি ডাঙাতেও ঘটে। কিন্তু মহিলা তাঁর সেই একই কথা বার বার বলতে লাগলেন:

'তার মানেটা বুঝলেন কি? একটা মানুষ!'

"সকলেই তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছিল কিন্তু তিনি ক্রমাগত বক্ বক্ করে ছোট্ট একটা কোলের কুকুরের মতো এর দিক থেকে ওর দিকে তেড়ে তেড়ে যাচ্ছিলেন: 'একটা মানুষ,—একটা মানুষ!'...

"যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল তারা মহিলাটির ওপর ক্রমে বিরক্ত হয়ে একে একে সরে পড়ল; তিনি কিন্তু ডেকময় দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগ-লেন। এবং শেষ পর্যন্ত কেঁদে ফেললেন। একজন খুব গণ্যমান্য এবং সম্মানীয় ব্যক্তি—যতদূর মনে পড়ে কোনো লর্ড, তাঁর নাম ভুলে গেছি, তিনি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

"তিনি তাঁকে বোঝালেন, 'যা কিছু করবার ছিল করা হয়েছে।'

"কিন্তু মহিলাটি অশিষ্টভাবে তাঁকে যেন ঝেড়ে ফেললেন। তখন ভাবলাম, দেখি আমি একবার চেষ্টা করে। তাই আমি তাঁর কাছে গিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললাম, 'দেখুন ··· দেবী, যদি অনুমতি করেন তা হলে আপনাকে কয়েক ফোঁটা বলড্রিয়ান দি।'

"কিন্তু তিনি আমার দিকে না তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'ওঃ বোকা, কি নিরেট বোকা!'

"কথাটা আমাকে আঘাত করলো। তবু, আমি ভাবলাম, চেষ্টা করি। তাই যতোটা নরম গলায় সম্ভব, বললাম, 'দেবী, আপনার হৃদয়ের মহানুভব-তার কাছে ক্যাপ্টেনের লজ্জাকর আচরণ আমাকেও বিদ্রোহী করেছে।'

"তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন আমার মুখোমুখি এবং তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, 'সরে যান—শুনতে পাচ্ছেন!'

"অবশ্য আমি নির্ভীকভাবেই চলে এলাম—তবে একটা গ্লাসে কয়েক

ফোঁটা বলড্রিয়ান রেখে এলাম। আমি একপাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। তিনি সশব্দে নাক ঝাড়লেন। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার মনে হলো একজন চীনে লোকের জন্য তাঁর এই কান্নার মধ্যে কেমন যেন এক ধরনের অশোভনতা আছে। এটা নিশ্চয়ই সম্ভব নয় যে, তাঁর সামনে যে-ই মারা যায় তার জন্যেই তিনি ভীষণভাবে কান্নাকাটি করেন। সিঙ্গাপুরে শ'য়ে শ'য়ে লোক তখন খাপ্পাভাবে মারা যাচ্ছিল; তবু আমাদের একজন যাত্রীও তার জন্য কখনো কাঁদে নি। আমি অবশ্যই মানি, তারা ইয়োরোপীয়দের মতো নয়, তবু আমি অসংখ্য রাশিয়ার মানুষকে মরতে দেখেছি, কত নাবিক, শ্রমিক ও আরও কত লোক—ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, দলা পাকিয়ে গেছে, থেঁৎলে গেছে আমার চোখের সামনেই—এ সব যাত্রীদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করে নি। অবিশ্যি তাদের কথা যদি না ধরা হয়—যারা রক্তপাত দেখতে অনভ্যস্ত—তাদের দুশ্চিন্তা ও স্নায়বিক ব্যাকুলতা ঘটে স্বাভাবিক কারণে। এই মহিলাটির ব্যাপার আমি অনেক ভেবেছি, বাস্তবিক পক্ষে যতোটা উচিত নয়—তার চেয়ে ঢের বেশি এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি, কিন্তু এর কোনো মানে খুঁজে পাই নি।"

ভিনোকুরফ তার গোঁফে টান দিলে, উৎকর্ণ হয়ে শুনলে দূরাগত শব্দ, তারপর নীরসভাবে বিড়বিড় করে বললে, "আমার সন্দেহ—ওর মধ্যে ছিল একধরণের বোকামী।"

রাত হয়েছে। নির্জীব নক্ষত্রগুলো জ্ব'লো নীল আকাশে জ্বল জ্বল করছে। চাঁদের টুকরোটাও অন্তর্হিত, আমাদের কাছাকাছি খাটো বিবর্ণ পাইন গাছগুলো কালো হয়ে উঠেছে এবং মনে পড়িয়ে দিচ্ছে ওই রকম বিবর্ণ এক পাদ্রীর কথা।

সাশা ভিনোকুরফ বন-বিভাগের বাংলোতে ফেরার প্রস্তাব করলে—এবং সেখানে আমরা ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করবো—যখন ভারুই পাখির দল আসবে। যাওয়ার জন্যে আমরা উঠে দাঁড়ালাম। ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে অবসন্নভাবে হাঁটতে হাঁটতে ধীরে ধীরে সে বললে:

"বুঝলে, মাংস যখন গরম থাকে তখন তাতে নুন দেওয়া হয়েছে কি না লোকে দেখে না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ আগুন—১

ফেব্রুয়ারী মাসের অন্ধকার এক রাত্রে ওস্‌হারস্ক স্কোয়ারে আসতে আসতে আমি এক অগ্নিকাণ্ড দেখেছিলাম। শেয়ালের ল্যাজের মতো চঞ্চল একটা

অগ্নিশিখা নীচের তলার একটা জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছিল আর লক্‌লক্‌ করে উঠছিল বাতাসে। অন্ধকারে দাগ দিয়ে দিয়ে তার বড় বড় উড়ন্ত কণাগুলো ধীরে ধীরে—যেন অনিচ্ছায় মাটিতে মিশে যাচ্ছিল। আগুনের রূপ আমাকে উত্তেজিত করে তুললো। এ যেন স্যাঁতানো গুমোটভরা অন্ধকারের গহ্বর থেকে একটা টক্‌টকে লাল জানোয়ার লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে ছাদের নীচের জানালা দিয়ে ঢুকতে চাইছে, শিরদাঁড়াটাকে ধনুকের মতো বেঁকিয়ে গরগর করে কি যেন কামড়ে খাচ্ছে; একটা শুকনো চিড়চিড় শব্দ শোনা যায়—যেন কে দাঁতে দাঁত বসিয়ে পাখির হাড় চিবুচ্ছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অগ্নিশিখার এই সূক্ষ্ম কলাকৌশল দেখতে দেখতে আমি ভাবছিলাম: "কারুর ছুটে গিয়ে জানালায় জানালায় ধাক্কা দেওয়া উচিত, মানুষজনকে জাগিয়ে তোলা উচিত এবং 'আগুন---আগুন' বলে চিৎকার করা উচিত!" কিন্তু আমি না পারলাম নড়তে—না পারলাম হাঁকডাক করতে। শুধু আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, বিমুগ্ধ। দেখতে লাগলাম—অগ্নিশিখা কেমন দ্রুত বেড়ে উঠছে। মোরগের পালকের মত একটা পাতলা রাঙা আভা ছাদের কিনারে গিয়ে ঝিকমিক করতে শুরু করেছে, বাগানের গাছগুলোর উঁচু উঁচু ডালপালা রক্তিম ও স্বর্ণাভ হয়ে উঠল এবং সারা স্কোয়ারটা আলোকিত হয়ে উঠতে লাগল।

"আমার নিশ্চয়ই ছুটে গিয়ে সকলকে জাগিয়ে তোলা উচিত", মনে মনে বললাম বটে, কিন্তু আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম যতক্ষণ না স্কোয়ারের মাঝখানে আর একজন লোককে দেখতে পেলাম। লোকটা স্কোয়ারের একটা লোহার থামের গায়ে হেলান দিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল যে সহসা তাকে আলাদা করে চিনে নেওয়াও কঠিন।

আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম। সে রাতের পাহারাওয়ালা লুকিচ, শান্ত নিরীহ বৃদ্ধ।

"আরে তুমি ভাবছ কি? তোমার হুইশল বাজাচ্ছ না কেন—আর লোকজনকে জাগিয়েই বা তুলছ না কেন?"

আগুনের দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই সে ঘুম-ঘুম গলায় যেন মাতালের মত বললে, "এক মিনিটের মধ্যে।"...

আমি জানতাম সে স্থিরবুদ্ধির মানুষ, কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম—চোখে যেন তার মোহের মাদকতা। তাই তার জবাব আমাকে বিস্মিত করল না। সে নীচু গলায় বিড়বিড় করে যেন আত্মগতভাবে বলতে শুরু করল:

"তুমি একবার লক্ষ্য করে দেখ আগুনের কি রকম চাতুরী, দেখ ওর কাণ্ড-কারখানা—দেখ। সব খেয়ে শেষ করছে, সব গিলে খাচ্ছে, শক্তিমান জানোয়ার! মাত্র মিনিট কয়েক আগে চিমনির পাশে ছিল এই এতটুকুন একটা শিখা, একটা বাটালির চেয়ে বড় নয়। এখন কেমন বেড়ে উঠেছে দাউ দাউ করে আর দিব্যি কম্ম ফতে করে যাচ্ছে! এ এক মস্ত মজা, এই আগুন দেখা, দিব্যি গেলে বলতে পারি।"

তারপর হুইশিলটা সে মুখে লাগালে এবং কোনো রকমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তীব্র তীক্ষ্ম সুরে নির্জন স্কোয়ারটাকে মুখরিত করে তুললো, সেই সঙ্গে ঘড়ঘড়ে শব্দের একটা তরঙ্গ তুলে ছড়িয়ে দিলে চারদিকে। কিন্তু সারাক্ষণ তার দৃষ্টি অবিচলিতভাবে পড়ে রইল সেই উঁচুতে—যেখানে লাল ও সাদা তুষারকণাগুলো ছাদের ওপরে গড়িয়ে যাচ্ছে, নেচে উঠছে এবং ঘন কালো ধোঁয়া জমকালো এক শিরোভূষণের মতো জমাট হয়ে উঠছে। লুকিচ দাঁতে দাঁত ঘষলো এবং তার দাড়ির ভেতর থেকে বিড়বিড় করে বলে উঠল: "তুই একটা বুড়ো নচ্ছার—তুই!··· তাই তো, সকলকে তো ডেকে জাগানো উচিত।"

আমরা স্কোয়ারের চারদিকে ছুটতে সুরু করলাম। দরজায় এবং জানালায় জানালায় ধাক্কা দিয়ে সকলকে জাগিয়ে তুলতে লাগলাম: "আগুন! আ ··· গুন!"

আমার মনে হলে—আমি একটা কর্তব্য করেছি: তাতে অবশ্য আমার হৃদয়ের সাড়া ছিল না। আর লুকিচ, জানালায় জানালায় ধাক্কা দেওয়ার পর স্কোয়ারের মাঝখানে সবেগে ফিরে গেল এবং মাথাটা পিছনের দিকে হেলিয়ে চিৎকার করে উঠল—"আ—গু—ন।" গলায় তার সুস্পষ্ট সেই উল্লাসের স্পর্শ।

সম্মোহিত করার দারুণ ক্ষমতা আগুনের! আমি লক্ষ্য করে দেখেছি—খুব আত্মত্যাগী মানুষেও এর মোহজালের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং আমি নিজেও তার প্রভাব থেকে মুক্ত নই। কাঠ-কুটোর স্তূপে আগুন জ্বালাতে চিরকাল আমার ভালো লাগে আর আগুনের শিখাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দিনের পর দিন বসে থাকতে আর গান শুনতে আমি এক্ষুনি প্রস্তুত।

॥ ২ ॥

এটা ঘটেছিল নিঝ্‌নির স্লেটিনস্কিকোস্লোপের অগ্নিকাণ্ডে; একটা গিরি-সংকটের সংকীর্ণ খাদের ওপরের ঘর-বাড়িগুলো তখন জ্বলছে। মেটে

পাহাড়টাকে বিদীর্ণ করে খাদটা চলে গেছে বরাবর শহরের উঁচু দিক থেকে নীচের দিকে—খাড়া ঢালু হয়ে ভলগার তীরাভিমুখে। জায়গাটার অবস্থান এমনি যে, যেখানে আগুনের দাপাদাপি চলছে, দমকল বাহিনী তার যথেষ্ট কাছাকাছি যেতে পারছে না ; ফলে, পাম্প ও জলের পিপেগুলো থেকে গেছে ঢালু জায়গাটার তলায়। গলিত ধাতুর এক-একটা দলা খাদের গা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে আর জ্বলন্ত কড়িকাঠগুলো হুড়মুড় করে এসে পড়ছে ওপর থেকে নীচে।

ঢালু জায়গাটার উল্টো দিকে হয়েছে দর্শকের ভিড়। যদিও সেখান থেকেই দিব্যি আগুন দেখা যায়, তবু বিশ-ত্রিশ জন লোক গিয়ে নেমেছে একেবারে খাদের তলায় আর গালাগাল খাচ্ছে ক্রুদ্ধ দমকল কর্মীদের। কারণ, পোড়া কড়িকাঠগুলো যেভাবে পাহাড়ের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ছে তাতে সহজেই তাদের পায়ে লেগে ধরাশায়ী করতে পারে।

আস্তিকেলে ঘরগুলোকে আগুন যেভাবে গ্রাস করছে তা দেখবার জন্য লোকগুলো পেছন দিকে ঘাড় হেলিয়ে দেখছে। ছাই আর আগুন উড়ে এসে পড়ছে তাদের মুখের ওপর, আগুনের কণাগুলো ছিটকে হুল ফুটিয়ে দিচ্ছে চামড়ায়। অবিশ্যি এতে তাদের কোনো পরোয়া নেই ; তারা হল্লা করছে, আর হাসছে, জ্বলন্ত কড়িকাঠগুলো যখন গড়াতে গড়াতে তাদের পায়ের কাছে এসে পড়ছে তখন হল্লা ক'রে উঠছে। আগুন যেখানে লেগেছে তার উল্টো দিকে খাড়ি চড়াই বেয়ে উঠছে হাতে-পায়ে ঘষটে-ঘষটে, তারপর সেখান থেকে এক-একটা কালো তালের মতো লাফ দিয়ে পড়ছে খাদের ভেতরে।

বিশেষ করে একজন বেশ জমকালো চেহারার ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যেই এই তামাসা চলছিল ওদের—ভদ্রলোকের গায়ে ছিম্‌ছাম কোট, মাথায় পানামা দেশীয় টুপি, পায়ে কড়া কালো পালিসের জুতো। গোলগোল নধর মুখ, লম্বা গোঁফ। হাতে সোনা বাঁধানো লাঠি—সেটা ধরেছে উল্টো করে, ঘুরোচ্ছে গদার মতো। উপর থেকে গড়িয়ে পড়া কড়িগুলোকে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে গভীর চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠছে থেকে থেকে :

'হু র্‌ রে !'

ভিড়ের লোকজন তাকে বাহবা দিতে লাগল ; তার মাথার ওপরে লাঠিটা বনবন্‌ ক'রে ঘোরাবার সঙ্গে সঙ্গে সোনা বাঁধানো মাথার গাঁটটা ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে। তার টুপির কিনারে লেগেছে ধোঁয়ার কালো দাগ ; তার নেকটাইটা

কালো সাপের মতো লটপট করছে চিবুকের তলায়। কিন্তু এ সবে লোকটির কোনো হুঁশ্ নেই। চারিদিকের সব কিছু সম্পর্কে লোকটি একেবারেই হতজ্ঞান; একটা বাচ্চা ছেলের মতো কেবল লক্ষ্য তার—কখন একটা জ্বলন্ত কড়িকাঠ তার পায়ের কাছে এসে পড়বে আর পায়ে লাগবার আগে সে লাফ দিয়ে পাশে সরে যাবে।

এ ব্যাপারে সে নিভুর্লভাবেই এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিল।

তার দীর্ঘ চেহারা এবং স্থূলত্ব সত্ত্বেও তাকে খুবই চটপটে মনে হচ্ছিল। ওই ধরো গড়িয়ে আসছে একটা কড়িকাঠ!—ওটা তাকে আঘাত করবেই ··· কিন্তু না—ত্বরিত একটি লাফ এবং বিপদ কেটে গেল।

'হু র্‌ রা!'

এমন কি, কয়েকটা কড়িকাঠের ওপর দিয়ে কয়েকবার সে লাফ দিয়ে পার হয়ে গেল এবং চড়াইয়ের ওপরে জমাট ভিড়ের ভিতর থেকে মেয়েরা তাকে হাততালি উপহার দিলে। বেশ কিছু মেয়ের ভিড় সেখানে, হরেক রকমের পোশাক তাদের, কেউ কেউ ছাতা খুলেছে আগুনের ফুলকি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। আমার মনে হলো—লোকটা নির্ঘাৎ প্রেমে পড়েছে এবং তার হৃদয়েশ্বরীর কাছে বোধ করি তার নির্ভীকতা এবং সক্ষম ক্ষিপ্রতার নিদর্শন তুলে ধরছে।

'হুর্‌-রা ··আ!' সে চেঁচিয়ে উঠলো। তার পানামা টুপি হেলে গেছে মাথার পেছন দিকে। মুখ হয়ে উঠেছে রক্তিম এবং তার নেকটাই ঘুরপাক খাচ্ছে শূন্যে।

লুব্ধ অগ্নিশিখার কাঠ পোড়ানো কড়মড় শব্দকে ছাপিয়ে দমকলের লোকেরা সহসা চিৎকার করে উঠলো এবং একটানে তাদের আঁকসি দিয়ে কয়েকটা কড়িকাঠকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললে। জ্বলন্ত কড়িগুলো স্বর্ণাভ দ্যুতির ঝিলিক দিয়ে খাদের উৎরাই বরাবর এলোমেলো ভাবে এ-পাশ ও-পাশ থেকে গড়িয়ে আসতে লাগল এবং ক্রমশ নীচের দিকে তাদের গতিবেগ বাড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত শূন্যে একপ্রান্ত উৎক্ষিপ্ত করে রাস্তার বাঁধানো পাথরের ওপরে প্রচণ্ড শব্দে একটার পর একটা এসে গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

'হুর্‌-রা···আ—!' পানামা টুপি-পরা লোকটি তার লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে বিকটভাবে চিৎকার ক'রে উঠলো। কিন্তু একটা কড়িকাঠ ডিঙোতে না ডিঙোতেই আর একটা কড়িকাঠের প্রান্ত ধীরে ধীরে গড়াতে গড়াতে এসে পড়লো প্রায় তার পায়ের ওপর। দুটো হাত ওপরের দিকে তুলে

সে দিলে এক লাফ। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় কড়িকাঠটা তার বিরাট প্রজ্বলিত প্রান্ত নিয়ে জ্বলন্ত সাপের মাথার মতো একেবারে তার পাশে এসে হাজির। ভিড়ের ভেতর থেকে একটা তীব্র আর্তনাদ উঠলো। দমকল বাহিনীর লোকেরা তার ঠ্যাং ধরে ত্বরিতে তাকে টেনে সরিয়ে নিলে এবং একপাশে তাকে ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে গেল। এদিকে জ্বলন্ত সেই কড়িগুলোর মাঝখানে পড়ে রইলো তার পানামা টুপি। আগুনের তাপে টুপির পাশগুলো একটু একটু করে কুঁকড়ে গেল—চুপ্‌সে গেল ধীরে ধীরে; তারপর সহসা যেন মহানন্দে জ্বলে উঠলো একটা হলদে শিখা—দাউ দাউ করে আগুন ধরে গেল গোটা টুপিটায়।

॥ ৩ ॥

১৮৯৬ খৃস্টাব্দে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল নিঝ্‌নির শ্রমিকদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বাড়িতে। নীচের তলায় জাহাজের যে কাছিগুলো জমা করা ছিল, তাতে আগুন ধরে যায়। অতি দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে। তিনতলায় যাওয়ার যে লোহার সিঁড়িটা ছিল তা পুড়ে একেবারে লাল টুক্‌টুকে হয়ে উঠলো। সেখানে যে কটি বুড়ি ছিল, সবাই তারা এসে জড়ো হয়েছিল সিঁড়ির মাথার কাছে এবং তাদের সব ক'জনাই, জনা কুড়িরও বেশি হবে—রজনের ধোঁয়ায় দম আটকে আগুনে পুড়ে মারা গেল।

অগ্নিকাণ্ড প্রায় যখন শেষ তখন আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছই। ছাদটা ভেঙে পড়েছে; মোটা লোহার শিকে গাঁথা বিরাট এক ইঁটের খাঁচা থেকে আগুন প্রচণ্ডভাবে যেন টগ্‌বগ করছে, বজ্জাত ঘোড়ার মতো নাকের শব্দ করছে—উদগীর্ণ করে দিচ্ছে তেলপোড়া ঘন ধোঁয়া। জানালার আগুনে পোড়া লাল টুক্‌টুকে রেলিংগুলোর ভেতর থেকে ঘন কালো ধোঁয়ার তাল বেরিয়ে আসছে এবং জ্বলন্ত বাড়িটার ওপর দিকে খুব না গিয়ে, ছড়িয়ে পড়ছে আশপাশের বাড়িগুলোর ছাদ থেকে ছাদে এবং নেমে আসছে রাস্তার ওপরে দম আটকানো কুয়াসার মতো। আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল ক্যাপ্টেন সিসেফ। লোকটি কুখ্যাত। শহরে অনেকগুলো বাড়ির মালিক সে, বেশ স্বাস্থ্যবান গাঁট্টাগোট্টা—যদিও বয়েস ওর পঞ্চাশ এবং পানাসক্তি তার দীর্ঘ-কালের। পরিষ্কার দাড়ি-গোঁফ কামানো মুখ, গালের হাড় দুটো ঠেলে উঠেছে, চোখের গভীর গর্তের ভেতরে বসানো খুদে খুদে দুটো চোখ চঞ্চল। সাজ-পোশাক তার নিকৃষ্ট এবং যেমন তেমন ধরনের, যা সে পরে আছে মনে হয়—

ওগুলো তার নিজেরও নয়। তার সব কিছু মিলে একটা অপ্রীতিকর ভাব ফুটে বেরুচ্ছে এবং সে-সম্পর্কে সে নিজেও যথেষ্ট সচেতন মনে হয়। লোকজনের ওপরে খাপ্পা হয়ে ওঠাই তার স্বভাব এবং তাদের সঙ্গে আচার-আচরণে খোঁচা দিয়ে অশিষ্ট ব্যবহারই সে করে থাকে।

এমন দৃষ্টিতে সে আগুনের দিকে তাকিয়েছিল—যার কাছে জীবন ও তার সব অনুষঙ্গ যেন শুধু একটা দর্শনীয় বস্তুমাত্র। 'আগুনে ঝলসানো' বুড়িগুলি সম্পর্কে সে মানব-বিদ্বেষীর ভঙ্গিতেই কথা বললে এবং মন্তব্য করলে যে, সব কটা বুড়িই যদি মারা যেত তো বড় ভাল হতো। কিন্তু কি যেন একটা অস্বস্তি দেখা যাচ্ছিল তার মধ্যে—কারণ, সে তার হাতটা একবার কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল, আবার বের করে আনছিল, অদ্ভুতভাবে হাতটাকে শূন্যে একবার আন্দোলিত করে আবার পকেটে ঢোকাচ্ছিল—এবং চোরা চোখে চারদিকে নজর করে দেখছিল—কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কিনা। শেষ পর্যন্ত আমার চোখে পড়ে গেল। আমি দেখলুম তার আঙুলের ফাঁকে সযত্নে কালো ফিতে দিয়ে বাঁধা একটা কাগজের মোড়ক। কয়েকবার সে মোড়কটাকে হাতে নিয়ে লুফ্‌লে, তারপর সহসা খপ্‌ করে রাস্তার এ-পাশ থেকে ও-পাশে আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দিলে।

'যা ছুঁড়লে—বস্তুটা কি?'

'এমন বিশেষ কিছু না। ও আমার একটা কুসংস্কার—এই মাত্র।' চোখ মট্‌কে সে উত্তর দিলে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল—সে বেশ খুশি এবং হাসছিল প্রাণ খুলে।

'কুসংস্কারটা কি?'

'ওঃ, সে তোমাকে আমি বলতে পারবো না।'

এই ঘটনার সপ্তাহ দুই পরে নিঝ্‌নির এক উকিল ভেন্‌স্কির বাড়িতে আবার তার সঙ্গে আমার দেখা হলো। ভেন্‌স্কি পাঁড় মাতাল এবং বিশ্বনিন্দুক, তবে লোকটা উচুঁদরের সংস্কৃতিবান। স্বয়ং গৃহকর্তা যখন অত্যধিক মদ্যপানের ফলে সোফায় ঢলে পড়লেন তখন গত অগ্নিকাণ্ডের দিনের কথা তুলে সিসেফকে তার সেই 'কুসংস্কারের' ব্যাপারটা বলবার জন্যে রাজী করালুম। ব্রাণ্ডি মেশানো তার প্রিয় পানীয়ে চুমুক দিতে দিতে সিসেফ বলতে সুরু করলে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে। কিন্তু এটুকু আমি বেশ বুঝতে পারলুম—ভঙ্গিটা ওর জবরদস্তি ভান মাত্র।

সিসেফ বললে, 'কেটে ফেলা নখগুলো আমি আগুনে ফেলে দিই। ভারি মজার—তাই না? সেই কবে আমার উনিশ বছর বয়স থেকে এই কাটা নখগুলো আমি জমিয়ে জমিয়ে আসছি। কোথাও একটা অগ্নিকাণ্ড না ঘটা পর্যন্ত ওগুলো আমি জমিয়ে রাখি এবং কোথাও আগুন লাগলে দুটো কি তিনটে তামার পয়সার সঙ্গে ওগুলোকে বেশ জড়িয়ে আগুনে ফেলে দিই। কেন? তবে শোন, এই বোকামির ব্যাপারটা কিভাবে সুরু হয়েছিল।

'যখন আমার বয়স উনিশ তখন যত রকমের নিষ্ঠুর দুর্ভাগ্য আমাকে নাছোড়-বান্দার মতো চেপে ধরে: দুর্লভ এক নারীকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি, পায়ের জুতো ছিন্নবিচ্ছিন্ন, পকেট কপর্দকশূন্য—এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচেরও অভাব। এই সব দুর্ভাগ্যের মধ্যে আমি হতাশায় ডুবে যেতে লাগলুম এবং ঠিক করলুম—বিষ খাবো। কিছু পটাসিয়াম সায়ানাইড জোগাড় করলাম এবং স্রাস্তজোই পার্কের দিকে এগোলাম। মঠের পেছনে আমার প্রিয় একটি বেঞ্চ ছিল—সেখানে বসে মনে মনে আমি বললাম: "বিদায় মস্কো, বিদায় হে জীবন ··· তোমরা সব উচ্ছন্নে যাও!" হঠাৎ আমার চোখে পড়লো একজন মোটা মতো মহিলা আমার পাশে বসে আছেন, সর্বাঙ্গ কালো পোশাকে আচ্ছাদিত, চোখের ভ্রূদুটি জোড়া—একটা ভয়ংকর মুখ! দুই চোখ বিস্ফারিত করে মহিলাটি আমার দিকে তাকালেন—একটা অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে আমরা একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'তৎপর হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি চান?"

'তিনি কর্কশ কণ্ঠে আদেশের ভঙ্গিতে বললেন, "তোমার বাঁ হাতটা দেখাও তো বাছা।"'

গৃহকর্তার তখন নাক ডাকছে। সিসেফ তার দিকে একবার তাকালে—একবার চোখ বুলিয়ে নিলে সারা ঘরে এবং ঘরের অন্ধকার কোণগুলো দেখে নিলে একাগ্র দৃষ্টিতে, তারপর আবার সুরু করলে তার কথা—বদলে গেল তার গলার স্বর, চলে গেল কৃত্রিম তামাসার ভঙ্গি।

'আমি তাঁর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম—দিব্যি করে বলছি—তাঁর সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টির চাপ যেন আমার সর্বাঙ্গে অনুভব করলাম। তিনি অনেকক্ষণ ধরে আমার হাত দেখলেন, তারপর বললেন, "বাঁচাই তোমার নিয়তি"—ঠিক এই কথাটাই বলেছিলেন, নিয়তি। "দীর্ঘ জীবন বেঁচে থাকাই তোমার নিয়তি—আর স্বচ্ছন্দে সহজভাবে?"

'আমি তাঁকে বললাম—"ওই সব ভাগ্যগণনা, যাদু বা ডাকিনীবিদ্যায় আমি বিশ্বাস করি না।" কিন্তু তিনি জবাবে বললেন: "এই জন্যই তুমি মনমরা হয়ে বেঁচে আছ, এই জন্যই সব কিছু তোমার ভেস্তে যাচ্ছে। তুমি চেষ্টা করে দেখ এবং বিশ্বাস কর ..."

"সে কেমন করে হবে?"

"দেখ, তোমাকে একটা মতলব দিচ্ছি: তোমার নখগুলো কেটে অচেনা কোনো লোকের আগুনে ফেলে দিয়ো; শুধু এইটে খেয়াল রাখবে যে, লোকটি যেন তোমার অচেনা হয়!"

"অচেনা লোকের আগুন—মানে আপনি কি বলতে চাইছেন?"

"আমার কপাল," তিনি বললেন, "এটা বুঝতে পারা কি এতই কঠিন? দারুণ শীতের দিনে রাস্তায় কেউ কাঠকুটো জ্বালিয়েছে বা কোনো ঘরে আগুন লেগেছে। বা ধরো কারুর বাড়ির আগুন পোয়াবার জায়গায় বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বসে ..."

'অন্তরে অন্তরে সত্যি আমার মরার বাসনা ছিল না বলেই কি এটা ঘটলো? —কারণ, যতোই হোক, আমরা সকলেই শুধু তখনই মরি যখন মরতে আমরা বাধ্য হই, তাকে যতোই আমরা নিজের স্বাধীন অভিলাষ বলে মনে করি না কেন,—অথবা এটা সেই মহিলাটির দেওয়া একটা ক্ষীণ আশার উদ্দীপনা? যাই হোক, তখনকার মতো আমার আত্মহত্যার চিন্তা স্থগিত রইল। আমি বাড়ি ফিরলাম, নখ কাটলাম এবং কাটা নখগুলো একটা কাগজে মোড়ক করে রাখলাম। মনে মনে ভাবলাম, মহিলার ডাকিনীবিদ্যা প্রয়োগ করে দেখা যাবে।

'সেই সপ্তাহের মধ্যে আমার বাড়ির উল্টোদিকে ব্রন্নাইয়াদের বাড়িতে আগুন লাগল। আমি আমার মোড়কটার সঙ্গে সামান্য একটা ভারি জিনিস বেঁধে ছুঁড়ে দিলাম আগুনের মধ্যে। "যাক"—আমি মনে মনে বললাম, "কাজটা তো করা গেল—উৎসর্গ সমাধা হলো! এখন দেখা যাক—দেবতাদের সাড়াটা কি রকম পাওয়া যায়।" এক বন্ধু ছিল আমার গণিতজ্ঞ, বিলিয়ার্ড খেলায় সে ছিল একজন ওস্তাদ এবং অত্যন্ত সহজে সে আমায় হারাতে পারতো। কেবল ডাকিনীবিদ্যার শক্তি পরখ করবার জন্যেই আমি তাকে খেলতে ডাকলাম।

'সদম্ভে সে বললে, "তোমার সুবিধে হয়—এমন যা কিছু সুযোগ তুমি আগেই নিতে পারো।"

"না—কিচ্ছু চাই না।"

'আমরা খেলতে শুরু করলাম এবং আমি জিতলাম। আমার তখনকার অবস্থা তুমি কল্পনা করতে পারো। আমার মনে পড়ে—এমনভাবে আমার পা কাঁপতে লাগলো যে, দাঁড়িয়ে থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠলো। আমার বোধ হলো যেন মন্ত্রপূতঃ জলের ছিটে দেওয়া হয়েছে আমাকে। মনে মনে বললাম, "হে দেবতা, এখন কি ঘটবে আমার সেই দুর্লভ প্রেমিকার ব্যাপারে—কে জানে আমার সেখানেও জয় হবে হয়তো? সেটা তাহলে কাকতালীয় ব্যাপার মাত্র হবে না।" আমি সোজা তার কাছে গিয়ে হাজির হলাম এবং এমন বিস্ময়কর অনায়াসে আমি সাফল্যলাভ করলাম যে ব্যাপারটা আমাকে ঘাবড়ে দিলে এবং ঘুমুতে পারলাম না। এ দুটো ঘটনাই কি কাকতালীয়?

'ভালোবাসা আর ভয়—দুটো অগ্নিশিখার মাঝখানে আমি জীবন কাটাচ্ছিলাম। সেই বুড়ি ডাইনীটার সঙ্গে আমি রাতের বেলা গিয়ে দেখা করতাম: সে রাস্তার কোনো কোণায় টোনায় দাঁড়িয়ে থাকতো, লোমশ দুটো ভুরুর তলা থেকে তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতো। এর সব ব্যাপারটাই আমি আমার প্রেমিকাকে জানিয়েছিলুম। সমস্ত অভিনেত্রীর মতোই—বিশেষ করে খেলো অভিনেত্রীদের মতো সে ছিল অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠতো এবং অনুরোধ করতো, "নখগুলো কেটে ফেল আর আগুনের খোঁজ করো।" আমিও নখ কেটে জমিয়ে রাখতাম। তবে এইটে আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলি নি যে, এ সবই হয়তো বাজে এবং ব্যাপারটা হয়তো এই যে—মানুষ যখন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তখন চারদিকে তাকিয়ে কোনো একটা বিশ্বাসের খুঁটি তার খুঁজে নেওয়া উচিত।

'কিন্তু এ সব বিচার-বিবেচনা আমার অস্বস্তি কাটাতে পারলো না। কিছু কাটা নখ জমিয়ে এবং সেগুলোকে আগুনে বিসর্জন দিয়ে আবার একবার আমি এক পৈশাচিক ব্যাপার লক্ষ্য করলুম: বেটে-খাটো একটি টেকো ভদ্রলোক হাতে একটা ডেসপ্যাচ ব্যাগ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি বললেন, "আপনার একজন অবিবাহিতা পিসী ছিলেন—নিব্নি নোভগোরদে, সম্প্রতি তিনি মারা গেছেন এবং আপনি হচ্ছেন তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী।" এর আগে কখনো—কস্মিনকালে এ ধরনের পিসী-মাসীর কথা আমি শুনি নি, বাস্তবিক পক্ষে যেমন ছিলুম আমি অর্থহীন—তেমনি আত্মীয়হীন। থাকার মধ্যে ছিল মাত্র দুজন: মায়ের দিক থেকে আমার মাতামহ—যিনি এক

আশ্রয়শিবিরে মাথা গুঁজেছিলেন। আর ছিলেন এক কাকা—তিনি জেল ইন্সপেক্টর, বিরাট পরিবারের ভারে বিপর্যস্ত—যাঁকে আমি কোনোদিন দেখিই নি।

'আমি সেই বেঁটে-খাটো টেকো ভদ্রলোকটির দিকে তাকালাম এবং ভদ্র-ভাবেই বললাম: "বোধ হয় আপনি পিশাচ।" তিনি মর্মাহত হলেন এবং জানালেন যে, তিনি একজন আইনজ্ঞ এবং আমার পিসীর একজন পুরনো বন্ধু।

"বোধকরি সে বৃদ্ধা মহিলাটিই আপনাকে পাঠিয়েছেন?" আমি বললাম।

'জবাবে তিনি বললেন, "হ্যাঁ—তাই—অবশ্যই তিনি একজন বৃদ্ধা মহিলা—শেষ জন্মদিনে তাঁর বয়স হয়েছিল সাতান্ন।"

'এমনভাবে তাঁর দিকে আমি তাকালাম—যাতে ঘৃণার মতই একটা ভাব মেশানো ছিল। আমি তাঁকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে জানিয়ে দিলাম যে, তাঁর এই উদ্যমের কোনো মূল্যই আমি কিন্তু দিতে পারবো না।

'তিনি বললেন, "আপনি আপনার পিসীর ধন-সম্পদের অধিকার পাওয়ার পর আমাকে পারিশ্রমিক দেবেন।"

'বৃদ্ধটি বিশ্রী এক ধরনের—অত্যন্ত গায়ে-পড়া এবং বেশ জাঁকালো স্বভাবের, আর এটাও বেশ লক্ষ্য করলাম যে, তিনি আমাকে তাচ্ছিল্যই করছেন। তিনিই আমাকে এখানে এনে হাজির করেছেন এবং এইভাবেই আমি এখানকার এতগুলো বাড়ির মালিক। স্বাভাবিক কারণেই আমি মনে মনে এইরকম একটা ছবি এঁকে নিয়েছিলুম যে, উত্তরাধিকার হিসেবে পাব বোধ হয় গোটা তিনেক জানালাওয়ালা একটা ছোটমতো কাঠের বাড়ি, ক্যাশ টাকায় শ' পাঁচেক রুবল আর একটা গরু। কিন্তু পেলাম দুটো বাড়ি, দোকান, স্টোর, ভাড়াটে এবং অবশিষ্ট আরও অনেক কিছু। দিব্যি কারবার! কিন্তু যেমন হোক, এসব নিয়ে আমার স্বস্তি ছিল না; একটা অজ্ঞাত নিগূঢ় ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আমার জীবন যেন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আর মহামান্য অগ্নিদেব সম্পর্কে একটা অদ্ভুত ধারণা গড়ে উঠছে আমার—বুনো মানুষের যেমন এক-একটা ধারণা থাকে বিশেষ একটা সত্তা সম্পর্কে, যা সুখ ও চরম পরিণাম দুটোই বহন করে আনে।

'নিজেকে বললাম, "নাঃ—এ সবকে খতম করতে হবে—এ চলবে না—এ আমি চাই না।"

'এবং তাই শুরু করলাম আমার সম্পদকে ধোঁয়া আর ছাই করে উড়িয়ে

দিতে। শেকলে বাঁধা কুকুরের মতো অশ্রান্তভাবে ছটফট করতে লাগলাম, শুরু হলো উচ্ছৃঙ্খল জীবন। এবং তখনো চলছিল আমার সেই নখ কাটা, তেমনি সেগুলো সংগ্রহ করা ও অচেনা লোকের আগুনে সেগুলো ছুঁড়ে ফেলা। এটা আমি কেন করতাম অথবা এই ডাকিনী-বিদ্যায় আমি বিশ্বাস করি কি না—তা আমি ঠিক বলতে পারবো না। যাই হোক, সেই বুড়িকে আমি ভুলতে পারবো না—যদিও মনে হয় সে অনেক দিন আগেই মারা গেছে।

'এ সমস্ত কিছুর মানে কি ? আমি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়লাম, একটা নিন্দনীয় আরামের জীবনযাপান করতে লাগলাম এবং পুলিসের কতটা ধৈর্য, আমার পুরুষত্বের ক্ষমতাই বা কতটা এবং ভাগ্যের দাক্ষিণ্যই বা কতখানি—এগুলোকে যাচাই করবার জন্য একটা অস্থির ঔদ্ধত্য আমাকে উত্তেজিত করে তুলতে লাগল। এবং আমি আঁচড়টুকু না লাগিয়েও সমস্ত বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলুম। এ সব সত্ত্বেও আমি স্থিরনিশ্চয় ছিলাম যে শীগ্‌গিরই কেউ একজন এসে বলবে, "অনুগ্রহ করে যদি এ পথে পা দাও।" সে কে এবং কোন্ পথে আমাকে নিয়ে যাবে সে আমি জানি না—কিন্তু আমি তার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। আমি পড়তে শুরু করেছিলাম সুইডেনবোর্গ, জ্যাকব বেহ্‌মে, ড্যুপ্রেনিল—কি জঞ্জাল ? আমি বলি ওকে—মানববুদ্ধির অসম্মান ! আমি রাত্রিতে জেগে উঠতাম এবং প্রতীক্ষা করতাম। কিসের জন্য ? ঠিক সেইটের জন্য। যদি কোনো এক ধরনের পৈশাচিক ব্যাপার সম্ভব হয়, তা হলে অন্য ধরনের কোনো কিছুই বা সম্ভব হবে না কেন—তা প্রথমটার চেয়ে ভালো আর মন্দ যা-ই হোক। এমন একটা ঘটনার জন্য আমি অবশ্য কিছুই করি নি এবং আশ্চর্য হই এই জন্য যে, কেন আমি পাগল হয়ে যাই নি। আমি ছিলাম ধনবান কুমার, মেয়েরা আমাকে পছন্দ করে, তাদের বাজিতে আমি লক্ষণীয়-ভাবে সৌভাগ্যবান। উপরন্তু আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ বদমাস বা জোচ্চোর ছিল না। এটা ঠিক যে তারা সকলেই মাতাল, কিন্তু যাই হোক তারা সকলেই সুন্দর লোক। এইভাবে জীবন কাটিয়ে আমি পঞ্চাশ বছরে এসে পড়েছি এবং এই বয়সে প্রত্যেক লোকেরই কোন-না-কোনো একটা সংকট আসা উচিত—যাকে বলা হয় সাধারণ দণ্ড। আর, আমি সেই সংকটের প্রতীক্ষা করছি।

'কিয়েভে—যেখানে এক সময় আমি ব্যবসা করতাম, সেখানে এক অভিজাত পোল ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা বেশ গোলমাল পাকিয়ে তুললাম এবং তিনি আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। এই তো—এই তো এসে গেল সেই

সংকট—আমি মনে মনে বললুম। দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আগের দিন সন্ধ্যায় পোড়োলে এক অগ্নিকাণ্ড ঘটলো (কিয়েভের নিম্নাঞ্চলে) ; ইহুদিদের কিছু ঘর বাড়ি পুড়ে গেল। আমি গিয়ে হাজির হলাম সেখানে—আমার সঞ্চিত কাটা নখগুলো ফেলে দিলাম আগুনে এবং মনে মনে কামনা করলুম—আগামীকাল আমি যেন মারা যাই বা অন্তত সাংঘাতিকভাবে আহত হই। কিন্তু সেইদিন সন্ধ্যেতেই পোল ভদ্রলোকটি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। সহসা তাঁর ঘোড়া ঘাবড়ে গিয়ে তাঁকে ফেলে দিলে এবং তাঁর ডান হাতটি আর মাথাটি গেল ভেঙে। তাঁর সমর্থক একজন এই খবরটি আমায় এনে দিলে এবং আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—"কিভাবে ব্যাপারটা ঘটলো ?"

'তিনি বললেন, "এক বুড়ি তাঁর ঘোড়ার পায়ের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

'বুড়ি ! বুড়ি ! জাহান্নমে যাক ! আবার সেই কাকতালীয় ব্যাপার, সবটাকে ঘুলিয়ে দিলে ! জীবনে এই প্রথম আমি বায়ুরোগের কবলিত হলাম এবং স্যাক্সোনির পাহাড়ী স্বাস্থ্য নিবাসে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পাঠানো হলো। সেখানকার অধ্যাপককে আমি গোটা কাহিনীটার বিবরণ দিলাম।

'জার্মান ভদ্রলোকটি বললেন, "বাঃ বেশ চিত্তাকর্ষক ঘটনা তো।" তিনি এ রোগের নাম বললেন—ল্যাটিন ভাষায়, কি একটা পোকার নাম যেন। তিনি আমাকে খুব স্নান করাতেন এবং মাস দুই পাহাড়ের ওপর-নীচে খুব দৌড় করালেন। কিন্তু এ চিকিৎসায় কিছুই হলো না। সেই একই ভাব আমার গেল না এবং আগুনের জন্যে আমি উন্মুখ হয়ে থাকতাম। বুঝতে পারছো, আমি কি বলতে চাচ্ছি? যাকে বলে—আমি ঠিক লালায়িত হয়ে থাকতাম। অচেনার আগুন চাই। এবং আমি তেমনিভাবে কাটা নখ জমিয়ে যেতে লাগলাম।...নিজেকে আমি বোঝাতাম, "আমি জানি এ সবই বোকামী, অবশ্যই সব বাজে এবং কুসংস্কার।" কিন্তু নখগুলো যেমন সঞ্চয় করে রাখতুম, তেমনি চলতে লাগলো।...

'এর কিছুদিন পরে আমি বাড়িগুলো বাঁধা দিলাম, কারণ টাকা-পয়সা সব প্রায় খতম হয়ে আসছিল। "আচ্ছা, তারপর কি ঘটবে?"—নিজেকে আমি জিজ্ঞেস করতাম। আমি ঘুরতে বেরুলাম—নুরেনবার্গ, অগসবার্গ এবং এমনি কত দেশ। ওঃ, কি নিদারুণ সেই দিনগুলো। একদিন হোটেলের হলে বসেছিলাম, পাশে চুলোর মধ্যে দিলাম ফেলে আমার সঞ্চিত নখগুলো। পরের দিন সকালে, তখনো আমি বিছানা ছেড়ে উঠিনি, কে এসে যেন আমার

দরোজায় ধাক্কা দিলে : টেলিগ্রাম এসেছে খবর নিয়ে যে, কোম্পানীর কাগজের লটারীতে একটায় পেয়েছি পঞ্চাশ হাজার রুবল, আর একটায় হাজার রুবল ! আমার বেশ মনে পড়ে—বিছানায় বসে বসে আমি সভয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছিলাম আর জংলির মতো দিব্যি গালছিলাম। আমি ভয় পেয়েছিলাম—বোকার মতো, নির্লজ্জের মতো—মেয়েলোকের মতো।

'বুঝলে, এই অসম্ভব ব্যাপারের সব কিছু বলতে গেলে অনেক সময় নেবে। এই নিয়ে আমি এখানে চৌত্রিশ বছর কাটাচ্ছি। আমার নিজের সর্বনাশ করবার জন্য, ঘাড় মটকাবার জন্য আমি সব রকমের চেষ্টা করেছি, আমার কথা বিশ্বাস করো। কিন্তু দেখো, দিব্যি আমার বাড়-বাড়ন্ত। এখন ও সব নিয়ে ভাবনা-চিন্তা আমি ছেড়ে দিয়েছি। ঘটুক কি ঘটবে—আর পরোয়া করি নে।'

এটা অবশ্য স্পষ্ট যে—সে খুবই পরোয়া করে, কারণ, তার ঠেলেওঠা গাল রাগে লাল হয়ে উঠেছে, তার মুখের ভাবে কেমন একটা ঘৃণা মেশানো, তার তীক্ষ্ণ ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটো ক্রোধে ঝকঝক করছে।

'এখনো কেন তা হলে তোমার কাটা নখ আগুনে ফেল ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ভাল, ও ছাড়া আমি বাঁচবো কি নিয়ে ? জীবনে আমার আর প্রতীক্ষা আছে কিসের ? এই পৈশাচিক যাদুর একদিন-না-একদিন শেষ হবে—হবে না ? হয়তো হবে না। হয়তো মরবার সুযোগ আমি কোনো দিন পাবো না, নাকি ?'

ভীষণভাবে সে দাঁতে দাঁত চাপলে এবং চোখ বন্ধ করলে। তারপর একটা চুরুট ধরিয়ে তার শেষ প্রান্তটার দিকে চোখ রেখে নিচু গলায় বলতে লাগল :

'রসায়ন শাস্ত্র অবশ্যই রসায়ন শাস্ত্র, কিন্তু তবু আমাদের জ্ঞানের অতীত কিছু একটা লুকিয়ে আছে আগুনের মধ্যে, যেটা আমরা বুঝি না। এবং আগুন অপূর্বভাবে, এমন কি সুচতুর কৌশলে সেটাকে ঢেকে রাখতে পারে। আর কেউ—কোনো কিছুই তেমন করে পারে না। সামান্য একটু তুলো, কয়েক ফোঁটা সালফিউরিক এ্যাসিড, কয়েক গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাস আর তারপর।...'

জিভে একটা শব্দ ক'রে সে থেমে গেল।

আমি তাকে বললাম, 'আমার মনে হয়—তুমি তোমার কথাটা বেশ ভালোভাবেই প্রকাশ করেছে এই বলে যে—যখন কেউ তার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারায় তখন বাইরের কিছু দরকার হয় সেই বিশ্বাসকে খাড়া করে তুলতে। যাক—তা তো তুমি পেয়েছ।'

আমার কথার সমর্থন করে যেন সে ঘাড নাড়লো—কিন্তু স্পষ্টই মনে হলো আমার কথা সে কিছু বোঝেও নি, শোনেও নি। কারণ মুহূর্তক্ষণ পরেই কপাল কুঁচকে সে বললে :

'কিন্তু এ সবই অসম্ভব কাণ্ড—তাই না? কেন সে আমার নখ চায়? তুমি কি মনে করো?'

* * *

এর বছর দুই পরে শুনেছিলাম—রাস্তার মাঝখানেই একবার তার স্ট্রোক হয় এবং সেইখানেই মারা যায়।

॥ ৪ ॥

পাদ্রী জোলেৎনিৎস্কি প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধতা করায় তিরিশ বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং সেই তিরিশ বছর কেটেছিল তাঁর মঠের এক কারাগারে। যদি না আমার ভুল হয়—যতদূর মনে পড়ে, তিনি সুজদালে এক পাহাড়ী গুহায়, কড়া পাহারায় নিঃসঙ্গ কারাবাসে দণ্ডভোগ করেছেন। একাদশ সহস্র দিন ও রজনীর ক্লান্তিকর প্রহরগুলি ধরে খৃস্টপ্রেমিক, গীর্জার এই বন্দীটির একমাত্র সান্ত্বনা ও সঙ্গী ছিল আগুন। অন্য কারুর সাহায্য না নিয়ে নিজেই সে তার কারাকক্ষের চুলোর আগুনটুকু জ্বালাতে পারবে—এই ধর্মদ্রোহীকে এই অনুমতিটুকু (বা স্বাধীনতা) দেওয়া হয়েছিল।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকেই জোলেৎনিৎস্কি কারামুক্ত হন। তখন তাঁর বিরুদ্ধে আনীত ধর্মমতের কথাই শুধু তিনি বিস্মৃত হন নি, তার মননশক্তির ক্রিয়াও গিয়েছিল একেবারে থেমে। তাঁর যেটুকু আলো ছিল, বাস্তবিক পক্ষে তা তখন নিভে গেছে। সুকঠিন কারাবাসে হাড় পর্যন্ত শুকনো, পৃথিবীর বুকে বাস করা মানুষের একটা আদল মাত্র তখন অবশিষ্ট। তিনি ঘুরে বেড়াতেন মাথা হেঁট করে—যেন তিনি কেবলই ডুবে যাচ্ছেন, ঢুকে যাচ্ছেন কোনো গর্তে। তাঁর দুর্বল শোচনীয় দেহটাকে কোথাও লুকোবার জন্য যেন তিনি একটা আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাঁর স্তব্ধ চোখ দুটো ক্রমাগত জলে ভরে আসতো, মাথাটা নড়তো নড়বড় করে এবং অসংলগ্ন কথাগুলো তাঁর বোঝাই যেত না। তাঁর দাড়ির চুলগুলো আর শাদাও নেই বরং ম্লান শুকনো মুখের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনভাবে তা যেন নিঃষেষিত প্রাণ পচা—সবজে সবজে। আধবোকা মানুষটি এবং সমস্ত মানুষ সম্পর্কে একটা ভীতি নিয়ে কাটিয়েছেন জীবন।

তাদের ভয় থেকেই গড়ে তুলেছিলেন তাঁর নিজের অহেতুক এক ভীরু মানসিকতা। যখনই কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আসত অমনি তাঁর দুটো শিশুর মত খুদে খুদে শীর্ণ হাত আত্মরক্ষার জন্যে সামনে তুলে ধরতেন—যেন তাঁর চোখ বরাবর এখুনি ঘুষি এসে পড়বে এবং দুটো কম্পমান রুগ্ন হাত দিয়ে তিনি তাকে ঠেকাবেন। অত্যন্ত শান্ত মানুষটি, কথা বলতেন অত্যন্ত কম—সব সময়ে চুপে চুপে, ভয়-তরাসে, ফিস্ ফিস্ করে।

কারাগার ছেড়েছিলেন তিনি অগ্নি-উপাসক হয়ে। যখন তাঁকে চুল্লোর কাঠের স্তূপে আগুন ধরাতে অনুমতি দেওয়া হতো—বসতেন আগুনের সামনে, দেখতেন চেয়ে চেয়ে—তখুনি তাঁর মধ্যে একটা উত্তেজনার সঞ্চার হত। একটা ছোট্ট নীচু টুলের ওপর বসে যেন সস্নেহে কাঠের টুকরোগুলোয় আগুন ধরিয়ে দিতেন। আগুনের ওপরে করতেন ক্রশ চিহ্ন আর মাথা নেড়ে নেড়ে বিড় বিড় করে উচ্চারণ করতেন কতগুলো শব্দ—যেকটা কথা তখনও তাঁর স্মৃতিতে টিকে আছে:

'তুমিই সেই-ই…শাশ্বত অগ্নি…পাপীদের দগ্ধ করেছ।…হে সর্বব্যাপী ..."

ছোট্ট একটা খোঁচানি দিয়ে আস্তে আস্তে ঠেলে দিতেন জ্বলন্ত কাঠের টুকরোগুলো। এমনভাবে সামনে ও পেছনে দোল খেতেন যেন এখুনি মাথাটা ঢুকিয়ে দেবেন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে, তাঁর সেই সবজে শীর্ণ দাড়ির চুল দু-একটা ঝরে পড়তো আগুনের ওপর।

'পূর্ণ হবে তোমার অভিলাষ।… পবিত্র হোক্ তোমার মূর্তি চিরকাল—চিরকাল।… এবং তারা উড়ছে … দেখ, তারা উড়ছে।… মূর্তিমান অগ্নি থেকে ধোঁয়ার মতো।… প্রসংশিত হোক তোমার নাম ·· হে অনির্বাপনীয়।…'

যে সব হৃদয়বান মানুষ তাঁকে ঘিরে থাকতো তারা তাঁকে দেখে অবাক হয়ে ভাবত—মানুষ মানুষকে কতটা অত্যাচার করতে পারে এবং প্রাণশক্তির দীপ্তিও কত অজেয়।

জোলেংনিৎস্কি যখন প্রথম বৈদ্যুতিক আলো দেখলেন, কাচের আধারের ভেতর বর্ণহীন শ্বেতশুভ্র বন্দী আলো তাঁর সামনে যখন রহস্যময়তায় ঝলকে উঠল তখন তাঁর ভয়ের আর অন্ত ছিল না। একাগ্র দৃষ্টিতে মুহূর্ত কয়েক তার দিকে তাকিয়ে থেকে বৃদ্ধ হতাশায় হাত নাড়লে এবং করুণ কণ্ঠে বিড়বিড় করতে লাগল:

'কী! আগুনও বন্দী! হায়—হায়! … কেন? ওর মধ্যে শয়তান নেই তো? —আছে না কি? ওঃ হো, কেন এমন ওরা করলে?'

তাঁকে শান্ত করতে কিছু সময় লেগেছিল। তাঁর বোকাবোকা, ফ্যাকাসে চোখ থেকে ঝরে পড়তে লাগল অশ্রুর বিন্দুগুলি, কাঁপতে লাগলো তার সর্বাঙ্গ এবং চারদিকে জড়ো মানুষদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিষাদভরা কণ্ঠে বললেন :

'ঈশ্বরের দাস তোমরা, কেন এমন করলে? সূর্যের রশ্মিকে বন্দী করেছ! হায় মহাপাপীর দল, অগ্নির ক্রোধ থেকে সাবধান হও।'

যারা তাঁর একান্ত কাছে দাঁড়িয়েছিল—তাদের কাঁধে আলতোভাবে তাঁর সেই খুদে খুদে বিশীর্ণ কম্পিত দুটি হাত রেখে তিনি ফুঁপিয়ে উঠলেন :

'ছেড়ে দাও—ওকে মুক্তি দাও!'...

॥ ৫ ॥

আমার কর্তা এ. আই. লানিন অফিসে ঢুকতে ঢুকতে বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, "আমাদের সেই মক্কেলটির সঙ্গে দেখা করবার জন্য এইমাত্র হাজতে গিয়েছিলাম। তাকে দিব্যি শান্তশিষ্ট মানুষ বলেই মনে হয়—কিন্তু পুলিসে হলপ করে বলছে, চার চারটে অগ্নিকাণ্ডের অপরাধ তার। অভিযোগপত্র খুবই জোরালো, সাক্ষী প্রমাণও অপরাধ প্রমাণ করছে। লোকটা স্পষ্টই ভয়ে কাহিল হয়ে পড়েছে এবং ভয়ে একটা কথাও বলতে পারলে না। তার পক্ষ সমর্থন যে আমি কিভাবে করব বুঝতে পারছি না।"

পরে সন্ধ্যেবেলা কর্তা তাঁর টেবিলে কাজ করতে করতে ছাদের দিকে তাকিয়ে হতাশ কণ্ঠে বললেন :

"আমার স্থির বিশ্বাস, লোকটা নিরপরাধী। ..."

এ. আই. লানিন ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ও করিৎকর্মা আইনজ্ঞ। তিনি এজলাসে চমৎকার ভাষায় এবং অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবেই সওয়াল করতে পারেন। কিন্তু এই প্রথম তাঁকে দেখা গেল—মক্কেলের ভাগ্য সম্পর্কে তিনি বিচলিত।

পরের দিন আমি কোর্টে গেলাম। আমাদের মোকদ্দমাই ছিল তালিকায় প্রথম। আসামীর কাঠগড়ায় বসেছিল প্রায় বছর বিশ বয়সের এক যুবক—মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লালচে চুল। মুখটা খুবই সাদা দেখাচ্ছিল—আর নীলচে কটা চোখ দুটো বিস্ফারিত। ঠোঁটের ওপর সোনালী ক্ষীণ গোঁফের রেখা, ঠোঁট দুটো লাল টুকটুকে। প্রধান জজ সাহেব ভি. ভি. বেহ্‌র বা

সরকারী উকিল যখনি কোনো কথা জিজ্ঞেস করছে অমনি সে লাফ দিয়ে উঠে ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিচ্ছে।

"জোরে বলো!" জজ বললেন।

গলা ঝেড়ে সে গলা পরিষ্কার করে নিলে কিন্তু কথা বলতে লাগল তেমনি ক্ষীণ কণ্ঠে। ফলে জজ ও জুরিরা গেল চটে এবং অন্য সকলেও হয়ে উঠলো বিরক্ত। জানালার কাচের শার্সিতে একটা প্রজাপতির ডানা ঝাপটানি ঘরের ভেতরের বিরক্তিকর আবহাওয়াটাকে গুরুভার করে তুলেছে।

"তাহলে ·· তুমি তোমার অপরাধ স্বীকার করছ না?··· সাক্ষী প্রিয়াখিনকে তলব কর।"

সাক্ষীর কাঠগড়ায় ঢ্যাঙা মতো একচোখ কানা এক বৃদ্ধ এগিয়ে এলো। অবিচল, কাঠিন্যে ভরা তার মুখ এবং গালভরা দীর্ঘ পাকা দাড়ি। তার পেশা কি জিজ্ঞাসা করা হলে বৃদ্ধ উত্তর দিল বিরস গলায়, "খয়রাতে দিন চলে।" মাথাটা একদিকে কাৎ করে ঘ্যান ঘ্যান করে বলে চলল:

"আমি শহর থেকে ফিরছিলাম, খুবই দেরি হয়ে গিয়েছিল। সূর্য অস্ত গেছে অনেক্ষণ আগে। যখন আমি গ্রামের কাছাকাছি এসেছি তখন আমার সামনে অন্ধকারে একটা আলো দেখতে পেলাম। আর হঠাৎ সেটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।···"

আসামী কাঠগড়ার একটা কানা শক্ত করে ধরে বসেছিল, মুখ অর্ধ বিস্ফারিত, শুনছিল গভীর মনোযোগে। চোখে তার অদ্ভুত এক দৃষ্টি,— তার মনোযোগ যেন সাক্ষীর ওপর নয়, বরং উল্টোদিকের দেওয়ালটার ওপর নিবিষ্ট।

"যখন দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল তখন আমি ছুটতে লাগলাম।"

"কি জ্বলতে লাগল?"

"আগুন, শিখা।···"

আসামী সামনের দিকে একটু ঝুঁকল এবং হঠাৎ জোর গলায় প্রশ্ন করে উঠল। কণ্ঠস্বরে মেশা ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধা:

"এত সব কখন ঘটলো?"

"তুমিই ভাল করে জান কখন তা ঘটল।" তার দিকে না তাকিয়ে ভিক্ষুক জবাব দিলে।

আসামী ছোকরা উঠে দাঁড়াল এবং জজসাহেবকে সম্ভাষণ করে বললে:

"ও মিথ্যে কথা বলছে। আগুন যেখানে জ্বলছিল—রাস্তা থেকে সে জায়গাটা দেখা যায় না।..."

টিকোলো নাক, বেঁটেখাটো আনইজ্ঞ সরকারী উকিল সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুঁড়ে তাকে নির্বাক করে দিলে। আসামী আবার তার ঢিলেমীর মধ্যে কুঁকড়ে গেল এবং ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিতে লাগল অনিচ্ছায়। ফলে জুরীরা তার ওপর আরও বিরূপ হয়ে উঠল। তার নিজের উকিলকেও সে একই ভাবে নিস্পৃহ অলস মেজাজে উত্তর দিতে লাগল।

জজসাহেব হুকুক দিলেন, "তোমার ঘটনা বলে যাও সাক্ষী।"

"আমি তখনও ছুটছিলাম। তারপর হঠাৎ এই ছোকরা লাফ দিয়ে একটা বেড়া ডিঙিয়ে আমার ওপর এসে পড়ল।"

আসামী ছোকরা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে হেসে উঠল এবং মেঝেতে পা ঘষে বিড় বিড় করে কি যেন বললে।

ভিক্ষুকের জেরা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলো মোটাসোটা এক কৃষক—পরিষ্কার হেঁড়ে গলায়, সাবধানে বাছা বাছা শব্দে দ্রুত সে বলে গেল :

"ওই ছোকরা সম্পর্কে আমাদের অনেক দিনের সন্দেহ, যদিও দেখতে ও শান্তশিষ্ট এবং তামাক-টামাকও খায় না ; কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি—ও আগুন নিয়ে খেলা করতে ভালবাসে।... আমি শেষ ট্রেনে বাড়ি ফিরেছিলাম—আকাশে মেঘ ছিল। হঠাৎ, মাঠে যেখানে ফসলের গাদা—হুস্ করে ঠিক হাউয়ির মতো কি যেন ছুটে গেল।"

আসামী লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রক্ষীদের একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ক্রুদ্ধ গলায় চিৎকার করে উঠল :

"মিথ্যা কথা বলছ, আহাম্মক! হাউয়ির মত, তাই না। এ ব্যাপারের তুমি কি জান? আগুন বুঝি ওই রকম ভাবে কখনো জ্বলে ওঠে! হুস্... আর অমনি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। তুমি অন্ধ, তোমরা সকলে! প্রথমে খুদে খুদে শিখা দেখা যায়—আস্তে আস্তে লাল শিখাগুলো শামুকের মত গাদার আশ-পাশে বেয়ে বেয়ে আসে, তারপর তারা বড় হয়ে ওঠে এবং এক সঙ্গে জড়ো হয়। এ সবের পরেই সবটা দপ্ করে জ্বলে উঠতে পারে! আর তুমি বলছ কিনা—'হঠাৎ!'..."

তার মুখ হয়ে উঠল টকটকে লাল, মাথা নাড়তে লাগল ঘন ঘন এবং চোখ জ্বলে উঠল আগুনের মত। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। উপদেশাত্মক

ভঙ্গীতে অত্যন্ত জোর দিয়ে দিয়ে কথা বলতে লাগল সে। জজসাহেবরা, জুরিরা, সমবেত শ্রোতারা নীরবে স্তব্ধ হয়ে বসে শুনতে লাগল তার কথা। নিজের জায়গা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এ. আই. লানিন তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে খুব খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। আসামী তার দুই বাহু মেলে দাঁড়িয়েছে—তুলে ধরেছে মাথার ওপরে, বলে চলেছে উত্তেজিত ভাবে:

"হ্যাঁ, আগুন ধরতে সুরু করে এই ভাবেই। তারপর সুরু হয় তার কাজ, ঝড়ে নড়ে ওঠা মাস্তুলের মত। একবার ওই রকম হয়ে উঠলে ও হয়ে ওঠে পাখির মত দ্রুত। তখন আপনারা কেউ তাকে আর ধরতে পারবেন না—হ্যাঁ, পারবেন না! প্রথমে শামুকের মতো বেয়ে বেয়ে আসে, এবং তা থেকে জ্বলে উঠতে থাকে শিখা—ওই শিখাগুলো থেকেই সুরু হয় সর্বনাশ, ওই শামুকের মত লাল শিখাগুলো। আপনাদের ওইগুলোকে রুখতে হবে, ওইগুলোকে ধরে ধরে ফেলতে হবে ইঁদারায়! এ ব্যাপারে চালুনি ব্যবহারই ভাল ব্যবস্থা—গম ঝাড়াইয়ের জন্যে যেমন লোহার চালুনি দরকার হয় তেমনি চালুনি। লাল শামুকগুলোকে চালুনি দিয়ে ধরুন এবং জলায়, নদীতে বা ইঁদারায় নিয়ে ফেলুন। তাহলে আগুন আর থাকবে না। আপনারা সেই প্রবাদটা জানেন: আগুনকে সময়ে যদি রুখতে না পার তা হলে সে জ্বলে উঠবে। ওই বোকাগুলো অন্ধের মতো, সব্বাই মিথ্যে কথা বলে গেছে। ..."

আগুন-সন্ধানী তার নিজের জায়গায় আবার চেপে বসল। বক্তৃতার সময় কেশরের মত মাথার এলোমেলো চুলগুলো একবার ঝাঁকি দিলে, নাক ঝাড়লে এবং একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। আমাদের গোটা মোকদ্দমা ভূমিস্যাৎ। কারণ তার পরের কয়েকটা কথায় জানা গেল, সে পাঁচ-পাঁচটি অগ্নিকাণ্ডের জনক। কিন্তু কণ্ঠে যথেষ্ট উদ্বেগ মিশিয়ে ব্যাখ্যা স্বরূপ বললে:

"হতচ্ছাড়া ওই শামুকগুলো ... বড্ড তাড়াতাড়ি ছোটে, ওদের ধরতে পারা যায় না।"

ভি. ভি. বেহ্‌র বিরস মামুলি কণ্ঠে দণ্ডাজ্ঞা দিলেন: "..কৃতকর্মের জন্য আসামীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিধায় ..."

লানিন বিজ্ঞ কোনো চিকিৎসকের মতামতের জন্য আবেদন করলেন। বিচারকেরা খাটো গলায় নিজেদের মধ্যে খানিক পরামর্শ করে নিয়ে সে আবেদন অগ্রাহ্য করলেন। সরকারী উকীল ছোটখাট একটা সওয়াল করলেন—জবাব দিলেন লানিন বেশ দীর্ঘ এবং বাক্‌চাতুরীপূর্ণ। তারপর

জুরীরা উঠে গেল এজলাস ছেড়ে এবং মিনিট সাতেক পরে ফিরে এসে তাদের সিদ্ধান্ত জানাল :

"আসামী অপরাধী।..."

সিদ্ধান্তটা বেশ বিজ্ঞের মতই সে শুনল। লানিন যখন পুনর্বিচারের আবেদন করার প্রস্তাব করলেন, দণ্ডিত লোকটা জবাব দিল নিস্পৃহভাবে—যেন ব্যাপারটা সম্পর্কে তার কোনো আগ্রহই নেই। বললে :

"বেশ তো—আপনি যদি চান, আপীল করতে পারেন।"

ছোকরার কানে কানে রক্ষী কি যেন বললে এবং ছোক্‌রা বেশ উঁচু গলাতেই তাকে জবাব দিলে :

"নিশ্চয়ই, আমি বলছি—ওরা সকলে অন্ধ, ওদের সব কটাই।"

॥ ৬ ॥

১৮৯৩ সাল কি '৯৪ সালে, ভলগার তীরবর্তী-নিঝ্‌নি-নোভগোরোদের অপর পারে জঙ্গলে বিরাট এক অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায়। আগুন ছড়িয়ে পড়ে প্রায় তিন শ' বিঘের মত জায়গা জুড়ে। শহরের ওপর ঝাঁকিয়ে রইল একটা তির্‌ত্‌কুটে শাদা ধোঁয়ার আস্তর। সেই ধোঁয়ার মধ্যে ঝুলে রইল কমলালেবু রংয়ের একটা সূর্য—যে সূর্যের রশ্মি নেই, একটা কিম্ভূত, শোচনীয় সূর্য, ভলগার ঘোরলাগা জলের ওপরে জ্বলজ্বল করছে ব্যাধিগ্রস্তের মতো। যেন এখুনি ডুবে যাবে নদীর কর্দমাক্ত তলায়। ভলগার তীর সংলগ্ন তৃণভূমি রূপান্তরিত হয়েছে পিঙ্গল বর্ণে এবং খোদ শহরটাকে মনে হচ্ছে একটা ম্যাটম্যাটে কাদাটে রঙে ছোপানো। ধোঁয়াটে শ্বাসরোধী কুয়াশার মধ্যে যেন থেমে গেছে সব শব্দ; মৌমাছিরা উধাও হয়ে গেছে বাগান ছেড়ে। এমন কি অদম্য চড়াইগুলো পর্যন্ত কিচ্‌মিচ করছে বড় নীচু গলায় এবং উড়ছে গতির দ্রুততা হারিয়ে।

একটা বিবর্ণ সূর্য ভলগার জলে ও পৃথিবীর অন্তরালে ডুবে যাচ্ছে—এবং তার অস্তরাগের কোনো দীপ্তি নেই—দেখতে কেমন বিষণ্ণ লাগে। রাতের বেলা যে কেউ দেখতে পাবে, দূরে অরণ্যের কালো দেওয়ালের ওপর আদ্যিকালের রূপকথার সেই ড্রাগনের মতো আগুন তার খাঁজকাটা শিরদাঁড়াটা নাড়া দিচ্ছে এবং আকাশভরে উদ্‌গীরণ করছে কালো মেঘের নিঃশ্বাস।

রাস্তাঘাটে ভরে গেছে ধোঁয়া, কোঠাগুলোর ঘরে ঘরে ধোঁয়া—সারা শহরটাই যেন ধোঁয়া ভরা একটা ঘর। অভিসম্পাত দিতে দিতে এবং কাশতে

কাশতে মানুষজন রাতের দিকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াচ্ছে নদীর উঁচু বাঁধের ওপরে, ঢালের গায়ে। দূরের অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেউ বরফ খায়, কেউ লেমোনেড, কেউ বীয়ার। বলাবলি করে—চাষীরাই আগুন ধরিয়ে দিয়েছে গাছপালায়। একদিন কে একজন বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে :

'পৃথিবীর যন্ত্রণা' নাটকের এ হলো পয়লা নম্বর মহড়া।

আমি এক পাদ্রীকে জানতুম। তিনি নেশাড়ির দুই রক্তচক্ষু মেলে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন : "ব্যাপারটা বাইবেলের প্রত্যাদেশ অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু একটা হবে—ইত্যবসরে, এসো একটু পান করে নেওয়া যাক।..."

এ সমস্ত ঠাট্টা বিদ্রূপ আমার খাপছাড়া মনে হতো এবং অত্যন্ত অসহিষ্ণু করে তুলতো। বাস্তবিক পক্ষে সেদিনের সেই অস্পষ্ট, শ্বাসরুদ্ধ দিনগুলোতে যা কিছু বলা হয়েছে তা নির্মমভাবে অনাবৃত করে দিয়েছে প্রাত্যহিক জীবনের উষরতা এবং একঘেয়েমীকে।

পদাতিক বাহিনীর একজন অফিসার, একজন স্বপ্নাতুর মানুষ—যিনি 'মধ্যবয়সী কুমারীদের জন্য কবিতায় উদ্ভিদবিদ্যা' নামে এক গ্রন্থ রচনা করছিলেন, তিনি আমার কাছে প্রস্তাব করলেন, যদি অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রে তার সঙ্গে যাই। সেনাবাহিনীর দুটি ঘোড়ায় চেপে এক গুমোটভরা রাতে আমরা অকুস্থলের দিকে যাত্রা করলাম। ফেরী নৌকোয় নদী পার হয়ে বোর নামে এক গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম। উত্তম দানাপানি পাওয়া ঘোড়া দুটো বালি ভরা রাস্তা দিয়ে শ্বাসরোধী কুয়াশার ভেতর কদমে ছুটতে ছুটতে ক্রোধে নাকঝাড়া দিতে লাগল। মৃত্যুর মতো কুয়াশার আবরণে ঢাকা প্রশান্ত ক্ষেতের পর ক্ষেত। আমাদের মাথার ওপর কুয়াশা একটু পাতলা—মসলিনের মতো, তার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে সূর্য উঠলো। যত আমরা জঙ্গলের কাছাকাছি এসে পড়তে লাগলাম ততই কুয়াশা হয়ে উঠছে নীল—শেষপর্যন্ত তা যেন আমাদের গলা চেপে ধরতে লাগল, চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল জল। আমাদের সঙ্গে যে আর্দালি ছিল, সে তো হাঁচতে সুরু করে দিলে। আর অফিসার সাহেব চশমার কাচ মুছতে মুছতে, কাশতে কাশতে 'প্রেম' শব্দের সঙ্গে ভুল ও অসঙ্গত 'কর্কশ'* শব্দের একটা মিল দিয়ে তাঁর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি শুরু করে দিলেন।

---

* গরমিলের শব্দ দুটো 'লভ' (love) ও রাফ (Rough)

কোদাল কুড়ুলধারী তিনজন কৃষক একপাশে সরে দাঁড়িয়ে আমাদের পথ করে দিলে। পদাতিক বাহিনীর কবি তাদের ডাক পেড়ে শুধোলেন :

"লোকজন কোথায় কাজ করছে হে ?"

"জানি না।..."

আর্দালি ঘোড়ার লাগাম টেনে শুধালো, "সৈনিকেরা কোথায় ?"

লাল জামা পরা একটি চাষী তার কুড়ুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, "হোই হোথায়।..."

মিনিট কয়েকের মধ্যেই আমরা একটা বনের ভেতর ঢুকলাম। সেখানে দেবদারু ও ফারগাছের ঘন জঙ্গলের মধ্যে শাদা সার্ট পরা কিছু লোক কাজ করছিল। একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী এসে জানাল—সবাই অক্ষতই আছে, শুধু একজন মোঙ্গল জাতের সৈনিক নিজেকে কিছুটা পুড়িয়ে ফেলেছে। তারপর সে এ-ও উপরি জানিয়ে দিলে যে, তার মতে এই ধরনের কাজ আর টেনে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র।

"এখানে আগুনের যা করবার ছিল করে গেছে স্যার ; ওপর দিকে আদ্দেক চাকার আকার নিয়ে আগুন এগুচ্ছে—বাকি যেটুকু এখানে আছে তাকে এখুনি গ্রাস করবে। তারপর যখন আর পুড়বার মতো কিছুই থাকবে না তখন ও আপনি নিভে যাবে।"

তারপর তার রোগা রোগা হাতে ডান দিকে দেখিয়ে আমাদের সতর্ক করে দিলে : "ওদিকটায় যখন যাবেন খেয়াল রাখবেন—ওটা ঘাসের বাদা, সব শুকিয়ে ঝরঝর করছে। আগুনের শিখা নীচে নেমে এখন ওই দিকেই ছুটেছে। লোকজন চিন্তিত হয়ে পড়তে শুরু করেছে।..."

অফিসার সাহেবকে ভাবিত দেখতে পেলাম—কি আদেশ যে তিনি দেবেন ঠিক করতে পারছেন না। এমন সময়ে মস্ত এক ভালুকের মত দাড়ি-ওয়ালা এক কৃষক বেরিয়ে এল জঙ্গলের ভেতর থেকে—হাতে লাঠি, বুকে টিনের পাত আঁটা। ছাইয়ে ভর্তি টুপিটা সে মাথা থেকে খুলে ফেললে। গভীর নীল দুটো চোখে বুদ্ধির দীপ্তি—অফিসার সাহেবের দিকে তাকাল একদৃষ্টে।

"তুমিই বোধ করি সরকারী নাজির—তাই না ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"তা কাজকর্ম কেমন চলছে ?"

"সব জ্বলছে স্যার।"

"আমাদের অবশ্যই লড়াই করে যেতে হবে।" অফিসার সাহেব বললেন। "জঙ্গলটা ভয়ানক মূল্যবান। জঙ্গল শুধু কতকগুলো গাছ নয় ভাই, মানুষের ঘরবসতও, যেমন ধরো—তোমাদের গ্রাম।"

"আমাদের গ্রাম গরীব। ..."

মাটিতে আমাদের পায়ের কাছে কালো সার বেঁধে লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে এগিয়ে চলেছে। রাস্তা দিয়ে একটা গুবরে পোকা দ্রুত চলে যাচ্ছিল—পিঁপড়েগুলো তাকে এড়িয়ে গেল। ওরা কোথায় গিয়ে নতুন বাসা বাঁধছে আমি দেখবার জন্য এগিয়ে গেলাম।

বাতাসে কেমন যেন অদ্ভুত একটা খস্‌খস্‌ শব্দ, আমি সজাগ হয়ে উঠলাম। ঘাস মাড়িয়ে, পাতায় পাতায় সাড়া জাগিয়ে অদৃশ্য কোনো একটা সত্বা যেন চলেছে আমার পাশে পাশে। এমন কি গাছের শাখা-প্রশাখাগুলোও কেঁপে কেঁপে উঠছে অস্বস্তিতে—চেতনার অগোচরে। তার নানা সমস্যার কথা বলতে বলতে আমাদের পেছনে পেছনে আসছিল নাজির।

"এইখানে আমি পুরো তিনটে দিন ঘুরে বেড়াচ্ছি।... আপনি নিশ্চয় কর্তৃপক্ষের কেউ হবেন—তাই না? আহা—দেখতে এসেছেন আপনি ... তা খুবই ভাল। এই দিকে আসুন। আপনাদের একটা টিলার ওপর নিয়ে যাই চলুন, এখান থেকে বেশী দূরে নয়। সেখানে সব কিছু সুন্দর দেখতে পাবেন।"

বেলে টিলাটা ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আছে বড় বড় দেবদারু গাছে—ওদের ডগার দিকটা যেন পানপাত্রের মত, সাদাটে ক্লেদে ভরা। টিলার সামনে উপত্যকায় এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে কিছু কিছু ক্ষীণকায় ফার গাছ আর মনোরম ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা বার্চ; রুপোলী পপলার গাছগুলো যেন ভাবনায় শিউরে উঠছে। ক্রমশ দূরের দিকে গাছগুলো যেন আরও ঘনতর। তাদের মধ্যে আবার মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে ফার গাছগুলো, তাদের পিঙ্গল দেহকাণ্ডে শেওলার সবুজাভা।

গাছের তলায় তলায় রাঙা ল্যাজগুলো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কাঠবেড়ালির মতো ছুটে বেড়াচ্ছে উল্লসিত ছোট ছোট শিখাগুলি, আর মাটির ওপরে গুঁড়ি মেরে আছে একটা নীল ধোঁয়ার আস্তর। যে কেউ লক্ষ্য করলে দিব্যি দেখতে পাবে—খেলোয়াড় আগুন গাছের গুঁড়ি বেষ্টন করে ছাল বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠছে কেমন ভাবে, আবার লুকিয়ে যাচ্ছে কোথায়। তারপর আবার সোনালী পিঁপড়ের মতো বেয়ে বেয়ে এগিয়ে আসছে পেছন থেকে আর গাছের গায়ের সবুজ শেওলাগুলো প্রথমে হয়ে উঠছে ধূসর—তারপর কালো। এখন

আবার কোথা থেকে উদয় হলো আগুন এবং বসালো তার দাঁত মলিন ঘাস আর ছোট ছোট ঝোপের ওপরে, তারপর লুকিয়ে গেল আবার। এবং সহসা দ্রুত লাল খুদে জন্তুগুলোর একটা দঙ্গল যেন এসে আবির্ভূত হলো—শেকড়ে শেকড়ে দুদ্দাড় করে শুরু করে দিলে দাপাদাপি।

লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নাজির বিড়বিড় করে বললে, "আমাদের লোকজন সব ওইখানে ··· ঈশ্বর তাদের রক্ষা করুন।"

অতদূরে আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে আগুনে পোড়ার চড়চড় শব্দ ও খস্‌খস্‌ আওয়াজ, এবং দূরের একটা গুঞ্জনের মধ্যেও কুড়ুলে কোপ মারার ছোট ছোট শব্দ ও তার শ্বসিত প্রতিধ্বনি এবং কেটে ফেলা গাছের মাটিতে পড়ার গুরুভার মড়মড় শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। একটা ক্ষেতি-ইঁদুর আলের উপর থেকে আমার পায়ের উপর এসে পড়ল, একটা সাদা খরগোস যেন ঝলক মেরে বাদার উপর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

পাখীদের কোনো কূজন কাকলী নেই—যদিও ভলগার অরণ্যভূমি গান-গাওয়া পাখীদের ঐশ্বর্যে ছিল পরিপূর্ণ। কোনো মৌমাছিও নেই, ভোমরাও নেই, বোল্‌তারাও পালিয়েছে সেই ভারাক্রান্ত আবহাওয়া—গরম, নীল, নেশালাগা ঘোর থেকে। দেখতে বড় বেদনাই লাগে—সবুজ পাতাগুলো মর্মান্তিক পাংশু হয়ে যাচ্ছে অথবা তাদের ওপর জমছে রক্তিম মালিন্য। প্রায়ই, পপলার গাছের পাতাগুলো আদপে জ্বলে না উঠেই বিশীর্ণ ডালপালাগুলোকে করুণভাবে অনাবৃত করে ঝরে পড়ছে ভস্মীভূত প্রজাপতির মত। কখনো বা উত্তাপে শুকিয়ে গিয়ে জ্বলে উঠছে সহসা এবং পরে ছড়িয়ে পড়ছে শত শত লাল হলুদ রঙের প্রজাপতির মত। দূরান্তরবর্তী পত্রপল্লব-সমৃদ্ধ ফার গাছগুলোকে আমি দেখতে পাচ্ছি—ঘন সবুজ ভেলভেটের মতো দীপ্তি তাদের অতি দ্রুত হারিয়ে ফেলছে এবং ছড়িয়ে দিচ্ছে স্বর্নাভ ফুলকির ঘন বৃষ্টি—মনে পড়িয়ে দেয় সোনালী কীটানুর কথা। এবার পিরামিডের মতো গোটা ফার গাছটাকে আচ্ছন্ন করে সমস্ত শিখাগুলো যেন হালকা আনন্দোচ্ছ্বাসে একত্রে মিশে পাক দিয়ে জ্বলে উঠল বাতাসে। জ্বলে উঠল এবং হারিয়ে গেল যেন—ফেলে রেখে গেল একটা কালো কুট্‌কুটে গাছ, কেবল উলঙ্গ শাখাগুলোর প্রান্তদেশ জ্বলজ্বল করতে লাগল খুদে খুদে হলদে ফুলে। এখন আবার আর একটা ফার গাছ অতি দ্রুত কুসুমিত হয়ে উঠল এবং আগের মতই শেষ হয়ে গেল। তারপর আবার একটা—আবার একটা। শোনা গেল ফেটে চৌচির হওয়ার একটা

তীক্ষ্ণ শব্দ এবং একটা বেঁটে মতো গাছ ছিটকে পড়ল পচা ডিমের মত এবং লালচে হলুদ রঙের সাপগুলো জড়াজড়ি করে বেয়ে বেয়ে চললো তাদের সূঁচালো মাথা তুলে সারা বাদার ওপর দিয়ে চতুর্দিকে। যাওয়ার পথে গাছের গুঁড়ি পেলেই, ঘাসের ভেতর থেকে মুখ বের করে বসিয়ে দিলে তার দাঁত। সাদা সাদা কাণ্ড বেয়ে যেমনি আগুন দ্রুত উঠে পড়ছে—সঙ্গে সঙ্গে বার্চের নরম পাতাগুলো হয়ে যাচ্ছে হলুদ। রঞ্জন উপাদান মেশা গাছের ছাল, শাখা-প্রশাখা ধুঁইয়ে উঠছে নীল রঙের ধোঁয়ায়; শীর্ণ শিখার খণ্ডগুলো পাকিয়ে উঠছে অপূর্ব সৌন্দর্যে—সঙ্গে সঙ্গে শিসিয়ে উঠছে। এবং সেই মৃদু শিসের মধ্যে যেন ধ্বনিত হয়ে উঠছে গানের কলি—সে গান বিস্ময়কর, গভীর।

অনন্য নির্দেশে আগুন যেন কাছে ডাকছে—আরও কাছে। নাজির চিৎকার করে উঠল এবং অজ্ঞাতসারে তার লাঠিটা দোলাতে দোলাতে টিলা থেকে নামতে শুরু করে দিলে। বিস্মিত কণ্ঠে বলতে লাগল :

"হা ঈশ্বর, এ কী দেখছি! সমস্ত বিস্ময়ের স্রষ্টা তুমি—হে ঈশ্বর।..."

জঙ্গলের মধ্যে সহসা গুঞ্জনের শব্দ থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ার্ত নেকড়ের কান্না শোনা গেল, "উহ্—উহ্—উহ্!..."

"ওরা পালিয়ে আসছে।" নাজির বললে।

এবং তার কথাই ঠিক। আমাদের বাঁদিকে, দূরে গাছপালার মধ্যে মানুষের মতই যেন মূর্তিগুলি, ছুটে আসছে। এত দ্রুত ছুটে এলো তারা—মনে হলো যেন জঙ্গলের ভেতর থেকে ওদের কে ছুঁড়ে দিয়েছে। ডানদিকের বাদা থেকে দুজন সৈনিকের আবির্ভাব ঘটল—তাদের হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা বুট ধূসর ছাইয়ে ভরা এবং গায়ে কোমর-বন্ধহীন সার্ট। ওরা একজন বেঁটেখাটো কৃষককে ধরে নিয়ে আসছে—মাতালকে যেমন বগলদাবা করে ধরে তেমনি করে ধরে রেখেছে। কৃষকটি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে এবং থুতু ফেলছে থুক্ থুক করে। তার এলোমেলো দাড়িতে, ছিন্নভিন্ন সার্টে রক্তের ছোপ লাগা, তার নাক ও ঠোঁট ছড়ে ছিঁড়ে গেছে, এবং তার ফ্যালফেলে চোখ দুটো যেন দৃষ্টিশক্তিহীন। কাছাকাছি যখন এলো তখন তাকে দেখতে পেলাম—সে হাসছে, করুণভাবে, যেন ছেলেমানুষি হাসি।

"ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?" কঠিন কণ্ঠে নাজির জিজ্ঞেস করলে।

তাতার সৈনিকরা শান্তভাবেই জবাব দিল: "ও আগুন লাগিয়ে বেড়াচ্ছিল—এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আগুন টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।"

ওর সঙ্গী ক্রুদ্ধভাবে যোগ দিলে, "হ্যাঁ, ফুঁ দিয়ে দিয়ে আগুন ধরাচ্ছিল যাতে জ্বলে ওঠে। আমরা দেখেছি।"

"জ্বালাচ্ছিলাম বুঝি! আমি তো তামাকের পাইপটা ধরাচ্ছিলাম।"

"তোমার খোঁজ করবার জন্য আমাদের বলা হয়েছিল এবং আমরা দেখেছি—তুমি ডালপালায় আগুন ধরাচ্ছিলে এবং তাকে উস্‌কে উস্‌কে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলে।"

"আগুন উস্‌কাচ্ছিলাম বুঝি! আগুন তো আগে থেকে জ্বলছিলই এবং আমি তাতে লাথি মেরেছিলাম মাত্র।"

এই সময় একজন সৈনিক মারলে ওর ঘাড়ে এক রদ্দা।

"থাম—থাম—ওকে মেরো না।" নাজির হুকুম দিলে। "ও আমাদেরি একজন লোক।... তোমাদের বলতে বাধা নেই—ওর মাথাটা ঠিক নেই।"

"তবে ওকে বেঁধে রাখ না কেন?"

ওরা রেগে তর্কাতর্কি সুরু করে দিলে। ওদিকে বাদায় তখন সুরু হয়েছে আগুনের নাচ—জঙ্গলের ভেতর থেকে ছুটে আসা কৃষকের দল পড়ে গেল সেই আগুনের সামনে। প্রায় জনা সাতেক লোক বড় বড় লাফ দিয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে, ভাঙা গলায় কাশতে কাশতে এবং দিব্যি গালতে গালতে ছুটে এল আমাদের দিকে,—এসে লুটিয়ে পড়ল টিলার তলে বালিতে।

"মানিক আমাদের ধরেছিল আর কি!"

"এত পাখি পুড়ে শেষ হয়ে গেছে ওখানে! ..."

এই ছাইভস্ম মাখা, পরিশ্রমে নিঃশেষিত মানুষগুলোকে দেখে সৈনিক দু'জন যেন শান্ত হল। যাকে তারা মারধর করেছে তাকে ছেড়ে দিয়ে গরম ধোঁয়ার মেঘের মধ্যে ওরা হারিয়ে গেল। যত সময় যাচ্ছে ধোঁয়া তত নীল এবং কটু হয়ে উঠছে। গাছের গুঁড়ি ঘিরে ঘিরে বাদায় তখনো জ্বলজ্বল করছিল আগুনের ফুল্‌কি। বার্চ এবং এল্‌ডার গাছের হল্‌দে হল্‌দে পাতা কুঁকড়ে যাচ্ছে এবং ঝরে পড়ছে। আর গাছগুলোর গুঁড়িতে গুঁড়িতে ধরা শেওলা অদ্ভুতভাবে নড়েচড়ে উঠছে—যেন জীবন্ত কিছু, মনে পড়িয়ে দেয় মৌমাছির ঝাঁকের কথা।

টিলার ওপরে গরম ক্রমশ বেড়ে উঠল; নিঃশ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়ে উঠল। কিছুটা বিশ্রাম করে, টিলার ওপরকার ঝোপের ভেতরে কৃষকেরা একে একে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মার-খাওয়া লোকটার দিকে ঘুরে দাঁড়াল নাজির :

"একটা না একটা গোলমালের মধ্যে তুমি সব সময় জড়িয়ে পড় নীকিতা।" সে বিরক্ত হয়ে উঠল। "কোন কিছু থেকেই তুমি কখনো শিক্ষা পেলে না—না আগুন, না চার্চের মিছিল।"

লোকটা নীরব—নোংরা আঙুল দিয়ে সামনের দাঁতটা খুঁটতে লাগল।

"যখন ওরা বললে—তোমাকে বেঁধে রাখা উচিত, ওরা ঠিকই বলেছিল।"

লোকটা মুখ থেকে আঙুল বের করে সার্টের প্রান্তে ঘষতে লাগল। এক দিক থেকে আর একদিকে মাথাটা সে নাড়তে লাগল, উদ্‌গীর্ণ ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে যেন বাদাটাকে স্থির দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ধুঁইয়ে উঠেছে গোটা বাদাটা—কালো মাটির ভেতর থেকে নীল এবং বেগুনে রঙের ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে এখানে ওখানে। সর্বত্রই তাদের পেছনে ছুটছে আগুনের শিখা—মাঝে মাঝে তা ঘাসের ভেতর থেকে সুঁচালো ঢিপির মতো হয়ে জ্বলে উঠছে দাউ দাউ করে, কাঁপছে যেন টাল সামলে। তারপর আবার হয়ে যায় অদৃশ্য। পেছনে ফেলে রেখে যায় স্বর্ণাভ লাল একটা আভা। তা থেকে আবার সরু লাল সূতোর মতো ছড়িয়ে পড়ে সব চারদিকে, গড়ে তোলে নতুন নতুন আগুনের সংযোগ-গ্রন্থি।

সহসা ঠিক টিলাটার নিচেই একটা ঝাউগাছ জ্বলে উঠলো তুলোর গাদার মতো। নাজির তার টুপিটা দোলাতে দোলাতে পিছিয়ে এলো।

"তাকিয়ে দেখুন!" সে চিৎকার করে উঠল, "এখান থেকে আমাদের সরে পড়াই ভালো।"

আমরা ঘুরে দাঁড়ালাম এবং ঘন ঘাসের কার্পেটে ঢাকা জমির ওপর দিয়ে ফিরে চললাম।

নাজির বিড় বিড় করে বলতে লাগল : "এখানে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে আমার আর কি লাভ? এই আগুনের বিরুদ্ধে মানুষ কি করতে পারে? এদিকে আমার নিজের কাজ একেবারে বন্ধ। বোধ করি, হাজার খানেকেরও বেশী লোক এইভাবে তাদের সময় নষ্ট করছে।..."

ঝোপের ভেতর দিয়ে আমরা নেমে এলাম সমতল ভূমিতে। তার একান্তে এক ছোট্ট প্রবাহিনী বয়ে চলেছে—দীপ্তিহীন। ওখানে ধোঁয়া যেন আরও জমাট—যাতে স্রোতের ধারাটাকেই মনে হচ্ছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ঘাসের ভেতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এলো একটা ভারুই পাখি এবং ঝোপের ওপরে

গিয়ে পড়লো একটা পাথরের টুকরোর মতো, একটা ছোট সাপ দ্রুত আমাদের ছাড়িয়ে ছুটে গেল, এবং তার পেছনে পেছনে একটা সজারু ছাই রংয়ের একটা তালের মতো ছুটে গেল শীর্ণ স্রোতধারা লক্ষ্য করে।

"ওদের ধরে ফেলবো।" নিকিতা বললে এবং মাথা গোঁজ করে ঝোপের ভেতর দিয়ে ষাঁড়ের মতো হুড়মুড় করে ছুটতে সুরু করে দিলে।

"তুমি কি করছ—তাকিয়ে দেখো। বোকার মত আর কিছু করো না।" নাজির পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর চোখের কোণে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "ওর মাথায় একটু গোলমাল আছে। তিন তিনবার ওর ঘর পুড়ে গেছে, তারপর থেকে ও একটু ··· বুঝলেন। সেপাইরা বলছিল—ও আগুন ধরাচ্ছিল কিন্তু অতোটা ও করবে না। সে যা হোক, মাথাটা ওর গেছে, এবং সব সময় একটা গোলমাল পাকিয়ে রেখেছে।···"

ধোঁয়া এসে বিঁধছে আমাদের চোখে এবং সজল হয়ে উঠছে চোখ; আমার নাক বিশ্রীভাবে সুড় সুড় করছে এবং নিঃশ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়ে উঠছে। নাজির সশব্দে হেঁচে উঠল এবং লাঠিটা দোলাতে দোলাতে চিন্তিতভাবে চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

"ওই দেখুন; আগুন কোথায় নিজেকে টেনে এনেছে।"

আমাদের সামনে—যেখানে ঝাউগাছের ঝোপের সারি উপত্যকার সীমান্ত নির্দেশ করছে সেখানে ছোট ছোট আগুনের শিখা নেচে বেড়াচ্ছে অতি চঞ্চল চড়াইয়ের মতো। এক দঙ্গল বুলফিঞ্চ পাখির মতো দেখতে, তাদের কোণা মতো ডানাগুলো যেন ঝলক দিয়ে উঠছে, ঘাসের ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে মাথা নাড়া দিচ্ছে নিঃশব্দে।

"নিকিতা!" হাঁক পেড়ে নাজির কান পেতে রইল। আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম শুকনো চিড়চিড়ে শব্দে একটা সতর্ক করা হিস্‌হিসানি, একটা মৃদু শিস্‌। দূরে কোথাও থেকে আমাদের কানে ভেসে এলো একদল মানুষের গুঞ্জনধ্বনি।

"মরেও না লোকটা!" নাজির গর্জে উঠলো। "ঝঞ্ঝাট পাকাতে ও একাই একশ'—সকলকে ও ছাড়িয়ে যায়। মনে হয়, কেউ ওর সঙ্গে পারবে না। মাতালের যেমন মদ, তেমনি আগুন ওর মাথায় ভর করে। যেখানে আগুন সেখানে ও পাগলের মতো সকলের আগে গিয়ে হাজির হবে। গিয়ে বড় বড় চোখ করে তাকাবে বোবার মতো—মনে হবে, যেন কে ওকে মাটির

সঙ্গে পেরেক মেরে গেঁথে দিয়েছে। ও যে কোনো সাহায্য করে—এমন ঘটনা ঘটেনি কখনো ; ও শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে এবং মুখভঙ্গী করবে। আগুনের একদিক থেকে কেউ যদি ওকে সরিয়ে দেয় তো ছুটে অন্যদিকে গিয়ে দাঁড়াবে। আগুন সম্বন্ধে ও পাগল।"

পেছনে তাকিয়ে আমি দেখতে পেলাম অগ্নিশিখা ক্রমশ নীচের দিকে নেমে এগিয়ে আসছে—যেন আমাদের ধরবার জন্য এগিয়ে আসছে দ্রুত। স্রোতধারার জল এখন একেবারে লালে লাল, ঝলমল করছে স্বর্ণাভ রশ্মিতে।

"নিকি—ই—তা !"

সহসা কে একজন জঙ্গলের ভেতর থেকে ছুটে এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। নাজির থমকে দাঁড়াল এবং তার জলসিক্ত চোখ মুছতে লাগল। গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল এক জোয়ান ছোকরা—আদুল গা, গায়ের সার্ট মাথায় পাগড়ির মত জড়ানো।

"কোথায় ছুটছো তুমি ?"

পেছনে আঙুল দেখিয়ে এবং হাঁপাতে হাঁপাতে জোয়ান ছোকরাটি জবাব দিলে, "ওখান থেকে সবাই ছুটে পালিয়ে আসছে ··· টিলার ওপরে আগুন চলে এসেছে—ওদিকে যাবেন না—হঠাৎ এসে পড়ল আগুন।—বাপ্—আমি প্রায় ভয় পেয়ে গেছলাম !"

"ভাল, এখন তবে যাবটা কোথায় ?" নাজির বিড়বিড় করে বললে, "চলো সোজাই যাওয়া যাক। তুমি কি বলো ? জঙ্গলের এই দিকটা আমি জানি না—ওদিকে গিয়ে আমাদের লাভ নেই। আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলবো। মানুষজনের আজ শুধু একটি ভাবনা—আগুন নেভানো সেপাইদের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকা।—"

নাজিরের কণ্ঠস্বর ক্রমশ কটু হয়ে উঠল।

"এ এক দিব্যি জীবন ! সে জলডুবি মানুষ হোক কিংবা বনের মধ্যে মরে পড়ে থাকা মানুষ হোক, আগুনে মরুক অথবা রাস্তায় পড়ে থাকা খুনই হোক —ওদের দরকার চাষীদের ঘাড়ে দোষ চাপানো। চাষীদের কি নিজেদের কাজ পড়ে নেই ? এসবের কি দরকার ? নিকি—ই—তা ! মরুক ব্যাটা !"—

ফাঁক ফাঁক করে নতুন লাগানো কচি পাইন গাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সামান্য কিছুটা এগিয়ে আমরা গিয়ে পড়লাম এক মাঠের মধ্যে। ওখানে জড়ো হয়েছে প্রায় জনা পঞ্চাশেক কৃষক। ওখানে মেয়েরা পাত্র ভরে এনেছে

কৃভাস্ (ঘরে তৈরী মদ) এবং রুটি। নাজিরকে দেখতে পেয়ে তারা বলে উঠল: "কতক্ষণ ধরে আর আমরা এই ধোঁয়া গিলবো? ঘরে যে আমাদের কাজকর্ম পড়ে আছে।—"

ঘাসের ওপরে এখান ওখান দিয়ে বেয়ে বেয়ে আসছে নীলচে ধোঁয়ার কুণ্ডলী এবং এসে যেন ছোবল মারছে কুড়ুলে, কোদালে। সাদা ধোঁয়াটে কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য ছাইয়ের সূক্ষ্ম কণাগুলো লোকগুলোর মাথায় ঝরে পড়ছে বৃষ্টির মতো—দেখতে দেখতে ছাই রঙের ঘাসের মতো হয়ে উঠছে ওরা। ফার গাছের চওড়া, ছড়ানো ডালপালার পাঞ্জায় যেন ফেনা জমেছে। আগুন যে ওপরেও উঠে আসছে—এসব তার লক্ষণ।

"এখান থেকে সরে পড়া যাক!" নাজির নির্দেশ দিলে। "মাঠে নেমে যাও—সবাই!"

মেয়েদের ওপর আর পরস্পরের ওপর অনুযোগ করতে করতে লোকগুলো কষ্টেসৃষ্টে যেন উঠে দাঁড়াল এবং জঙ্গলের পথ দিয়ে ধোঁয়ায় ধূসর একটা অতল গহ্বরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। রাত পর্যন্ত আমি তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি মাঠ থেকে মাঠে। আমাদের পাশে গাঁট্টাগোট্টা দুটো ঘোড়ায় চেপে দুজন পুলিস বোকার মত লোকজনদের তাড়া করে বেড়াচ্ছিল এখান থেকে ওখানে। ওদের মধ্যে একজন, মাথায় কালো চুল, একটু চটপটে—তার চাবুক ঠুকে হেঁকে উঠল, "এই কুত্তার দল! তোদের অতো ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই; যা পুড়ছে সে তোদের সম্পত্তি নয়।"...

রাতে শুকনো গরম মাটির ওপরে শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগলাম—রক্তিম শিখা অরণ্যের মাথার ওপরে আকাশে কেমন ফুঁসে উঠছে, টলমলিয়ে জ্বলছে দাউ দাউ করে। মনে হচ্ছে যেন ঘন ধোঁয়ার গন্ধধূপ জ্বেলে দিয়ে অরণ্য দেবতার প্রসন্নতার জন্য আহুতি দেওয়া হচ্ছে। খুদে রক্তিম বর্ণের জন্তুগুলো লাফিয়ে উঠছে—গুঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে গাছের আগায়; উজ্জ্বল চওড়া ডানা মেলে দিয়ে পাখিরা ধোঁয়ায় ভরা আকাশে ঘুরপাক খাচ্ছে; সর্বত্র একটা যেন ইন্দ্রজাল আর চাপল্যে ভরা আগুনের লীলা। রাতের দিকে জঙ্গলটা হয়ে উঠল যেন একটা বর্ণনার অতীত ভৌতিক—রূপকথার মতো একটা ব্যাপার। ওর সেই সুনীল দেওয়াল যেন আরও উঁচু হয়ে উঠেছে আর তার ভেতরে, কালো কালো গুঁড়িগুলোর মধ্যে লাল লোমশ খুদে জানোয়ারগুলো দুরন্ত বন্যতায় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। ছুটে যাচ্ছে শেকড়ের দিকে, গুঁড়ি আঁকড়ে উঠে

যাচ্ছে ওপরে নিষ্প্রাণ বাঁদরের মত, ডালপালা ভেঙে লড়াই করছে পরস্পরের মধ্যে ; শিস্ দিচ্ছে, গর্জে উঠছে, গর গর করছে ; আর অরণ্য বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে চড় চড় শব্দে—যেন কড়মড় করে হাড় চিবোচ্ছে হাজার হাজার কুকুর।

কালো কালো গাছগুলোর মধ্যে আগুনের প্রতিচ্ছায়া নানা বর্ণে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল। নৃত্য তার অশ্রান্ত আর অবিচ্ছিন্ন। ওই ওখানে বিরাট একটা লাল ভালুকের মতো আগুনের তাল বিশ্রীভাবে লাফ দিয়ে, ডিগবাজি খেয়ে গড়াতে গড়াতে মাঠের দিকে বেরিয়ে এলো। আবার, তার জ্বলন্ত লোমগুলো ঝেড়ে ফেলে যেন মধু খাওয়ার মতলবে সে গাছের গুঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল এবং গাছের আগায় উঠে তার রক্তিম লোমশ থাবা বাড়িয়ে শাখা-প্রশাখাগুলোকে যেন আলিঙ্গন করতে লাগল। তারপর ডালপালায় ভর দিয়ে লালচে ছুঁচগুলো স্বর্ণাভ বৃষ্টিকণার মতো ছড়িয়ে দিলে। পরের গাছে লঘুভাবে লাফিয়ে পড়ল আবার। পরিত্যক্ত গাছটার নিরাভরণ কালো কালো শাখায় জ্বলে উঠল অসংখ্য মোমবাতির নীলাভ আলো। পত্রপল্লবের ওপরে নীচে ছুটে বেড়াচ্ছে রাঙা ইঁদুর। তাদের দ্রুত সঞ্চরমান গতির মধ্যে দেখা যায়—ধোঁয়ার নীল কুণ্ডলীগুলো অস্থিরভাবে নেচে বেড়াচ্ছে। শ'য়ে শ'য়ে আগুনে পিঁপড়ের দল গুঁড়ির বাকল বেয়ে বেয়ে ওঠা-নামা করছে।

কখনো কখনো আগুন আস্তে আস্তে গুঁড়ি মেরে জঙ্গলের বাইরে গিয়ে পড়ছে, যেন একটা বেড়াল—পাখি খুঁজছে। তারপর সহসা হাওয়ায় তার শিকার-সন্ধানী মুখটা তুলে খুঁজে বেড়ায় তার শিকার। অথবা যেন কোনো একটা ভালুক, অগ্নিকণাবর্ষী জানোয়ার একটা—বেরিয়ে পড়বে কোনো ঝোপ থেকে, পেট ঘষটে হামাগুড়ি দিয়ে এসে বাড়িয়ে দেবে তার বিশাল থাবা এবং এক সঙ্গে ঘাসের গাদা সংগ্রহ করে ভরে দেবে তার বিরাট মুখ-গহ্বরে। অথবা যেন হলদে টুপি-পরা খুদে বামনের দল জঙ্গল থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসছে—তাদের পেছনে—দূরে ধোঁয়ার তালের মধ্যে কার যেন কালো এক মূর্তি, মাস্তুলের মত সুদীর্ঘ, শিস্ দিতে দিতে লালঝাণ্ডা উড়িয়ে এগিয়ে আসছে সদর্পে। খরগোসের মত লঘুভাবে লাফাতে লাফাতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে একটা আগুনের তাল—সজারুর মত সর্বাঙ্গ তার কণ্টকময়, পেছনে আন্দোলিত হচ্ছে ধোঁয়ার লালচে ল্যাজটা। আর আগুনে পোকার দল, স্বর্ণাভ পিঁপড়ের দল বিজ্ বিজ্ করছে গুঁড়িতে গুঁড়িতে ; প্রদীপ্ত পাখা মেলে উড়ছে রাঙা গুবরে পোকার দল।

বাতাস ক্রমশ কটু আর ভারী হয়ে এলো, ধোঁয়া হয়ে উঠছে উষ্ণ ও ঘনতর ; মাটি ধূমায়িত, চোখ ঝলসে উঠলো, চোখের পাতা যেন পুড়ছে। মনে হচ্ছে—আগুনের হলকায় ভুরুর চুলগুলোও যেন নড়ছে। ওই ধোঁয়াটে বাতাস যেন আর সইতে পারা যায় না—ছিঁড়ে ফেলছে ফুসফুস, তবু দেখ—অবাক কাণ্ড, চলে যেতেও মন চাইছে না : আবার কবে এমন একটা জমাট উৎসব দেখার সুযোগ হবে ?

জঙ্গলের ভেতর থেকে বিরাট একটা সাপ এঁকেবেঁকে, তাঁর ছুঁচলো মাথাটা নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছে ঘাসের ভেতর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে। তারপর সহসা সে অন্তর্হিত হয়ে গেল—যেন মাটির ভেতরে ঢুকে গেল। আমার পা দুটোকে জড়ো করলুম, আশা করতে লাগলুম পর মুহূর্তেই সে আমার একেবারে পাশে এসে আবির্ভূত হবে—কারণ এই আমাকেই তো সে খুঁজছে। কিন্তু আমি নড়তে পারলুম না : এই উত্তাপ আর এই ধোঁয়ার চেয়েও, বিপদের ভুতুড়ে একটা অনুভূতিতে আমার কেমন নেশা লাগে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ আরজামাসের মানুষ

আমি বসে আছি শহরের বাইরে একান্তে একটা ছোট ন্যাড়া পাহাড়ের ওপর—এখানে ওখানে সামান্য ঘাস। আমার চারদিকের কবরগুলো এখান থেকে অল্পই দেখা যায় : গোরু মহিষের খুর তাদের মাড়িয়ে দিয়ে গেছে, তার মাটির বেদী বাতাসে ক্ষইয়ে দিয়ে গেছে। বসে আছি ছোট একটা কুঠুরির দেয়ালের পাশে—লোহার পাতের ছাউনিতে ঢাকা খেলাঘরের মত ছোট্ট একটুকুন ঘর একটা ; দূর থেকে ছোটখাটো কোনো উপাসনা মন্দির বলে কেউ ভুল করে বসতে পারে। কিন্তু কাছে এসে একটু ভালো করে দেখলেই ওটাকে কুকুর রাখবার ঘর বলেই মনে হবে। লোহার দরজা আঁটা ঘরের ভেতরে রক্ষিত আছে লোহার শেকল, বেড়ি, চাবুক, চামড়ার কষা, অত্যাচারের আরও হরেক রকম উপকরণ—যেসব দিয়ে এখানকার সমাধিস্থ লোকগুলোকে একদিন অত্যাচার করা হয়েছিল। শহরের মানুষের কাছে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ সেগুলো এখানে রক্ষিত আছে : যেন বিদ্রোহীদের জন্যে হুঁশিয়ারী।

কিন্তু কারা যে এখানে সমাধিস্থ হয়েছিল শহরের বাসিন্দারা ইতিমধ্যে তা ভুলেই গেছে। কেউ বলে, তাঁরা ছিল স্টেঙ্কা রেসিনের কসাক ; কেউ বা বলে—

তারা এমেলিয়ান পাগাচেফের যোর্‌ডা ও চুভাস গোষ্ঠীর লোক। কেবলমাত্র পাঁড় মাতাল ভিখিরী বুড়ো টাটনিশ্চিকফ এখন সদম্ভে বলে বেড়ায়:

"ওদের দু'তরফের বিরুদ্ধেই আমরা রুখে দাঁড়িয়েছিলুম।"

রসকষহীন পাহাড়ি প্রান্তর থেকে শহরের নীচু নীচু ধূসর বাড়িগুলোকে মনে হয় আবর্জনার স্তূপ। যেন মাটিতে ঠেসে বসানো। এখানে ওখানে ছাদের ওপরে গজিয়ে উঠেছে ঘন ধুলায় ধূসরিত ঘাস আর আগাছা। এই ধূসর ইট পাটকেলের জঞ্জালের মাঝখানে সিধে হয়ে মাথা তুলে আছে শুধু দশটা গীর্জার চূড়ো আর দমকল কেন্দ্রের কোঠা বাড়িটা। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে গীর্জার সাদা দেওয়ালগুলো নোংরা ছেঁড়া কাপড়ে পরিষ্কার তালির মত।

আজ ছুটির দিন। শহরের মানুষ দুপুর পর্যন্ত গীর্জায় কাটিয়েছে, বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া করেছে এবং এখন সবাই বিশ্রামে মগ্ন। শহর একেবারে নিঃশব্দ; এমন কি কাচ্চা-বাচ্চার চেঁচানিও নিঃসাড়।

দিনটা অসহ্য গরম। ইস্পাত-নীল আকাশ অলক্ষ্যে পৃথিবীতে ঢেলে দিচ্ছে গলানো শিসে। সারা আকাশময় কিসের একটা দুর্বোধ্যতা এবং পূর্বাভাষ: সূর্যের চোখ ঝলসানো শ্বেতশুভ্র রশ্মিজাল মনে হচ্ছে মেঘের ভেতর দিয়ে চুইয়ে পড়তে পড়তে সেইখানেই শোষিত হয়ে যাচ্ছে।

সমাধির ওপরের বিরল, মলিন ও করুণ ঘাসগুলো নিথর এবং শুকনো। শুটকি মাছের মতো রোদে মাটি ফেটে চটা উঠে গেছে। টিলার বাঁ দিকে নদী ছাড়িয়ে দূরে (আমার বসার জায়গা থেকে নদীটা দেখা যায় না)—বন্ধ্যা প্রান্তরে মরীচিকা কেঁপে কেঁপে উঠছে; নদীর ওপারে দূরে গ্রামের বিপুল এক সৌধ-চূড়া সেই মরীচিকায় কাঁপছে আবার অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। একশ' বছর আগে ওই গ্রামটা ছিল বিখ্যাত সালটিচিখার, কৃতদাসদের ওপরে বিশুদ্ধ নিষ্ঠুরতার জন্যে যে মহিলার নাম নিন্দায় স্মরণীয় হয়ে আছে।

এবং শহরটা দেখাচ্ছে যেন কম্বলে ঢাকা—আসলে মলিন, হলদে ধুলোর মেঘে ঢাকা। বোধ করি মানুষের নিঃশ্বাস ঘুমোচ্ছে ওর মধ্যে।

* * *

অদ্ভুত সব মানুষ বাস করে ওই শহরে। পশমী কাপড় জমাট করার কারখানা-মালিক, অচঞ্চল, বুদ্ধিমান মানুষটি আজ চার বছর ধরে কারাম্‌সিনের লেখা রুশ রাষ্ট্রের ইতিহাস পাঠ করছে এবং সম্প্রতি নবম খণ্ডে এসে পৌঁছেচে। "একটি মহৎ রচনা," চামড়ায় বাঁধানো বইটার ওপর পরম শ্রদ্ধায় টোকা

দিতে দিতে বলে সে। "এ হলো জারের সম্পর্কে একটা বইয়ের মত বই। যে কেউ সহজেই বুঝতে পারবে—এ একজন যথার্থ মনীষীর লেখা। কোনো শীতের রাত্রে যে কেউ একবার শুধু পড়তে বসবে—আর তার সব অশান্তির কথা বেমালুম ভুলে যাবে। ধাত্রীরা বাচ্চাদের যে রূপকথা শোনায়—এ হলো প্রায় তারই মতো। মানুষের এক পরম সান্ত্বনা—এ এমনি ধারা বই। বিশেষ করে, তা যদি বিজ্ঞের মতো লেখা হয়।"

একদিন, সে তার জমকালো দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে একটু মধুর হেসে আমাকে বললে, "কৌতূহলোদ্দীপক কিছু দেখবার সাধ আছে কি? আমার বাড়ির পেছনে—উল্টোদিকে একজন ডাক্তার থাকে। তার কাছে একজন মহিলা প্রায়ই আসে—অদ্ভুত মহিলা, আমাদের শহরের নয়। আমার চিলকোঠার জানালা দিয়ে ওদের প্রেমলীলা লক্ষ্য করি। ওদের জানালার পর্দা গুলো আধা-আধি নীচের দিকে টানা—আর ওপরের শার্সি দিয়ে ওদের লীলা খেলা তুমি দিব্যি দেখতে পার। এর জন্যে আমি আরও কি করেছি জানো? এক বুড়ো ভাতারের কাছ থেকে একটা দূরবীন পর্যন্ত কিনে ফেলেছি। কখনো সখনো আমার বন্ধুবান্ধবকে ডেকে দেখিয়ে একটু আমোদও করি।"...

*　　　*　　　*

হেয়ার ড্রেসার বালিয়াসিন—যে নিজেকে বলে "নগরীর নরসুন্দর।" লম্বা ল্যাকপ্যাকে মানুষটি, হাঁটবার সময় কাঁধটা চলে যায় পেছনে ঠেলে আর বুক এগিয়ে আসে চিতিয়ে। মাথাটা তার খুদে বিষাক্ত সাপের মত—হলুদ হলুদ দুটো চোখ, এবং তাতে মৃদু সন্দিগ্ধ একটা দৃষ্টি। সারা শহর বালিয়াসিনকে বেশ চতুর মানুষ বলেই মনে করে এবং স্থানীয় ডাক্তারের চেয়ে চিকিৎসার জন্যে তার কাছেই তড়িঘড়ি করে ছোটে।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলে, "আমাদের ভেতরটা সব সহজ সরল কিনা, আর শিক্ষিত মানুষের জন্যেই দরকার ডাক্তারের।"

নাপিত তাদের রক্ত মোক্ষণ করে, পুলটিস দেয়। খুব সম্প্রতি সে একটা কড়ার ওপর অস্ত্রপ্রয়োগ করেছিল এবং রক্ত দূষিত হয়ে রোগীটি মারা যায়। এই ব্যাপারটায় কে যেন খুব উৎসাহিত হয়ে মন্তব্য করেছিল:

"ও খুব ওস্তাদ সার্জেন: ওকে কাটতে বলা হলো একটা কড়া এবং ও কেটে বসলে কিনা পুরো লোকটাকে।..."

জীবনের অনিশ্চয়তার চিন্তায় বালিয়াসিন খুবই অশান্তি বোধ করে।

"আমার মনে হয় সমস্ত বিজ্ঞানীরা মিথ্যে কথা বলছে", সে বলে। "এমন কি সূর্যের পথটাও তাদের নিশ্চিত জানা নেই। একটা উদাহরণ ধরো—কখনো কখনো আমি সূর্যকে অস্ত যেতে দেখে ভাবি: আগামীকাল ও যদি আর উদয় না হয়—তখন ? কোনো সূর্যোদয় নেই—এবং আমাদের সকলের সমাপ্তি! ওটা আর কোনো কিছুর সঙ্গে জুড়ে যেতে পারে—ধরো কোনো ধূমকেতু-টেতু। এবং তারপর থেকে আমাদের অন্ধকারেই জীবন কাটাতে হবে। অথবা ধরো—পৃথিবীর অন্যদিকে গিয়ে ওটা থেমে গেল এবং এদিকে আমাদের অনন্তকাল ধরে এই অন্ধকারেই কাটাতে হবে। সূর্য জানে—সে কি করছে, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের সম্পর্কে সে যদি কোনো দিন বিরক্তই হয়ে বসে তাহলে কাজকর্ম দেখবার জন্যে আমাদের হয়তো জঙ্গলে কিংবা বিরাট কাঠের গাদায় আগুন জ্বালিয়ে দিতে হবে।"

চোখ বুজে সে হাসে এবং বলে চলে:

"একটা চমৎকার আকাশ পাব তা হলে আমরা! সে আকাশে তারা থাকবে—কিন্তু সূর্যও থাকবে না, চাঁদও থাকবে না। চাঁদের জায়গায় কটমট করে চেয়ে থাকবে ছোট্ট একটা কাল বলের মতো বস্তু—অবিশ্যি সূর্যের কাছ থেকে চাঁদের আলো ধার করবার কথাটা যদি সত্যি হয়। তখন যা ইচ্ছে তাই তুমি করতে পারো—দেখা যাবে না কিছুই! চোরেদের ব্যবসা জমজমাট, তবে অন্য সকলের পক্ষে একটু অস্বস্তিকর।"

একদিন, আমার চুল ছাঁটতে ছাঁটতে সে বললে:

"মানুষের সবকিছুই গা সওয়া হয়ে গেছে। আজকাল কোনো কিছুতেই তারা আর ভয় পায় না। এমন কি আগুনকেও না, কোনো কিছুকেই না। এমন সব জায়গা আছে যেখানে ভূমিকম্প হচ্ছে, বন্যা হচ্ছে—কিন্তু আমাদের কখনো কিছু হলো না। এমন কি কলেরাও না—যদিও সর্বত্রই তা ভীষণ ভাবে হচ্ছে! ঠিক সুযোগ্য করে রাখবার জন্যে মানুষের অস্বাভাবিক কিছু একটা দরকার, ভয়ানক একটা কিছু ঘটা দরকার। শরীরের পক্ষে টার্কিস বাথ যেমন—আত্মার পক্ষে তেমনি দরকার আতঙ্ক—ওটা খুবই স্বাস্থ্যকর। ..."

* * *

নগর স্নানাগারের কানা ম্যানেজার, যে আবার পুরুষদের টুপিও বানায়। পুরানো প্যান্টের কাপড় থেকে টুপি তৈরী করে। তার সম্পর্কে সারা সহরের মানুষ ভীত। কেউ তাকে পছন্দ করে না। রাস্তায় যখন তাকে দেখতে পায়

—শহরের মানুষ সশঙ্কিত ভাবেই তার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলে এবং নেকড়ের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে। কখনো কখনো অবশ্য কড়াধাতের কেউ কেউ একেবারে তার সোজাসুজিই এগিয়ে যায়—যেন কোঁকায় দিলে বুঝি একটা গুঁতো। টুপিওয়ালা তাকে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায় এবং নিজে সে পেছনে পেছনে চলে—আধবোজা চোখে কেমন এক রকমের হাসি।

"তোমাকে ওরা এত ঘৃণা করে কেন?" একদিন আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম।

"কারণ, আমি নির্দয়—সেই জন্যে", সদম্ভে সে বলেছিল, "যে আমার সঙ্গে সোজাসুজি ব্যবহার করে না তাকে কোর্টে টেনে নিয়ে যাওয়াই আমার স্বভাব।"

তার চোখের সাদা অংশটা অতি সূক্ষ্ম রক্তিম শিরার জালে ভরা আর সেই জালের ভেতর থেকে গোল গোল ধূসর রঙের দুটো তারা সগর্বে জ্বল জ্বল করছে। বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারার মানুষ টুপিওয়ালা—লম্বা লম্বা দুটো হাত, হাঁটুর কাছ থেকে পা দুটো হঠাৎ যেন বড্ড বেশী ফাঁক হয়ে গেছে। মাকড়সার এক প্রতিরূপ।

"এ কথা সত্যি—মানুষজন কেউ আমাকে পছন্দ করে না, তার মোদ্দা কারণ হলো আমি আইন জানি।" সস্তা তামাকের একটা সিগারেট পাকাতে পাকাতে সে বলে চলল: "যদি কোনো অজানা একটা চড়াই পাখিও আমার বাগানে উড়ে আসে তো আমি তাকে বলি, 'একবার আমার উঠোনে এসে দেখ!' বেশী দিন আগের কথা নয়—প্রায় চার মাস ধরে আমার সঙ্গে একজন লোকের মামলা চলেছিল। একটা মোরগ নিয়ে ঝামেলা। হাকিম আমাকে বললেন: 'ভুল করে তুমি মানুষ হয়ে জন্মেছ। তোমার প্রকৃতি হলো ডাঁশের।' আমার নির্দয়তার জন্যে কেউ কেউ আমাকে মার-ধরও করেছে কিন্তু আমাকে পেটানো কোন মানুষের পক্ষেই ভাল নয়। তা হলো সাক্ষাৎ আগুনে হাত দেওয়া—তাতে একজনের হাতই শুধু পুড়বে। ওদের পালা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওদের বিরুদ্ধে শুরু হয় আমার পালা।"

জোরে সে শিস দিয়ে উঠল। এ কথা সত্যি, সে ছিল এক কুটচাকুলে মামলাবাজ। তার অভিযোগ আর আবেদনে স্থানীয় হাকিম সাহেবের সেরেস্তা প্রায় ভরে উঠেছিল। পুলিসের সঙ্গে সম্পর্কটা তার অবশ্য ভালই ছিল। তারা বলতো—ওর নিজের শহরের মানুষগুলোকে নস্যাৎ করবার জন্য ওর লেখায় ছিল

মুন্সিয়ানা এবং ওর রোজনামচায় সব লেখা থাকে—কি কি অপরাধ করেছে শহরের মানুষেরা।

"এ সব তুমি কেন কর?" আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

জবাবে সে বলেছিল, "কারণ, আমি আমার অধিকারকে সম্মান করি।"

* * *

মোটা সোটা, মাথায় টাক প্লুসকারেফ—কাজ তার তালা আর তামা নিয়ে, মুক্ত-চিন্তার মানুষ সে—নাস্তিক। কণ্ঠস্বর মোটা এবং কর্কশ, অদ্ভুত পুরু ঠোঁট দুটো চেপে, কথা বলে সে চিবিয়ে চিবিয়ে:

"ঈশ্বর মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। মাথার ওপর আমাদের নীল আকাশ ছাড়া আর কিছুই নেই। এবং আমাদের সব চিন্তা আসছে ওই নীল বাতাস থেকে। এক ধরনের নীলের মধ্যেই আমরা বাঁচি এবং চিন্তা করি—ওই নীলের মধ্যেই সব রহস্য লুকানো আছে। তোমার, আমার, সকলের জীবনের সার কথাটা খুবই সরল: আমরা ছিলাম—এই আবার আমরা নেই।..."

সে পড়তে এবং লিখতে জানে, আর উপন্যাসও সে অনেক পড়েছে। যেটা সব চেয়ে তার ভাল মনে আছে—তার নাম হলো—'রক্তমাখা হাত।'

"বইটাতে একজন ফরাসী ধর্মযাজক আছেন যিনি বিদ্রোহ করে লা রোচেলি শহরটা অবরোধ করে বসলেন। তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন ক্যাপটেন লার্কঁসিন—আর কি তিনি করলেন না! দিব্যি করে বলতে পারি! বইটা পড়বার জন্য যে-কারুর জিভ দিয়ে জল গড়াবে। তাঁর তরোয়াল সব সময় তৈরি এবং কখনো লক্ষ্য ব্যর্থ হয় না: ঠিক কোপ মেরে বসবে—এবং নির্ঘাৎ মৃত্যু। কোনো না কোনো সৈনিক!"

একদিন প্লুসকারেফ আমাকে বললে:

"এইভাবে একদিন রাত্রিবেলা আমি বসে আছি। দিনটা ছিল ছুটির, আমি একটা বই পড়ছিলাম। হঠাৎ স্থানীয় হিসেব-রক্ষক কেরানীটি আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তিনি আবার নিজেকে জাহির করেন সংখ্যাতত্ত্ববিদ বলে। এসে বললে—'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই বন্ধু।'

'বেশ তো—করুন', আমি বললাম। কিন্তু সর্বক্ষণ আমি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রইলাম। সে এদিক ওদিক কথার প্যাঁচ দিয়ে বাক্যালাপ শুরু করলে; আমি বোকার ভান করে দেয়ালের দিকে চেয়ে বসে রইলাম।

" 'আমি শুনেছি', সে বললে, 'আপনি নাকি ভগবানে বিশ্বাস করেন না?'

"এবার আমি তার ওপর চটে উঠলাম : 'কি ?' আমি বললাম, 'আপনার মতলবটা কি ? কেন, পাদ্রী পুরোহিত গীর্জাগুলো তাহলে আছে কি করতে ? আমার ধর্মবিশ্বাস ভাঙবার জন্যে আপনি আমাকে প্ররোচনা দিতে এসেছেন—একথা যদি পুলিসে রিপোর্ট করি ?'

"তখন সে ভয় পেয়ে গেল এবং বললে, 'আমাকে ক্ষমা করুন। আমি ভেবেছিলুম...'

"আমি কড়া জবাব দিলুম, 'ঠিকই, আপনি যা ভাবছিলেন তা ভাববার অধিকার আপনার কিছুমাত্র নেই। আপনার ওই সব চিন্তায় আমার কোনো দরকার নেই।'

"বজ্রের মতো গড়াতে গড়াতে লোকটা আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। এর কিছুদিন পরেই সে আত্মহত্যা করেছিল।

"এই সব জেমস্তভো (রাশিয়ার জেলা পরিষদ নির্বাচক)-মার্কা সম্মানীয় লোকগুলোকে আমি একদম পছন্দ করিনে—ওরা সব মেকি লোক। ওরা কৃষকদের শোষণ করে : এইভাবেই ওরা বেঁচে থাকে। এই সব শিক্ষিত লোকদের এড়াবার আর কোনো উপায় নেই—তাই ওরা ওদের জেমস্তভোর টোপ দিয়েছে। 'গুণে দেখ'—এই ওদের বলা হলো। সেই থেকে ওরা গুণেই যাচ্ছে! যতকাল দিব্যি মোটা মাইনের ব্যবস্থা আছে ততকাল কি কাজ তাকে করতে হবে না-হবে—তাতে একজনের কিই-বা আসে যায়।..."

* * *

ঘড়িওয়ালা কোরজক, ডাক-নাম তার 'শিকারি মাছি'—খুদে লোমশ মানুষটি, হাত দুটো লম্বা লম্বা। সে একজন দেশভক্ত এবং সৌন্দর্য প্রেমিক।

"রুশ দেশের তারার মতো তারা আর কোথাও নেই।"—বোতামের মতো চ্যাপ্টা, গোল গোল দুটো চোখে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে সে বলে। "আর স্বাদের দিক থেকে রাশিয়ার গোলআলু পৃথিবীর সেরা। আমাদের এ্যাকর্ডিয়ন বাজনাটিও পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। তেমনি রাশিয়ার তালা। আমাদের তৈরি ঢের জিনিস নিয়ে আমরা আমেরিকার ওপরে টেক্কা দিতে পারি।"

সে কবিতা লেখে এবং যখন সে মাতাল হয় তখন সে নিজেই সেগুলো গায়। তার কবিতার অর্থ একেবারে অর্থহীন—অন্ততপক্ষে সেই রকম মনে হয়। তার আর সব লেখা ছেড়ে এইটেই সে প্রায়ই গায় :

একটা ছোট্ট নীল পাখী, খুদে পাখী
গান গায় আমার জানালার তলায়;
ছোট্ট একটা ডিম পাড়বে ও।
পরশু দিন
ওই ডিমটা আমি চুরি করবো,
আর নিয়ে যাবো প্যাঁচার বাসায়;
পরোয়া করিনে তারপরে কি ঘটবে
আমার দুঃসাহসী এই মাথাটার।
হায়, কেন আমি প্রতিদিন স্বপ্ন দেখি
প্যাঁচায় ঠুকরে দিলে আমার খুলি ?
সেই একই নিশাচর পাখি, যে—
একলা থাকে বনে।

এই গানটা কোরজফ প্রবল কণ্ঠে এবং মহানন্দেই গেয়ে থাকে। অবশ্য তার মাথার খুলি একেবারে সুডৌল গোল এবং মাথাভর্তি টাক, কেবল মাত্র পেছন দিকে এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত প্রান্তভাগ জুড়ে ঝুলছে কটা কোঁকড়া চুল। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে ভাবে আকুল হতে সে ভালোবাসে—যদিও শহরটার পরিবেশ নিরানন্দময় ও পরিত্যক্ত, এখানে ওখানে সমাধির ঢিপি, ভরে আছে খানাখন্দে এবং সাংঘাতিক রকমের বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন। নদীর ঘোলা জলে কেমন একটা দুর্গন্ধ, কারখানার যত বিষ পাম্প হয়ে মিশছে এসে এই জলে। এর পাশে দাঁড়িয়ে ঘড়ি-সারাইওয়ালা কবিত্বে ফেটে পড়ে :

"কী গরিমাময়! কী অপূর্ব সৌন্দর্য—এ্যাঁ? বিশাল, উদার, সমতল। তুমি যেখানে খুশি চলে যেতে পার। আমি বড় ভালবাসি—এই আমাদের সুন্দর স্বদেশ।"

ঘরের উঠোন তার নোংরা, আলকুশী আর আগাছায় ভরা, পুরানো লোহা-লক্কড়ের স্তূপে আকীর্ণ। মাঝখানে পুরানো একটা সোফা কবে থেকে পড়ে পড়ে পচছে, বসবার জায়গার এককোণ থেকে বেরিয়ে পড়েছে এক গোছা ঘোড়ার চুল। ঘরের ভেতর ধুলো ভর্তি, মোটেই আরামদায়ক নয়—সবকিছু ঠেলে দেয়ালের দিকে সরানো। বড় দেয়াল ঘড়িটার দোলকটা নেই—তার জায়গায় দস্তার একটা নল বাঁধা।

এককোণে কোরজফের অসুস্থ স্ত্রী ককাচ্ছে আর অনুযোগ করছে। ওদিকে কোরজফের বোন তখন বারান্দায় নিঃশব্দে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। এই বোনটির বিয়ে হয় নি—বয়সও বেশ। কেমন হলদেটে এবং রোগা রোগা, সামনের দাঁতগুলো ঠেলে বেরুনো। পায়ে তার ব্যাটাছেলেদের চটি। পেছনে স্কার্টটা

হাঁটুর ওপরেও টেনে তোলা—দেখা যায় নীল শিরা বেরুনো পায়ের অনেকখানি।

কোরজফ একটা তালা আবিষ্কার করেছে যার মধ্যে তিনটে বন্দুকের টোটা ভরে দেওয়া যায়। এবং ওতে চাবি লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে টোটার গুলি ছুটে বেরিয়ে আসে। ওটার ওজন হবে প্রায় সের ছয়েক এবং দেখতে খানিকটা লম্বাটে একটা বাক্সের মতো। আমি কোরজফকে বলেছিলুম, "যে চাবি খুলবে তাকে না লেগে মনে হয় গুলি সোজা আকাশে চলে যাবে।"

"না, গুলি সোজা তার মুখে এসে লাগবে।" আবিষ্কারক স্বগর্বে আমাকে বলেছিল।

কিছু অদ্ভুত ধরনের মানুষকে অনেকে যেমন পছন্দ করে—তেমনি পছন্দ তাকেও করতো সবাই। অথবা হয়তো শহরের মানুষগুলো এই গুহ্য কথাটা বুঝতে পেরেছিল যে, তাস খেলার বাজীতে লোকটা একান্তই হতভাগ্য এবং যে কেউ জিতে তার টাকা-পয়সা হাতাতে পারে। বাচ্চাদের মারধোর করতে সে ভালোবাসত—এমন কথাও চালু আছে যে সে তার নিজের ছেলেকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। এতে তার বন্ধু-বান্ধবের সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি। বরং তাদের ফুল-ফলের বাগানে চুরি করতে এসে কোন ছেলেপুলে ধরা পড়লে তাদের শাস্তি দেওয়ার সময়ে ওকে বোধ করি একজন দোষ-বিশেষজ্ঞ হিসাবে ডাকা হতো।

* * *

লম্বা, রোগাটেপানা ইয়াকফ টেসনিকফ—লম্বা ছুঁচলো দাড়ি, বড় বিষণ্ণ মুখখানা, ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়ায় সারা শহরময়। মাথার চুলগুলো এলো-মেলো, গায়ে ছেঁড়া একটা কোট—দেখতে খানিকটা ধর্মযাজকদের আঙরাখার মতো। সাদা কোঁকড়া চুলে ভরা মাথায় শোভা পাচ্ছে ছাত্রদের টুপি। তার বড় বড় ছলছলে চোখ দুটো বিস্ফারিত—যেন ঘুমের সঙ্গে লড়াই করে কোনো রকমে সে চেয়ে আছে। কারণ ঘুমুলে তার চলবে না। অনবরত সে হাই তুলছে এবং মানুষজনের মাথার ওপর দিয়ে দুরচারী দৃষ্টি মেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে: "কি হে, দিনকাল কেমন চলছে?"

"এই একরকম। মন্দ নয়। চলে যাচ্ছে।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ রকম জবাব সম্পর্কে তার আগ্রহ অল্পই; তাছাড়া সকলেই তার পরিচিত।

স্ত্রীলোকের ব্যাপারে তার পরম আগ্রহ সম্পর্কে সে খুবই খ্যাতিমান এবং

একটি ডাকসাইটে লম্পট। টেসনিক সগর্বে আমাকে জানিয়েছিল: 'সেকালে এক সময়ে সে, এমন কি স্পেন দেশীয় স্ত্রীলোকের সঙ্গেও একত্র বাস করেছে। তবে, এখন অবশ্য, মস্কোর মেয়েদের সে অবজ্ঞা করে না।

লোকে বলে—টেসনিকফ নাকি কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তির জারজসন্তান—কোনো কর্মাধ্যক্ষ বা সৈন্যাধ্যক্ষ। বেশ কয়েক বিঘা ফলের বাগান ও বাথানের সে মালিক, তবে এ সমস্তই সে গ্রামের মানুষদের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দিয়েছে। লোকটা অসুস্থ, বর্তমানে আমার প্রতিবেশী খাজাঞ্চীখানার এক কেরাণীর ফ্ল্যাটে নিভৃতে বসবাস করে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা বরফ দেওয়া বীয়ার খেয়ে বাগানে এক জামীর গাছের তলায় ঘাসের ওপর সে গড়াগড়ি খাচ্ছিল এবং হাই তুলতে গিয়ে থেকে থেকে গোঙিয়ে উঠছিল। কেরানীটি তার কাছে এগিয়ে গেল। ছোটখাট রোগা মানুষটি—একটু খিটখিটে, তবু মধুর স্বভাবের। চোখে চশমা। টেসনিকফকে বললে: "আচ্ছা ইয়াসি, এটা হচ্ছে কি?"

"বড় একঘেয়ে লাগছিল," টেসনিকফ বললে। "সব সময়েই আমি ভাবছি—কি করে সময় কাটাই।"

"কিছু শুরু করার পক্ষে আজ যে অনেক দেরি হয়ে গেছে।"

"ঠি-ক। আমার মনে হয়, তুমি ঠিকই বলেছ।"

"তোমার বয়সটাও তো হলো।.."

"তা হলো।" ...

তারা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর টেসনিকফ ধীরে ধীরে বিড় বিড় করে বললে, "এ বড় একঘেয়ে। ধরো একটু পরিবর্তনের জন্যে কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারে?"

সমর্থন করে কেরাণীটি বললে, "এতো একটা ভাল মতলব। তখন সময়ে সময়ে গীর্জাতেও যেতে পারবে।"

এবং টেসনিকফ কান্নার মতো একটা হাই তুলে শেষ কথা বলে দিলে:

"হ্যাঁ ... এই তো ঠিক।"

* * *

জিমিন একজন দোকানদার এবং গীর্জার পাহারাদার। খুবই চতুর ব্যক্তি। একদিন আমায় বললে: "মানুষগুলো ভুগছে তাদের মগজ থেকে। এই মগজগুলোই হলো পৃথিবীর যত কষ্টের কারণ। সারল্য বলে আমাদের আর

কিছু অবশিষ্ট নেই—তার সবটুকু আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের হৃদয় সৎ ঠিকই—কিন্তু মস্তিষ্কটা প্রবঞ্চক!”

* * *

বসে বসে আমি গরম হাওয়া গিলছি আর মনে পড়ছে আমার বর্ণিত মানুষগুলোর কথাবার্তা, চালচলন আর মুখগুলি। এবং চোখ পড়ে আছে উষ্ণ, ধোঁয়াটে কুয়াশায় ঢাকা শহরটার দিকে। এই শহরটা কেন টিকে আছে—বাসিন্দাদের কথা না হয় বাদই দিলাম?

এ হলো সেই জায়গা যেখানে জীবনের বিভীষিকা সম্পর্কে লিও টলস্টয়ের প্রথম অভিজ্ঞতা-লাভ ঘটেছিল—‘আরজামাস’—মোরডোভীয়ার বিভীষিকা। কিন্তু এটা হয়েছে কি শুধু এই জন্যে যে, ‘আইভান দি টেরিব্‌ল্’-এর কালেও এ শহরটা ছিল? আমার মনে হয় না—রাশিয়ায়, বিশেষ করে মফঃস্বলের রাশিয়ায় এমন দেশ আর আছে যেখানকার লোকগুলো এত কথা বলে এবং এমন সব অসংলগ্ন ও নিরর্থক চিন্তা করে।

আরজামাসের চিন্তার ধারা আকস্মিকতায় ভরা এবং মনে করিয়ে দেয় গেঁয়ো ছোকরাদের অত্যাচারে তাড়া খাওয়া পাখিদের কথা। পাখিগুলো কখনো কখনো অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়ে এবং পালাতে গিয়ে বাতাসের মতো স্বচ্ছ, প্রহেলিকাময় জানালার দুর্ভেদ্য কাচে প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। নিস্ফল ‘অলস-নীল’ চিন্তায় প্রজাত ওরা।

আমি গভীরভাবে শহরের লোকগুলোকে লক্ষ্য করি এবং ওদের সম্পর্কে যে কথাটা আমার প্রথম মনে হয় তা হলো এই যে, ওরা বেঁচে আছে মৃতের মতো। এবং তার ফলেই ওরা বেঁচে আছে নোংরা, নীরসভাবে, বিশ্রীভাবে, অপরাধের মধ্যে। ওরা গুণবান মানুষ—কিন্তু তা শুধু উপাখ্যানে।

নদী থেকে আসছে জল ছিটানোর শব্দ—শহরের ছেলেরা গেছে স্নান করতে। ওদের বেশির ভাগই আজ শহরে নেই—অধিকাংশই প্রায় চলে গেছে জঙ্গলে কি মাঠে অথবা পাহাড়ি খাদে, যেখানে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। বাগান থেকে উঠছে ভারি চমৎকার নীল ধোঁয়া: গিন্নিবান্নিরা দিবানিদ্রা থেকে জেগে উঠেছে এবং কেটলিতে চায়ের জল গরম করতে বসিয়েছে।

একটা বাচ্চা মেয়ের সরু গলা তীক্ষ্ণভাবে কেঁপে উঠল: ‘ওমা! আমার পেটে মেরো না মা।’… মনে হলো—তার চিৎকার যেন মাটিতে ডুবে গেল।

গরম যেন ক্রমশই চড়ে উঠছে। সূর্য যেন স্থির ভাবে বিরাজমান

এবং পৃথিবীটা যেন শুকনো ধুলিধূসর গুমোটের মধ্যে খাবি খাচ্ছে। আকাশ যেন আরও গলে পড়ছে এবং এই নীরস গলিত আভা একজনকে অতিষ্ঠ করে তোলে, আবার দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন করে দেয়। নিশ্চয়ই এ আকাশ সে আকাশ নয়—অন্য যে কোনো জায়গায় যেমন দেখা যায়। এ নিশ্চয় একটা বিশেষ আকাশ, স্থানীয় আকাশ, সমতল—কঠিন আকাশ। যে মানুষগুলো এই অদ্ভুত শহরে বাস করে তাদের গভীর নিঃশ্বাসে এর সৃষ্টি।

দূরের নীল অন্ধকার মিলিয়ে গিয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে ধোঁয়াটে কাচের রঙে এবং ক্রমশ তা ঘনীভূত হয়ে এগিয়ে আসছে, ঘনতর হচ্ছে শহরের দিকে। স্বচ্ছ কিন্তু দুর্ভেদ্য যেন একটা দেওয়াল। কালো কালো বিন্দুর মত এলোমেলো ভাবে, ঝলক দিয়ে উড়ে যাচ্ছে মাছিগুলো। ওটা আবার মনে পড়িয়ে দেয়—কাচের দুর্ভেদ্যতার কথা। আর একটা উষ্ণ, গুরুভার নিঃশব্দতা ঘনতর এবং গুরুভার হয়ে উঠছে সারাক্ষণ ধরে।

সেই নিঃশব্দতার মাঝখানে একটি মহিলার আধো ঘুমে জড়ানো মন্থর কণ্ঠ সঙ্গীতের মত বেজে উঠল: "তাইসিয়া, পোশাক করছো?"

ওই রকম আর একটি কণ্ঠ, আরও একটু মিহি সুরে মন্থরভাবে জবাব দিলে: "পোশাক করছি ই···ই···"

আবার নিঃসাড়। তারপর আবার:

"তাইসিয়া ··· তোমার নীল পোশাকটা পরছো তো?" ···

"হ্যাঁ, নীল পোশা-া ··· া ক।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ অদ্ভুত ভবঘুরে

ভ্লাডিভোস্টক থেকে নিম্নলিখিত একটা খবর 'দি ডক্টর' নামক সমালোচনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল:

"বেদনার সঙ্গে ডাক্তার এ. পি. ক্রমিন্‌স্কির মৃত্যুসংবাদ জানাতে হচ্ছে—ভবঘুরে হিসেবে যিনি বহু বৎসর অতিবাহিত করে গেছেন। অসুস্থ অবস্থাতেই হতভাগ্য মানুষটিকে শহর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে তাঁকে ভর্তি করতে অস্বীকার করা হয়। কারণ, হাসপাতালের কিছু পুরানো পাওনা তিনি নাকি শোধ করেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর ভবঘুরেরা তাঁর জন্য একটা চিত্তাকর্ষক অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করেন এবং তাঁদের মধ্যে একজন শেষ বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বলেন: 'তুমি আমাদের মধ্যে বাস করে গেছ,

তোমার স্বজনদের দ্বারা তুমি পরিত্যক্ত ও বিস্মৃত।... আমরা পাপ করেছি একসঙ্গে এবং কষ্টও ভোগ করেছি একত্রে। এখন আমরা এসেছি তোমাকে তোমার সমাধিতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে—যে বিশ্রামস্থানটুকুর জন্যে আমরা সকলেই অপেক্ষা করে আছি।'...”

ঘটনাক্রমে দু'বার এই মানুষটির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। প্রথমবার ১৮৯১ সালে লাবার তীরে—মাইকোপের কাছে। দশ বছর পরে আবার ইয়ালটায়। লাবার ধারে প্রধান সড়কে তখন রসটোফের একদল ভবঘুরে রাস্তার পাথর ভাঙার কাজ করছিল। আমি এক রাত্তে এসে পড়েছিলাম তাদের মধ্যে। তাদের দিনের কাজ তখন শেষ এবং প্রস্তুতি চলছে চা পানের। লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা, মোটা মতো একটি ভবঘুরে তখন কাঠের আগুনে কেটলিতে জল গরম করতে ব্যস্ত; তার তিনজন সঙ্গী রাস্তার ধারে একটা ঝোপের তলায় তখন বিশ্রাম করছে, এবং অন্য আর একজন—পরণে গ্রীষ্মের হাল্কা সূতীর পোশাক, মাথায় কানা-চওড়া খড়ের টুপি এবং পায়ে সাদা জুতো—বসেছিল পাথরের স্তূপের ওপরে। আঙুলের ফাঁকে ছিল সিগারেট। একটা বেত দিয়ে সিগারেটের ধূসর ধোঁয়াগুলোকে আঘাত করতে করতে, তার চারপাশে যেসব লোকজন ছিল তাদের দিকে না তাকিয়েই কথা বলছিল।

“বেশ তো, অসুবিধেটা কি?” কাছাকাছি একটি ছোকরাকে সে শুধোলে।

লাবার জলের ওপরে তখন সূর্যাস্তের ম্লান রক্তিম প্রতিচ্ছায়া কেঁপে কেঁপে উঠছে। লোহার মরচের মত রঙ—ন্যাড়া প্রান্তর থেকে পাকিয়ে উঠেছে একটা গরমের ভাপ; বিরাট খড়ের গাদাগুলো নদীর পেছনে কিংখাবের স্তূপের মত মিটমিট করছে; কুয়াশাচ্ছন্ন দিগন্তে ধোঁয়াটে পাহাড় ঠেলে উঠেছে আকাশে এবং কোথায় অনেক দূরে যেন একটা মাড়াই কলের একঘেয়ে শব্দ হচ্ছে।

ছোকরাটি মুখ ভার করে কথা বলছিল। তার ফোলা ফোলা মুখটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন শোথ রোগে ভুগছে। বলছিল, “আমার চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা করবেন না মশায়। আমিও একজন ডাক্তারি ব্যবসার লোক।”

“তাই নাকি?”

“হ্যাঁ। বুঝে কথা বলুন।”

সে আবার বললে, “তাই নাকি?” বেত ঘোরাতে ঘোরাতে ধোঁয়াগুলোকে পিটোতে লাগল। তারপর আমার দিকে তাকাল সকৌতূহলে। জিজ্ঞেস করলে, “তুমি আবার কে হে ছোকরা?”

"একজন যুবক মাত্র।" আমি উত্তর দিলাম এবং অন্য সব ভবঘুরেরা যেন আমার কথার সমর্থন করে হাসল।

লোকটির ঠেলে বেরুনো চোখগুলো আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল। মস্করা করার মতো যেন হাসছে এবং মনে হলো—আমার মুখের ওপরে যেন স্থির। সেই নীরস গিলে খাওয়ার দৃষ্টি আমাকে কেমন একটা অস্বস্তিকর সুড়সুড়ির অনুভূতি দিতে লাগল। সে আমার আজও বেশ মনে আছে। মুখটি বেশ ছিমছাম—কামানো। সে তার আত্মমর্যাদা এখনও হারিয়ে ফেলেনি—এটা বেশ পরিষ্কার। ভবঘুরেদের মধ্যে একজন যখন আলস্যে গড়াতে গড়াতে তার পায়ের ওপর এসে পড়ল, তখন সে চমকে উঠল এবং চট করে পাটা সরিয়ে নিলে। এবং তার রোগা রোগা হাতে বেতটা শূন্যে আস্ফালন করে শাসালে।

আঙুলে সোনার আংটি পরা—তাতে 'সৌভাগ্যসূচক পাথর' বসানো। পাথরটার রামধনুর মতো রঙের সঙ্গে লোকটির গর্বিত চোখের দীপ্তির কোথায় যেন একটা মিল আছে। ঢিলে মেজাজে কিন্তু খুঁচিয়ে তোলা, উত্তেজিত করা এক ধরনের না-উঁচু না-নীচু গলায় জিজ্ঞেস করে চলেছে সকলের পরিচয়। উত্তর আসছে অনিচ্ছুক—অপ্রসন্ন। তাতে সে অপ্রস্তুত হচ্ছে না কোনো ভাবেই কিন্তু তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে এ মুখ থেকে ও মুখে এবং প্রশ্ন করে যাচ্ছে একের পর এক।

"সবাই যদি তোমার মত দায়িত্বহীন হয়ে জীবনযাপন সুরু করে তা হলে কি ঘটবে বলতো?" সে বললে।

"আমি তার কি পরোয়া করি?" রাগে গরগর করে উঠলো ডাক্তারী লাইনের ছোকরা। এবং আগুনের কাছ থেকে দাড়িওয়ালা লোকটিও কর্কশ চাপা গলায় এদের কথায় যোগ দিলে। বলে উঠল, "আর তুমি! তোমার নিজের ব্যাপারটা কি?" তারপর বিজয়গর্বে বললে, "তবে? তুমিই দেখ!"

সহসা—অত্যন্ত দ্রুত দক্ষিণাঞ্চলের রাত নেমে এল প্রান্তরের ওপরে; জ্বলন্ত তারাগুলো ঘন ক'রে কে যেন ছড়িয়ে দিল; দূরে নদীর জলরাশি কেঁপে উঠল কালো মখমলের মত এবং এখানে ওখানে ঝিকিয়ে উঠল সোনালী ফুলকি। গম্ভীর এবং বিষাদময় নীরবতার মধ্যে প্রকট হয়ে উঠল তামাকের গন্ধ। লোকগুলো তাদের ঝোলা থেকে রুটি আর শূয়োরের শুকনো মাংস বের করে খেতে সুরু করে দিলে। কিন্তু ভদ্রলোকটি তার জুতোয় বেতের টোকা দিতে দিতে প্রশ্ন করে যেতে লাগল:

"একজন যদি জীবন-ধারার সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিঁড়ে ফেলে তা হলে কি ঘটবে?" সে জিজ্ঞেস করলে।

"কিছুই ঘটবে না," বিষণ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলে পাকা-মাথা লোকটি।

দূরে কোথায় নদীর পার থেকে একটা গাড়ির চাকার কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ আর সিসকিন পাখির শিস্ ভেসে আসছিল। আগুনটা ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে, ছোট্ট লাল লাল ফুলকিগুলো অন্ধকারে উড়ে পড়ছে এবং পোড়া কাঠগুলো নিঃশব্দে পরস্পরের কাছ থেকে সরে সরে যাচ্ছে।

"আরকাদি পেট্রোভিচ!" দূর থেকে পরিষ্কার একটি নারী-কণ্ঠের ডাক ভেসে এল।

আংটি পরা মানুষটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, বেত দিয়ে তার হাঁটুর ধুলো ঝাড়লে এবং বিদায় জানিয়ে নদীর কিনার দিয়ে অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেল। অন্য সবাই নীরবে তাকে দেখতে লাগল।

"লোকটি কে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম এবং ওরা সবাই আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগল।

"একমাত্র শয়তানই জানে।"

"আমরা শুনেছি—সে এখানে কসাকদের বাড়িতে থাকে।"

"ও তো বলে—ও নাকি ডাক্তার।"

ওরা একটা মতলব নিয়েই বেশ জোরে জোরে কথা বলছিল—যাতে ওদের আলোচনা ডাক্তার শুনতে পায়।

রোগা-মত একটি অল্পবয়েসী ভবঘুরে, মাথায় লাল লাল চুল, মুখে ঘা—মাটির উপরে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। আকাশের দিকে মুখ। মৃদু কণ্ঠে বলে উঠল, "তারায় থুতু ছিটিয়ে তুমি তার নাগাল পাবে না।"

"বুঝলে হে স্যাঙাৎরা, আমাদের বরং তুর্কীস্তানের দিকেই যাওয়ার চেষ্টা করা ভাল।" ডাক্তারী লাইনের যুবকটি বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল। "তুর্কীরা লোক ভাল। এখনাকার জীবন সম্বন্ধে আমি অতিষ্ঠ।"

*　　*　　*　　*

বহু বছর পরে, একদিন ইয়ালটা শহরের পার্কে ডিমিট্রি নারকিসোভিচ ম্যামিন সাইবিরিয়াকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাকে পেলুম না। এইখানেই সাধারণত আমাদের দেখা হত। হাজির হলাম গিয়ে তার বোর্ডিংয়ে। তার ঘরে ঢুকে একেবারে পড়ে গেলাম এক জোড়া ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখের সামনে—

যার উজ্জ্বল দীপ্তি সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলে লাবার তীরে সেই এক রাতের কথা, সেই ভবঘুরের দল, গ্রীষ্মকালের হাল্কা পোশাকে সেই ডাক্তার।

"এসো আলাপ করিয়ে দিই", ম্যামিন তার অতিথির দিকে বেঁটে-খাট মোটা হাতখানা বাড়িয়ে বললে, "এই নাও তোমার একটি বিষাক্ত নমুনা।"

টেবিলের প্রান্তে চিবুকটা ঠেকিয়ে অতিথি একবার মুখ তুলে তাকাল,আবার নামিয়ে নিলে—মনে হলো তার মাথাটা কাটা গেছে। গুটিসুটি হয়ে বসেছিল সে—চেয়ারটা যত্তোদূর সম্ভব টেবিল থেকে দূরো সরানো এবং হাত দুটি টেবিল-ঢাকার তলায় লুকানো। টাকের দু'পাশে ছোট ছোট দুটি কান অনাবৃত ক'রে অবিন্যস্ত সাদা চুলের গুচ্ছ ফেঁপে আছে যেন দুটো শিংয়ের মতো। তার কানের পাতা দুটোর আকার একটু বিশেষ ধরনের—যেন কিছুটা ফোলা ফোলা। ছিম্‌ছাম্‌ কামানো মুখ—কিন্তু নাকের তলায় সাদা গোঁফ-জোড়া দিয়েছে তাকে একটা সামরিক আদল। গায়ে তার নীল রঙের সার্ট। কলার ছিড়ে গেছে এবং বোতামও নেই। সেই ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল তার ময়লা বসা ঘাড় এবং পেশল ডান কাঁধের খানিকটা। এমনভাবে সে বসেছিল—যেন টেবিলের ওপার থেকে এখুনি লাফ দিয়ে উঠবে। চেয়ারের তলা থেকে দেখা যাচ্ছে তার তাতারী চটি পরা পা। সে আমাকে সকৌতূহলে দেখছিল এবং আমার চেনা সেই এক ধরনের কণ্ঠস্বর—যা খাদেও নয়, চড়াও নয়—তেমনি গলায় ধীরে ধীরে কথা বলছিল।

"এক ধরনের ছত্রাক আছে," সে বলল, "লাতিনে যাকে বলে 'মেরুলিয়াস ল্যাক্রিম্যানস'—কাঁদুনে জাতের—আবহাওয়া থেকে রস টেনে আনবার বিস্ময়কর যার ক্ষমতা। কোনো গাছ এদের দ্বারা আক্রান্ত হলে বিস্ময়কর ভাবে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে শেষ হয়ে যায়। আর নতুন তৈরী ঘরের কড়িতে যদি তা একবার ধরে তা হলে সবটাই পচতে সুরু করে দেয়।"

মাথা তুলে ডাক্তার ধীরে ধীরে তার বীয়ারে চুমুক দিতে লাগল! তার উঁচু কণ্ঠার হাড়টা প্রতিটি ঢোক গেলার সঙ্গে সঙ্গে ওঠা-নামা করতে লাগল। ম্যামিন ইতিমধ্যেই মাতাল হয়ে গেছে। তার বড় বড় চোখ দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, অত্যন্ত মনযোগ দিয়ে শুনছিল ডাক্তারের কথা আর তার আর্মানী ধরনের নাকের কাছে ছোট পাইপটা চেপে ধোঁয়া ছাড়ছিল ঘন ঘন। থেকে থেকে সে মাথা নাড়ছিল আর জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল এবং একটু একটু করে চেয়ারের ভেতরে যেন তার স্থূল গোল দেহটা ডুবে যাচ্ছিল।

"লোকটা আগাগোড়া মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে।" সে বললো তার অতিথি তখন পানীয়ে মন দিয়েছে।

গ্লাস শূন্য করে অতিথি আবার সেটা ভরে নিলে এবং মদের ফেনায় ভেজা গোঁফে জিভ বুলিয়ে নিয়ে আবার বলতে সুরু করল।

"মানে—আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হলো এই যে, রুশ সাহিত্য অনেকটা সেই ছত্রাকের মত। জীবন থেকে সে তার রস, তার নোংরা, তার ঘৃণিত বস্তু সব শুষে নিচ্ছে এবং যে সুস্থ শরীরগুলো এর সংস্পর্শে আসছে তাদের মধ্যে তার মারাত্মক প্রভাব ছড়িয়ে দিচ্ছে। এর নিষ্কৃতি নেই।"

"আচ্ছা এ সম্পর্কে তুমি কি বল ?" আমাকে একটা কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে ম্যামিন জিজ্ঞেস করলে।

"সাহিত্য ঠিক সেই সংক্রামক ছত্রাকের মত অস্বাস্থ্যকর এবং ঘেয়ো।" অতিথি একটুও বিচলিত না হয়ে, জোর দিয়ে বললে।

নষ্টবুদ্ধি এই সমালোচকটিকে ম্যামিন বেদম গালাগাল দিতে সুরু করলে। শূন্য একটা মদের বোতল তুলে টেবিলে ঠকাস্ করে ঠুকে দিলে। আমার ভয় হলো—পাছে ওই বোতল সে তার অতিথির টেকো মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে। আমি তার অতিথির কাছে প্রস্তাব করলাম বাইরে একটু আমার সঙ্গে বেড়িয়ে আসবার জন্যে এবং সে-ও উঠে দাঁড়িয়ে অশিষ্টভাবে, বোধ করি কৃত্রিম একটা হাই তুললে।

"আমি একটু বেড়িয়েই আসি," সে মৃদু হেসে বললে এবং দ্রুত লঘু পায়ে নিপুণ হাঁটিয়ের মত বেরিয়ে গেল।

ডিমিট্রি নারকিসোভিচ আমাকে জানাল—উদ্ভট সব কথায় তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর সেই বন্দর থেকে লোকটা তার সঙ্গে প্রায় সেঁটে আছে। সাহিত্যের বিরুদ্ধে যতো রকমের নিন্দা করা যায়—তাই দিয়ে সে আজ দুটো দিন তাকে উত্যক্ত করে মারছে।

"আমি ওকে ঝেড়ে ফেলতে পারিনি," সে বললে ; "লোকটা যেন জোঁকের মত। আর ওকে তাড়িয়ে দিতেও আমার মনে লাগছিল। যাই হোক, ও হলো এক রকমের শিক্ষিত হতচ্ছাড়া। ওর নাম হলো ডাক্তার আরকাদি রুমিনস্কি—বা রুমিন, বোধ হয় কথাটা 'রুমকা' (মদের গ্লাস) থেকে এসেছে। অত্যন্ত চতুর শয়তান ও—সাক্ষাৎ পাপের মত দুরাত্মা! মদ গিলতে পারে একটা উটের মত এবং কখনো মাতাল হয় না! গতকাল সারাটা দিন আমি ওর সঙ্গে

বসে মদ খেয়েছি। ও আমায় বললে—এখানে ওর স্ত্রীকে নাকি দেখতে এসেছে, তিনি নাকি একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী।"··· ম্যামিন যার নাম করলে—তখন তিনি বিখ্যাতই বটে। "অভিনেত্রীটি এখানে এখন রয়েছেন ঠিক কিন্তু আমি নিশ্চয় বলছি—ও লোকটা মিথ্যে কথা বলেছে!"

প্রবলভাবে চোখ ঘুরিয়ে ডিমিট্রি বিদ্রূপ করে উঠল।

"এই নাও তোমার একটা লেখার বিষয়," ব্যঙ্গ করে সে বললে। "এই তোমার নায়ক। কি চমৎকার একটা লোক! পৃথিবীর সেরা মিথ্যেবাদী! ব্যর্থ লোকগুলো সব সময়েই মিথ্যেবাদী! দুঃখবাদ খোদ একটা মিথ্যা, কারণ ওটা হলো ব্যর্থ মানুষের দর্শন।"···

দিন দুই পরে—আমি যখন বেশ একটু রাতের দিকে দারসান পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তখন আবার ডাক্তারের দেখা পেলাম। মাটিতে বসেছিল সে—পা দুটো ছড়ানো। সামনে একটা মদের বোতল এবং একটা কাগজে কিছু স্যাণ্ডউইচ, শসা আর মাংসের সসেজ। আমি থমকে দাঁড়িয়ে আমার টুপি নাড়লাম। একটা ঝাঁকি দিয়ে মুখ তুলে সে আমার দিকে তাকাল এবং আমাকে সম্ভাষণের ভঙ্গীতে সবিস্ময়ে বলে উঠল, "আরে তুমি! বসবে নাকি আমার সঙ্গে একটু? এসো, বসে পড়ো!"

আমি তার কথা মতো বসলাম এবং সে আমাকে তার সেই একগুঁয়ে দৃষ্টিতে যেন একবার যাচাই করে নিয়ে আমার হাতে মদের বোতল গুঁজে দিলে।

"বোতলেই অবিশ্যি তোমাকে খেতে হবে, গ্লাস নেই।" রুমিনস্কি বললে, "ব্যাপারটা খুব বিস্ময়কর কিন্তু। আমার যেন বোধ হচ্ছে—আমি যখন ছোট্ট ছিলুম তখন কবে যেন তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

"না—যখন ছোট্ট ছিলেন তখন নয়।"

"না—নিশ্চয় নয়। আমি তোমার চেয়ে অন্তত বিশ বছরের বড় হব। তবে আমার তিরিশ বছর বয়সের আগে গোটা কালটাকে আমি আমার বাল্যকালের মধ্যে ফেলি, ওই যে-কালটা আমার চলে গেছে—যাকে বলে সাংস্কৃতিক জীবনকাল।"

তার মৃদুমন্থর কণ্ঠস্বর আনন্দে ফেটে পড়ল এবং কথাগুলো যেন লঘুভাবে তার জিভ দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বার হয়ে এল। তার পুরু জিনেনের সামরিক সার্ট, তার ঢিলে-ঢালা টার্কিস পাৎলুন, এবং তার পায়ের জুতো দেখে মনে হয়—সে ভালভাবে থাকার মতই রোজগার করছে। তাকে আমি কোথায় প্রথম

দেখেছি সে কথা মনে করিয়ে দিলাম এবং একটা ঘাসের খড়কেয় দাঁত খুঁটতে খুঁটতে মন দিয়ে ডাঃ রুমিনস্কি আমার কথা শুনতে লাগল।

"তাই নাকি?" তার সেই পরিচিত বিস্মিত কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠল। "তুমি এখন কি করছ? তুমি লেখক? সত্যি! কি তোমার নাম? নামটা কখনো আগে শুনিনি তো। এতে অবিশ্যি অবাক হওয়ার কিছু নেই—কারণ আধুনিক সাহিত্যের আমি কিছু জানিনে, জানতেও চাইনে! সাইবিরিয়াকের বাড়িতে সেদিন আমার মতামত তুমি শুনেছ। একটা কথা বলি, লোকটি অদ্ভুত একটা কাঁকড়ার মতো, তাই না? সাহিত্য—বিশেষ করে রুশ সাহিত্য—একটা পচা ঘায়ের মত, বেশীর ভাগ লোকের পক্ষেই বিষাক্ত এবং তোমার কথা বলতে গেলে—ওটা একটা বাতিক।"

এই ভঙ্গীতে এবং বেশ খোস মেজাজে ও একটা সুস্পষ্ট আনন্দে অনেকক্ষণ ধরে রুমিনস্কি কথা চালিয়ে গেল। আর আমি, বাধা না দিয়ে পরম ধৈর্যে রুমিনস্কির কথা শুনতে লাগলুম।

"তুমি তাহলে আমার প্রতিবাদ করছ না?" রুমিনস্কি বললে।

"না।"

"তাহলে আমার কথা তুমি মান?"

"না—অবশ্যই মানি না।"

"ও, তাহলে আমার কথা প্রতিবাদের যোগ্য মনে করো না। এই তো?"

"না, তাও না। সাহিত্যের মর্যাদা অনেক উঁচুতে বলেই আমি মনে করি এবং তা নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না।"

"ও, এই তোমার কৈফিয়ৎ? তা ভাল।—"

পেছন দিকে মাথা হেলিয়ে এবং চোখ বুজে মদের বোতলে রুমিনস্কি চুমুক লাগাল, তারপর সেটা খালি ক'রে দিয়ে গোঁফ চাটতে লাগল।

"বেশ ভাল বলেছ", রুমিনস্কি আবার বললে। "একজন ভালো গীর্জা ভক্তের মত বলেছ কথাটা। যখন কামারের জন্য গীর্জাটা হয়ে ওঠে কামারশালা, নাবিকের জন্যে তার জাহাজটাই হয়ে ওঠে গীর্জা, বা একজন রসায়নবিদের কাছে তার গবেষণাগার গীর্জার মতো—শুধু তখনই মানুষ তার নষ্টবুদ্ধি, তার খেয়াল ও তার আচরণ দিয়ে অন্যের পক্ষে বাধা না হয়ে বেঁচে থাকতে পারে। ভাল ভাবে বেঁচে থাকা মানে অন্ধের মত বাঁচা। শুধু তুমি যা দেখতে চাও বা যা কামনা করো সেটুকু ছাড়া কিছুই না দেখা এবং কিছুই না কামনা করা। এটাই সুখের

খুব কাছাকাছি—এমন একটা লুকানো কোণ—একটা ছোট্ট, অন্ধকার, আজে-বাজে জিনিস রাখার কুঠরি, যেখানে মানুষ নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে। চ্যাটুব্রিয়াণ্ডসের 'আমার সমাধি থেকে লেখা চিঠি' পড়েছ? তাতে তিনি বলেছেন: 'সুখ একটা মরুস্থান—তার বাসিন্দারা কেবল আমার কল্পনারই সৃষ্টি।' রুমিনস্কি কথা বলছিল নিঃসঙ্গ অবরোধ থেকে সত্মমুক্ত মানুষের মতো—যেন কথা বলতে যে ডাক্তার ভোলেনি সেইটে স্থিরনিশ্চয় হয়ে নিতে চায়।

অদূরবর্তী শহর থেকে ভেসে আসা একটা পিয়ানোর সুর এবং কতকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ জাহাজঘাটের পাথুরে সড়কে যেন আছড়ে পড়ছে। একটা কালো শূন্যতা যেন শহরের ওপরে ঘনিয়ে আছে। এবং বহু দূরে, রাতের অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সোনালী পোকার মতো ভেসে ভেসে আসা একটা স্টিমারের আলো ইঙ্গিত দিচ্ছে গহন সমুদ্রের। রুমিনস্কি তাকিয়ে ছিল মহা-শূন্যের দিকে। তার চোখের সে-দৃষ্টি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল তার সোনার আংটিতে বসানো সেই ওপ্যাল পাথরটার মনোরম দ্যুতি—লাবা নদীর তীরে আর এক রাতে যা দেখেছিলাম।

"সুখ মানে—মানুষ যখন সফলভাবে তার নিজত্বকে আবিষ্কার করে এবং সেই আবিষ্কারে যখন সে পরিতৃপ্ত থাকে," চাপা গলায় সে বলতে লাগল।

তার সিগারেটের জ্বলে ওঠা আগুন উজ্জ্বল করে তুলল তার টিকলো খাড়া নাক, তার মোটা গোঁফ, আর কালো চিবুকটা।

"একটা শূয়োর বা কুকুর বা যে কোনো জন্তুর ক্ষেত্রেই নিজেকে ভালো-বাসার ব্যাপারটা আসে স্বাভাবিকভাবে—ওটা একটা সহজাত জ্ঞান। আর মানুষ ভালবাসবে সেইটে—যেটা সে সৃষ্টি করেছে তার নিজের জন্যে।"

"আপনি কোনটি ভালবাসেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আগামী কাল।" রুমিনস্কি চটপট উত্তর দিল—"আমার নিজের আগামীকাল—এবং শুধু ওইটুকু। সেটা কেমন হবে তা জানার সৌভাগ্য আমার কখনো হয়নি। তোমার ক্ষেত্রে ওটা আলাদা: তুমি জান যে সকালে উঠেই তুমি লিখতে সুরু করবে অথবা এমন কিছু করবে যা করতে তুমি বাধ্য। হয়তো তুমি পরে সেই পেটমোটা কাঁকড়া ম্যামিনের সঙ্গে বা অন্য কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবে। তাছাড়া তোমার কাপড়জামার চিন্তা আছে। অন্যদিকে, আমি জানি নে আগামীকাল আমি কি খেতে চাইব অথবা আমি কি করব, অথবা কোন্ কোন্ মানুষের সঙ্গে আমার কথা কইতে ইচ্ছা হবে।

বোধহয় তুমি ভাবছ যে তুমি একটা মাতাল, কি একটা লম্পট বা সমাজ-বিতাড়িতের প্রলাপ শুনছ? তেমন যদি ভেবে থাক তাহলে ভুল করেছ। সুরাসার খেতে আমি ঘেন্না করি, শুধু ভাল মদই খাই এবং কচিৎ কখনো বীয়ার। পরিত্যক্ত আমি হইনি বরং আমিই সকলকে পরিত্যাগ করেছি।"

বলার উৎসাহ রুমিনস্কির এমনি ছিল যে তার সততায় আমি সন্দেহ করতে পারিনি।

একজন শিক্ষিত মানুষের স্বাভাবিক জীবন কেন ছেড়ে এসেছে এ কথা বলবার জন্যে যখন তাকে অনুরোধ করলাম, আমার হাঁটুর ওপর একটা চাঁটি বসিয়ে দিলে। "তুমি বইয়ের খোরাক খুঁজছ." সহাস্যে রুমিনস্কি চিৎকার করে উঠল। তারপর পুরোপুরি রাজি হয়েই এবং কিছুটা অহমিকার সঙ্গে তার মন্তব্যের সূত্র ধরে সুরু করল তার জীবনের গল্প। সে গল্প নিশ্চয়ই অধিকাংশ আত্মজীবনীর মতো সত্য।

রুমিনস্কি সুরু করল, "আমার উল্লেখযোগ্য জীবন আরম্ভ হয়েছিল একটা ভুলের মধ্য দিয়ে। জীববিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব—বা যে সমস্ত বিজ্ঞানে মানুষ সম্পর্কে আলোচনা আছে—সেই সব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ওপর ছিল আমার প্রবল মোহ। স্বাভাবিক ভাবে এই মোহ আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী বিভাগে তাড়া করে নিয়ে গেল। পড়াশোনার প্রথম বছরেই, একদিন মড়া কাটতে গিয়ে মানুষের ওই হীনতম অবস্থা দেখে আমি ভাবতে সুরু করি। আমার বোধ হলো—যেন এক ধরনের নিষ্ঠুর বিদ্রূপ আমাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছে এবং সাধারণভাবে মানুষের ওপরে, একটা ঘৃণা বোধ করতে লাগলুম। বিশেষ করে আমার নিজের ওপরে—কারণ মানব-দেহধারী হিসেবে মড়া হওয়াই যার একমাত্র কর্তব্য এবং পরিণাম।

"ওই নোংরা কাজ আমার তখনই ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমি ছিলুম একগুঁয়ে, তাই নিজেকে আমি জয় করতে চেয়েছিলাম। এই নিজেকে জয় করবার চেষ্টা তুমি কি কখনো করেছ? সে এক অসম্ভব ব্যাপার—যেন নিজের মাথা কেটে সে জায়গায় তোমার প্রতিবেশীর মাথা বসানো। এই অসম্ভব ব্যাপারটা করা খুবই শক্ত শুধু এই জন্যে নয় যে—তোমার প্রতিবেশীকে এই রকম মাথা বদলে রাজি কিছুতেই করা যাবে না।"

রুমিনস্কি নিজের রসিকতায় নিজেই খুব খুশি হয়ে হাসতে লাগল। তারপর চোখ বুজে, সমুদ্রের নোনা হাওয়া বুক ভরে টেনে নিয়ে বললে, "কি অপূর্ব

একটা গন্ধ আসছে সমুদ্র থেকে।··· যাক্, নিজের কথাই বলি : মনে মনে আমি তোলপাড় করতে লাগলুম—আত্মাটা কোথায় এবং সেটা দেখতেই বা কেমন, তাছাড়া তার হেতু কি এবং কোথায়? এবং তাড়াতাড়ি—খুবই তাড়াতাড়ি আমার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, হেতুটা এক-চোখ-কানা কুকুরের মতো—শয়তান যার মালিক; আর বুঝলুম—ওটা নির্ভর করে দেহের অবস্থার ওপর। বুঝলুম—যখন আমার দাঁতের ব্যথা হয়, কি মাথা ধরে, কি লিভার খারাপ হয়, তখন পৃথিবীটা খুব জঘন্য লাগে। সমস্ত চিন্তাই একটা ক্রিয়া, শুধু আমাদের কল্পনা স্বাধীন—মুক্ত। কোনো একজন ইংরেজ ধর্মাধ্যক্ষ এটা বেশ ভাল ভাবেই বুঝেছিলেন ··· কিন্তু দোহাই তোমার, এরকম সাক্ষীর দোহাই পাড়ায় এটা যেন ভেবে ব'স না যে আমি একজন আদর্শবাদী বা অন্য কোন ধরনের—'বাদী'। আমি সমস্ত রকমের দর্শনের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম করেছি—যদিও ··· যদিও এটা অবশ্য আমি বুঝি যে, দর্শন হলো মস্তিষ্কের একটা দুরারোগ্য ব্যাধি।

"সহজ করে বলতে গেলে : আমি সেই জাতের মানুষ যে এই সব নিরর্থক ব্যাপারকে মোটেই গুরুত্ব দেয় না। অন্যকে ঠকানো এবং নিজেকেও—এই বাজে জিনিসকে বলা হয় সংস্কৃতি—কর্ষণা, এর বাইরের এবং ভেতরের যতো ফাঁকি ও জেল্লা, মানুষকে শ্রমের এলোমেলো ব্যর্থতার গভীর থেকে গভীরে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু, যতদূর মনে হয়, তুমি এই কর্ষণার সমর্থক? আমি অবশ্য তোমাকে আঘাত দিতে চাই না।"

"বলুন না—আমি কিছু মনে করছিনে। আপনি কি ধরনের মানুষ আমি জানতে চাই।"

"সত্যি চাও? তবে শোন ···"

চতুরতার সঙ্গে বাছা বাছা কতকগুলো শব্দ দিয়ে এই লোকটি 'কর্ষণা' ব্যাপারটাকে ভেঙ্গে একেবারে গুঁড়িয়ে দিলে। একটা স্কুলের ছেলে যেমন তার পড়ে শেষ করা বইগুলোকে হিংস্র উল্লাসে ছিঁড়ে ফেলে তেমনি একটা উল্লাস লক্ষ্য করলুম তার মধ্যে। রাতের নির্মল হাওয়ায় তাকে যেন একটু কুঁকড়ানো মনে হচ্ছিল। কৃশকায়, নমনীয়—সার্টের আস্তিনে হাত ঢুকিয়ে যেভাবে গুটি-সুটি মেরে বসেছিল তাতে তাকে মনে হচ্ছিল সবে যৌবনে পৌঁছানো একটা ছেলের মত। নীচে, অনেক দূরে কুয়াশার মধ্যে ইতস্তত বিচ্ছুরিত একটা আলোকপিণ্ড যেন আকাশে ঝুলছিল—সেটা ভেসে চলেছে উত্তরের দিকে, আর একটু পরে হারিয়ে যাবে রাতের স্যাঁতানো অন্ধকারে। ঘরের জানালা-

গুলোয় কেঁপে কেঁপে উঠছিল হলুদ বরণ আলোকচ্ছটা এবং নিভে যাচ্ছিল একে একে—যেন সমুদ্রের অন্ধকারে বাড়িগুলো একটা একটা করে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল।

"সে সময়ে দেখতে আমি সুন্দরই ছিলাম"—ক্লমিনস্কি বলে চলল : "আমার কথাবার্তা ছিল আমুদে এবং মেয়েরাও আমাকে ভালবাসত। তিরিশ বছর বয়সে আমি তাদের মধ্যে একজন অভিনেত্রীকে বিয়ে করলাম ; তাকে বিয়ে করলাম সেই এক একগুঁয়েমীতে। অন্য মেয়েদের চেয়ে সে-ই আমাকে কম ভালবাসত। সেই সময়েই আমি এইটে বোধ করতে শুরু করি—এই থিয়েটার, বাজনার আসর, সাহিত্যের আলোচনা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে চুল-চেরা বিচার —এ সব আমার জন্যে নয়। বিশ, তিরিশ এমন কি শ'য়ে শ'য়ে লোককে আমি অজ্ঞাত কারণের জন্য অত্যাচারিত হতে দেখেছি। ৎচেইকভস্কি, অস্‌ট্রোভস্কি, ডস্টয়ভস্কি এবং ওঁদের মতো আরও অনেককে আমি যন্ত্রণাময় রোগে মরে যেতে দেখেছি। এসব আমাকে মনে পড়িয়ে দিত এক হাসপাতালের অসুস্থ এক বুড়ি নার্সে'র কথা, ঠাণ্ডা এবং বিরক্তিকর—নাম ছিল তার বুকিনা। বিশ্রী একটা অভ্যেস ছিল তার। অসুস্থ এবং মরণাপন্ন রোগীদের সে বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলতো 'ভার্জিন মেরীর স্বপ্ন'-কথা।

"এই সব সুসভ্য পরিবেশে নিজেকে আমার মনে হত মেয়েদের টুপির দোকানের দোকানীর মত—কেবলি লাফ ঝাঁপ করছি ; অথচ ব্যক্তিগত ভাবে ওগুলোর একটাও আমার কাজে লাগবে না। তবু, রীতি মাফিক ওগুলো নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে হবে, নাড়া-চাড়া করতে হবে—এমন কি প্রশংসাও। জীবনটা যুদ্ধ এবং ওই ব্যবহারিক ভদ্রতাটুকু মাত্র দিয়ে মানুষের মধ্যে যে জন্তু—যে জীবটা আছে, ডুমুরের ফুলের মতো তাকে তুমি লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

"আমার শরীরের গড়নটা ভালই ছিল, তাই কোমরে প্যান্ট সেঁটে রাখবার জন্যে কাঁধ বেড়ে দিয়ে কোনো ফালতু বাঁধুনির আমার দরকার হতো না। কিন্তু আমার স্ত্রী এই নিয়ে জেদ করতেন—কারণ, আর সবাই ও-সব পরে। তুমি ভাবতে পারো, এই ব্রেস, নেকটাই ইত্যাদি আলতু-ফালতু সব নিয়ে আমি ও আমার স্ত্রী ভয়ংকর ঝগড়া করতুম! আমার মনে হয়, মাঝে মাঝে তিনি যে দৃশ্যের অবতারণা করতেন তা ছিল তাঁর পেশাদারী ব্যাপার—অভিনয়ের অভ্যাস ঠিক রাখা। তিনি হয়তো আমাকে বলে বসতেন, 'ওঃ

আরকাডি, নিহিলিজম এখন একেবারেই ফ্যাশানের বাইরে।' বোকা ছিলেন না আমার স্ত্রী এবং প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী বলে প্রায়ই তাঁর উল্লেখ হত।"

ডাক্তার হাসল—খুব একটা আনন্দের হাসি বলে আমার মনে হলো না। তারপর চঞ্চল হয়ে বলে উঠল, "মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে, চুলোয় যাক।"

প্যাণ্টের পকেট থেকে ক্রিমিয়ান ফেল্ট টুপিটা বের করে রুমিনস্কি তাঁর মাথায় এঁটে-সেটে পরলে। তারপর বলে চলল :

"গল্পের বাকিটুকু ঢের বড়; তাছাড়া—সে সব বলতেও বিরক্তিকর লাগবে। তবে সবটার সারমর্ম বা মোদ্দা কথাটা হলো এই যে—আমাকে যদি মরতেই হবে তবে ইচ্ছা-মত আমার বাঁচারও অধিকার আছে। মানুষের বিধান আমার কাছে একেবারেই নিরর্থক—যদি আমাকে মৃত্যুর সেই মৌলিক বিধানের কাছেই আত্মসমর্পণ করতে হয়।...

"কুবানে যখন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়—তখনই এ কথা আমি বুঝতে শুরু করেছি। অবশ্য, আমার এ ধারণা আসে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে। রোমানরা যাকে বলতো 'ঘটনা-পরবর্তী'; বাস্তবিক এই জাতটা ছিল পৃথিবীর সেরা এক জাত—কারণ তাদের কাছে ওই যত আবেগপ্রবণতা, যত মানবীয়তা এবং ওই রকম সব কিছু ছিল যান্ত্রিক ভাবে, নিশ্চিত ভাবে বিতৃষ্ণার বস্তু। ভাবগুলো আসে সব সময় ঘটনার পরে; কোনো কিছুকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা, সত্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা—এই রকম যে বদ-অভ্যাসগুলো আমাদের আছে তার দ্বারাই আমরা উত্তেজিত হই। কেন হই তা আমি জানিনে। হ্যাঁ, সোজা করে বলতে গেলে এ সব থেকে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম। কারণ—তাই আমি চেয়েছিলাম এবং ব্যাখ্যাগুলো আমার এসেছিল পরে।

"অনেক বাধ্যবাধকতা, অনেক দায়িত্ব এবং আরও অনেক হাস্যকর বস্তু জীবনকে বিশ্রী করে তুলেছে। ওই হাস্যকর ব্যাপার আর আমি চাইনে—নিজেকে এই বলে সভ্যতার কাছে বিদায় নিয়েছিলাম।

"তারপর প্রায় দশ বছর কেটে গেছে। দিব্যি আকর্ষণীয় ভাবেই দিনগুলো যাপন করেছি—পূর্ণ স্বাধীনতায়। আশা রাখি—আরও দশটা বছর এই ভাবে কাটাতে পারব। আচ্ছা, তোমার সঙ্গদানের জন্য ধন্যবাদ—এখন বিদায়, একটা আরও ভালো জগতে আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত, আপ.তত বিদায়!"

"আপনি কোন জগতের কথা বলছেন?"

"ও... এইখানে—এই পৃথিবীতেই অবশ্য কিন্তু আমি যে জগতে থাকি—সেই

জগতে। আমি আশা করি—কশে এমনি মদ খেতে শুরু কর, যাতে আজেবাজে সব ছেড়ে তুমি আসল পথটিতে এস হাজির হতে পার।"

রুমিনস্কি তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে মোর্দ্‌কিনফ পার্কের দিকে নামতে লাগল। তার চলে যাওয়ার পরে পরেই ঘাসের ওপর সাড়া জাগিয়ে এক পশলা বৃষ্টি নামল।...

আমি দুটো দিন লোকটাকে খুঁজে খুঁজে কাটালুম চা-খানা, বাজার, রাত্রিবাস, বন্দর—কোথাও তাকে আর পেলাম না। তার যুক্তিতর্কগুলো আবার শোনবার সাধ ছিল।

এই বাউণ্ডুলে ডাক্তার আর তার বিখ্যাত অভিনেত্রী স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপার নিয়ে ম্যাক্সিম সাইবিরিয়াক একটা গল্প লিখেছিল। গল্পের নামটা কি ছিল আমার মনে নেই। সে এই গল্পে ভবঘুরেটিকে চিত্রিত করেছিল একটা দুর্ভাগা, অপদার্থ খুদে মাতাল হিসেবে—যে মানুষ নামের একেবারেই অযোগ্য। আর এই সম্পর্কেই ডাক্তার রুমিনস্কি একদিন তার সব কথা আমার কাছে অবারিত করে দিয়েছিল।

* * *

এই ধরনের চরিত্রের মানুষ যারা, তাদের নিজেদের কথায়—'স্বেচ্ছায় স্বাভাবিক জীবনধারা থেকে দূরে সরে গেছে' তাদের সংখ্যা রাশিয়ায় অবশ্যই অনেক হবে।

এখানে 'নভোজে ভ্রেমজা' পত্রিকা থেকে আর একটি লোকের খবর তুলে দিচ্ছি যে প্রায় ডাক্তার রুমিনস্কির মতই।

"এক অদ্ভুত ধরনের ভবঘুরে শ্রী গ—লোকটির বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। ধরা পড়ে এক পুলিসী তল্লাসীর সময়।" খবরটি দিয়েছিল 'ভারসেভস্কি কুরিয়ার' পত্রিকা: "তাঁর পরিচয় পত্রাদি সব ঠিকই আছে কিন্তু তিনি তাঁর বাসস্থানের কথা বলতে পারেননি। পরবর্তী অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে লোকটি ধনবান এবং অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার জন্য তাঁর পরম আগ্রহ। গৃহহারা ভবঘুরেদের জীবনযাত্রার প্রণালী সম্পর্কে তাঁর ছিল গভীর আকর্ষণ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এক বোর্ডিং স্কুলে তাঁর একমাত্র মেয়েকে রেখে তিনি পেশাদার ভবঘুরে হয়ে ওঠেন এবং রাতের আস্তানা হিসেবে ইটখোলার উনুনের কাছাকাছি বা ওই ধরনের সব জায়গায় আশ্রয় নেন। কেবলমাত্র শীতকালে ভীষণ তুষার-পাতের সময় তিনি ওয়ারশতে ফিরে যান

এবং এক হোটেলে বসন্ত কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। এক ভবঘুরের দলের সঙ্গে পুলিসের হাতে পড়ে শ্রী গ. তাঁর জীবনধারা পরিবর্তনের একটা প্রতিশ্রুতি দেন—যদিও একথাও তিনি বলেন, 'তার জবাবদিহি আমি দিতে পারব না।"

১৮৯০ সালের পর থেকে খবর কাগজে প্রকাশিত এই ধরনের সব সংবাদ আমি সংগ্রহ করতে শুরু করি। প্রায় তিরিশটির মতো সংগৃহীত হয়। যে প্যাকেটের মধ্যে ওগুলো ছিল—১৯০৫ সালে সেটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় এবং পরে পেট্রোগ্রাদ থানায় তা হারিয়ে যায়।

আমার জীবনে এমন ধারা বহু লোকের সঙ্গেই দেখা হয়েছে। যে ভবঘুরেটি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে আমার স্মৃতিতে গাঁথা আছে—তার নাম বাসকা। বেসালান-পেট্রভস্ক রেললাইন তৈরীর সময় এই লোকটির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। একটা সংকীর্ণ পাহাড়ী খাদে, বহু শ্রমিকের গোলমালের মধ্যে তাকে আমি দেখেছিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে সে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। সূর্যের আলোয় আলোকিত খাদের একান্তে, ডিনামাইটে ওড়ানো পাথর কুচির স্তূপের মধ্যে বসেছিল সে। তার পায়ের তলায়—নীচে, বিচিত্র বর্ণ ও কলরবমুখর অনেক লোক—কেউ পাথর কেটে ফুটো করছিল, কেউ ভেঙে উড়িয়ে দিচ্ছিল, কেউ ভারী ভারী পাথরগুলোকে এদিক ওদিক বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ওকেই এ-সবের মাতব্বর ভেবে আমি তার পাশে গিয়ে হাজির হলাম এবং কোনো কাজ আছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম। মিহি তীক্ষ্ণ গলায় সে উত্তর দিল: "আমি মুখ্যু নই—আমি কাজ করি না।"

এ ধরনের কথা আমি এই প্রথম শুনলাম না এবং তাই আমি ওতে বিস্মিতও হলাম না।

"তাহলে তুমি এখানে কি করছ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"এই যেমন যেমন দেখছ, বসে আছি এবং তামাক খাচ্ছি", সে দাঁত বার করে হাসল।

তার গায়ে মস্ত এক কোট এবং মাথায় টুপি—যার কিনার ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে—সবটা মিলে যেন একটা বাদুড়। তার খুদে খুদে কান দুটো মনে হচ্ছে ইন্দ্রিয়াতীত কোনো শব্দ শোনবার জন্যে যেন খাড়া হয়ে আছে। তার মুখটা বেশ বড়—ব্যাঙের মুখের মত। যখন সে হাসে তখন তার নীচের ঠোঁটটা মোটা হয়ে ঝুলে পড়ে এবং নীচের পাটির ছোট ছোট দাঁতগুলোর সুদৃঢ় সারি বেরিয়ে পড়ে। তার জন্যে তার হাসিটাকে মনে হয় অদ্ভুত রকমের নিষ্ঠুর। চোখ দুটো

তার অপূর্ব ; চোখের তারা নিশাচর পাখির মত কালো আর গোল—জ্বলজ্বল করছে সংকীর্ণ কোটরে, সাদা অংশটা সোনালী। মুখমণ্ডল দাড়িগোঁফ-হীন, লম্বা সরু নাকের ফুটো দুটো বিশ্রীভাবে চাপা। গাইয়েদের আঙুলের মতো সরু সরু আঙুলে সিগারেট ধরা। অত্যন্ত ত্বরিৎ ভঙ্গীতে সিগারেটটা সে ঠোঁটে চেপে ধরে গলগল করে ধোঁয়া ছেড়ে বিশ্রী ভাবে কাশতে লাগল।

"তামাক খাওয়া তোমার পক্ষে ভাল নয়", আমি বললাম।

ত্বরিৎ সে জবাব দিলে, "তোমারও কথা কওয়া ভাল নয়। যে কেউ একজন দেখেই বুঝবে—তুমি একটা বোকা।"...

"ধন্যবাদ!"

"খুশি হলুম।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ। এর মধ্যে চোরা দৃষ্টিতে আমাকে সে দেখে নিলে। তারপর নরম গলায় বললে, "চলে যাও হে—তোমার জন্যে এখানে কোনো কাজ নেই।"

পাহাড়ের খাদটার ওপারে, আকাশে তখন হাওয়ার কাজ চলছিল—যতো মেঘের খণ্ডগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে তুলছিল ভেড়ার পালের মত। আলোয় উদ্ভাসিত খাদের মুখে শরতের লালচে রঙের আগাছা ঝোপগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল এবং মরা পাতাগুলো ঝরে পড়ছিল। দূর থেকে ভেসে আসছিল পাহাড় বিদীর্ণ করার শব্দ এবং তার প্রতিধ্বনি বজ্রনির্ঘোষে ছড়িয়ে পড়ছিল পাহাড় থেকে পাহাড়ে। তার সঙ্গে এসে মিশছিল ঘোড়ায় টানা গাড়ির গড় গড় শব্দ এবং দমাদম হাতুড়ি পেটার আওয়াজ—ওদিকে ইস্পাতের ছুঁচ ঠুকছে পাথরে, কেটে গর্ত করছে।

"মনে হয় তুমি খাবার চাও?" খুদে কুঁজোটি আমায় জিজ্ঞেস করলে। "এই মিনিট খানেকের মধ্যেই ওরা দুপুরের খাওয়ার ঘন্টা বাজাবে। কত লোক যে তোমার মত পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছে!..." বক্ বক্ করে সে থুতু ফেলবার জন্যে পেছনে মুখ ফেরালে।

তীক্ষ্ণ সুরে একটা হুইশিল বেজে উঠল। যেন একটা ধাতুর তার খাদের বাতাসে ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠল, চাপা পড়ে গেল অন্য সব শব্দ।

"সরে পড়ো।" কুঁজো বললে। তারপর হাত-পা সমানে চালিয়ে পাথরগুলোর উপর দিয়ে, কখনো বা বাঁদরের মতো গাছপালা ধরে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একটা বিশ্রী, বিকৃত বস্তুপিণ্ডের মতো দ্রুত নিঃশব্দে নেমে চলে গেল।

লোকগুলো খেতে বসেছে খোলা জায়গায়। এক-একটা কেটলি ঘিরে কেউ বসেছে পাথরের ওপরে, কেউ বসেছে মাল-বওয়া একচাকার গাড়ির ওপরে —খাচ্ছে ভেড়ার মাংসের সঙ্গে জোয়ার মেশানো গরম গরম নোনতা ডালনা। আমাদের কেটলির চারপাশে আমি ছাড়া ছিল আরও জনা ছয়েক। কুঁজো লোকটির হাব-ভাব মাতব্বরেরই মত। খানিকটা ডালনা খাওয়ার পর তার নাক উঠল কুঁচকে। মেয়েদের খড়ের টুপি-পরা এক বুড়োর দিকে চামচ তুলে সে শাসালে এবং সক্রোধে হুংকার দিলে, "আবার সেই বেশী নুন—ওরে গাধা !"...

অন্য পাঁচজনও রাগে গর গর করে উঠল এবং দীর্ঘদেহী কৃষ্ণকায় একটি কিসান বলে উঠল, "ওর ধোলাই খাওয়া উচিত !"

"তুমি ডালনা রাঁধতে জান ?" আমার দিকে ফিরে কুঁজো জিজ্ঞেস করলে। "সত্যি ? মিথ্যে কথা বলছ না তো হে ? তাহলে ওকে দিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।" তার প্রস্তাবে সবাই সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল।

খাওয়ার পর কুঁজো লোকটি তাঁবুর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। এদিকে পুরানো রাঁধুনি—লালচে মুখ, নিরীহ মানুষটি, আমাকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে লাগল —কোথায় আছে শুয়োরের মাংস, কোথায় আছে শস্য আর রুটি, কোথায় আছে নুন। ফিস্‌ফিস্‌ করে সে আমাকে হুঁশিয়ার করে দিলে : "ওঁর সম্পর্কে ভুল করো না। লোকটা অবশ্য কুঁজো কিন্তু রীতিমত ভদ্রলোক এবং জমিজায়গার মালিক। এক কালে উনি একজন মস্ত লোক ছিলেন। ঘাড়ের ওপরে মাথাটা ওঁর ঠিকই আছে— এ তোমাকে নিশ্চিন্তে বলছি। উনি আমাদের ঠিক প্রভুর মত। হিসেবনিকেশ ইত্যাদি সব উনি রাখেন। কড়া ? তা একটু বটেন। যাকে বলে দুর্লভ পাখি—উনি তাই।"

ঘণ্টাখানেক বাদে খাদে আবার উঠল কাজের হল্লা ও গর্জন এবং মানুষগুলো ছুটে গেল সেই দিকে। আমি ছোট্ট নদীটায় গিয়ে কেটলি ও চামচেগুলো ধুয়ে আনলাম, কাঠের অগ্নিকুণ্ড তৈরী করে তার ওপর জলভরা কেটলি ঝুলিয়ে দিলাম। তারপর আলুর খোসা ছাড়াতে বসলাম।

"আগে তুমি রাঁধুনি ছিলে নাকি হে ?" কুঁজোর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে নিঃশব্দে এসেছে কখন এবং আমার পেছনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছে— কিভাবে আমি আলুর খোসা ছাড়াবার জন্য ছুরি চালাচ্ছি। যেভাবে সে এসে দাঁড়াল তাতে আমার বাদুড়ের উপমাটা যে যুৎসই—সেটা ভালভাবেই আবার প্রমাণিত হয়ে গেল।

"পুলিসে কাজ-টাজ করতে নাকি হে?" সে শুধোলে এবং নিজেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে বললে: "উঁহুঁ, তার জন্যে বয়সটা তোমার খুবই কম।"

রক্তচোষা বাদুড়ের ডানা ঝাপটানির মতো তার কোটের হাতা দুটো ঝাপ্‌টে, একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরে লাফ দিয়ে সে চটপট পাহাড়ে উঠে গেল। একেবারে শিখরে উঠে সে বসে পড়ল এবং ঘন ঘন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

আমার রান্না সকলের পছন্দ হলো, শ্রমিকেরা আমার প্রশংসা করলে, তারপর তারা খাদের এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ওদের জনা তিনেক তাস খেলতে বসল এবং পাঁচ ছ' জন পাহাড়ী ঝর্ণার ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে চলে গেল। পাথর আর ঝোপগুলোর আড়ালে কোথায় যেন কারা মিলিত কণ্ঠে একটা কসাক গান গেয়ে উঠল। আমাকে এবং কুঁজোকে নিয়ে দলে ছিল মোটমাট তেইশ জন। কুঁজোকে সবাই অতি পরিচিতের মতই সম্ভাষণ করে বটে, কিন্তু তার মধ্যে আমার মনে হলো—একটা শ্রদ্ধা এবং ভয় মেশানো আছে।

কুঁজো লোকটি আগুনের কাকাকাছি একটা পাথরের ওপর নিঃশব্দে এসে বসল এবং একটা লম্বা লাঠি দিয়ে কয়লাগুলো ঠেলে দিলে আগুনে। আস্তে আস্তে জনা দশেক লোক তাকে ঘিরে ঘনিয়ে এল। কালো চুল মাথায় একটি কিসান কুকুরের মত তার পায়ের কাছে ঘনিয়ে এসে নিজেকে ছড়িয়ে দিলে। আর একটি রোগা মতো পাণ্ডুর যুবক অনুনয়ের সুরে মৃদু ক্ষীণকণ্ঠে কি যেন বলে উঠল।

"চু—প্—একদম চুপ করো।" কুঁজো বলে উঠল। "তোমাদের ওই বকবকানি বন্ধ করো।"

কারুর দিকে না তাকিয়ে কুঁজো মানুষটি তারপর কথা বলতে শুরু করলে। জোরে এবং দৃঢ় প্রত্যয়ে তার গলা ছড়িয়ে পড়ল: "আমি বলছি—দৈব, আধা দৈব এবং অদৃষ্ট—এসব আছে।"...

সবিস্ময়ে আমি তার দিকে মুখ তুলে তাকালাম। এটা লক্ষ্য করে সে কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করলে, "কি?"

যেন কিছু একটা প্রত্যাশা করে সবাই আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তাদের দৃষ্টিতে প্রতিকূলতা। খানিক নিঃশব্দতার পর, গায়ে কোটটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে কুঁজো আবার কথা বলতে শুরু করলে।

"অদৃষ্ট"—সে বলল, "তারা হলো আপদ দূর করা দেবদূতের মতো। তবে কিনা মানুষের বেলায় তাদের নিয়োগ করে শয়তান।"

"আর আত্মা?" কে একজন মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে।

"আত্মা হলো পাখি—যাকে শয়তান ধরবার চেষ্টা করে। এই হলো ব্যাপারটা?"

যত আজেবাজে কথা সে বলে চলল—অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের সব কথা। এটা বেশ বোঝা গেল—সে পোটেবনিয়ার লেখা "অদৃষ্ট এবং অদৃষ্টে বাঁধা মানুষগুলি" প্রবন্ধটা পড়েছে কিন্তু সে লেখার গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানের দিকটা পরীর গল্প আর বিদঘুটে কল্পনার সঙ্গে মিশে তার মনে তালগোল পাকিয়ে গেছে। অল্প পরেই সে তার বলার সহজ ধরনটি ছেড়ে রীতিমত মার্জিত সাহিত্যের ভাষায় বলতে শুরু করল।

"জীবনের সেই প্রথম দিনটি থেকে," সে বললে, "সমগ্র মানবজাতি রহস্যময় কতকগুলো শক্তির দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আছে—যাদের সে বোঝে না, যাকে সে জয় করতে পারে নি। প্রাচীন গ্রীক জাতি ..."

তার তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠস্বর, শব্দের অপূর্ব সমন্বয় এবং হয়ত তার ওই ঐন্দ্র-জালিক বাইরের চেহারাটা—সবগুলো মিলে তার শ্রোতাদের ওপরে একটা অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করল। ভক্ত যেমন তার ঠাকুরকে পূজো করে তেমনি ভাবে মানুষগুলো তাদের প্রভুর মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে তার কথা শুনতে লাগল। কুঁজোর পাখির মত চোখ দুটো ভীষণ ভাবে জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠল, তার পুরু ঠোঁট দুটো যেন আরও ভারী, আরও মোটা হয়ে নড়তে লাগল। এবং আমার মনে হলো—ওর ওই ভয়ংকর কল্পনার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যেটাতে সে নিজে বিশ্বাস করে এবং ভয় পায়। কথা বলতে বলতে আগুনের লাল আভায় স্নান করে তার মুখটা যেন ক্রমশ কালো এবং বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

স্থির ধূসর রঙের মেঘগুলো আলো-আঁধারি বেলায় যেন খাদের ওপর ঝুলছিল; জ্বলন্ত কাঠের অগ্নিশিখাগুলি যেন আরও মোটা হয়ে এবং আরও লাল হয়ে উঠছিল; পাহাড়টা যেন আরও বিপুলায়তন এবং খাদটা সংকীর্ণতর মনে হচ্ছিল। আমার পেছনে বয়ে চলেছে নদীর ধারা এবং ছল্‌ছল্ শব্দ করছে জলরাশি। কি একটা যেন খস্‌খস্ শব্দ করে উঠল—বোধ করি সজারু হবে, শুকনো পাতার উপর দিয়ে ছুটে গেল।

যখন রীতিমত অন্ধকার হয়ে এল—শ্রমিকেরা সন্তর্পণে চারদিকে তাকিয়ে

একে একে তাঁবুর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কে যেন ফিস্ ফিস্ করে বললে, "এই হলো বিজ্ঞানের দান!" এবং আরও চাপা গলায় জবাব এল: "এই হলো শয়তানের দান।..."

পোড়া কাঠগুলো লাঠি দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে আগুনের পাশে কুঁজো বসে রইল। লাঠির আগায় যখন আগুন ধরে গেল তখন সে মশালের মত সেটাকে শূন্যে তুলে ধরলে এবং প্যাঁচার মতো চোখে অগ্নিশিখার হলুদবরণ পালকগুলোর দিকে চেয়ে দেখতে লাগল—পালকের মতোই শূন্যে সেগুলো খসে পড়ল। তারপর সে লাঠিটাকে ঘোরাতে লাগল—একটা লাল রেখা বৃত্তাকারে তাকে যেন ঘিরে ধরল। তার মাথার টুপিটাকে মনে হচ্ছিল একটা লোহার বাটখারা—তার চওড়া, বাঁকা কাঁধের ওপরে যেন ঠেসে বসানো।

দুটো দিন ধরে তাকে আমি লক্ষ্য করেছি—বুঝতে চাইছিলুম সে কি ধরণের লোক। সেও আমাকে সতর্কভাবে ও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল। সে আমার সঙ্গে যতটা সম্ভব কথাবার্তা এড়িয়ে চলত এবং প্রশ্নের উত্তর দিত কড়া কর্কশ মেজাজে। রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে, আগুনের কাছে বসে বসে বলতো যতো বিভীষিকাময় গল্প।

"মানুষের শরীরটা হাল্কা অগ্নিশিখার মতো শুধু ফুটোয় ভরা—অথবা ধরো স্পঞ্জ কি পাঁউরুটির মত—ফুটোয় ভর্তি। আর এই সব ফুটোয় রক্ত বয়ে চলেছে। রক্তটা একটা তরল জিনিস—যাতে ভেসে আছে কোটি কোটি ধুলোর কণা, যা চোখে দেখা যায় না। কিন্তু ওই ধুলোর কণাগুলো জীবন্ত—মশার শূককীটের মতো, অবিশ্যি আকারে অনেক ছোট।" তারপর সহসা প্রায় উৎকট একটা শব্দ করে সে বলে উঠল, "ওই ধুলোর কণাগুলোর মধ্যে বাস করে শয়তান।"

দেখতাম তার এ সব গল্পে লোকগুলো ভয় পায়। আমি তার সঙ্গে তর্ক করতে চাইতাম। কিন্তু আমি যখন কোন প্রশ্ন করতাম সে তার কোনো উত্তরই দিত না এবং তার শ্রোতারা তাদের কনুই আর পা দিয়ে আমাকে গুঁতিয়ে গরগর করে উঠত: "চুপ কর!" ..

যখন কোনো শ্রমিক পাথরের টুকরোয় মুখ বা পা জখম করত—কুঁজো মানুষটা অদ্ভুতভাবে ফিস্ ফিস্ শব্দ করে তার ক্ষত ধুয়ে মুছে দিত। দাঁতের ব্যথায় যখন একটি ছোকরার মুখ একেবারে ফুলে উঠল তখন কুঁজো পাহাড়ের ওপরে উঠে কি সব ঘাস জড়ি সংগ্রহ করে এনে চায়ের কেটলিতে কষে সেদ্ধ

করলে এবং কটা রঙের একটা প্রলেপ তৈরি করে দিলে। যুবকটির ওপরে তিনবার ক্রস এঁকে, আলাটির পাথরের বেদী এবং তার ওপর উপবিষ্ট আরেলুয়া সম্পর্কে বিড় বিড় করে অদ্ভুত কি সব বলতে লাগল।

"এখন তোমার সব ভাল হয়ে গেছে," যুবকটিকে সে বললে।

আমি কখনো তাকে হাসতে দেখিনি—যদিও সে তার চারপাশের লোকগুলোর কাছ থেকে কম আমোদ পায় না। তার মুখে সব সময়ের জন্য লেগে আছে একটা সন্দেহের ছায়া এবং কান হয়ে আছে খাড়া। সকালে সে উঠে যায় খাদের সূর্যালোকিত দিকটায়, কোকিলের মত বসে থাকে পাথরগুলোর মধ্যে। সিগারেট খায় আর বসে বসে দেখে কর্মরত মুখর লোকগুলোকে। কখনো কেউ হয়ত তাকে ডাক দিলে, "বাসকা!" সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে, স্খলিত শিথিল শিলাখণ্ডের মধ্যে দিয়ে দ্রুত পথ করে যেভাবে ছুটে যায় সে—দেখে দেখে আমি অবাক হতাম। ঝগড়া বিবাদ পাকিয়ে উঠলে সে মিটিয়ে দেয় এবং বেতনদাতা কর্মচারীর সঙ্গে তর্কও করে—তখন তার সেই ক্ষীণ মিহি গলা কাজকর্মের সমস্ত আওয়াজকে ছাড়িয়ে ওঠে। মোটাসোটা, সৈনিক সুলভ কাঠকুঁদো মুখ কোয়ার্টার মাস্টারও তার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গেই শোনে।

"লোকটি কে হে?" একদিন আমি জিজ্ঞেস করলুম তাকে। সে তখন কাঠের আগুন থেকে পাইপ ধরাচ্ছিল। জবাব দেওয়ার আগে সতর্কভাবে সে চারদিকটা দেখে নিলে। তারপর বললে, "শয়তানই জানে। হয়তো কোনো যাদুকর বা ওই রকম কিছু হবে। ও হলো একরকম—যারা নেকড়ে ছিল।..."

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমি কুঁজো লোকটির সঙ্গে কথা চালাতে পেরেছিলাম। একদিন আরও একটু সুযোগ পেয়ে গেলাম। অন্য সবাই তখন চলে গেছে। শয়তান আর জীবাণু, ব্যাধি আর অপরাধ সম্পর্কে তার নিত্যকার বক্তৃতার পর সে তখন আগুনের পাশে বসেছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ওই লোকগুলোকে তুমি এসব বলো কেন?"

সে আমার দিকে কটমট করে তাকাল। এমনভাবে সে নাক কোঁচকালে যাতে নাকটা তার আরও ছুঁচলো হয়ে উঠল এবং তার পোড়া লাঠিটা দিয়ে আমার পায়ে খোঁচা দিতে চেষ্টা করলে। আমি পা সরিয়ে নিয়ে তাকে ঘুষি দেখালুম।

"কাল তোমাকে ওরা ভাল রকম ধোলাই দেবে", সে নিশ্চিত কণ্ঠে বললে।

"কিসের জন্য ?"

"দেখো, ওরা তোমাকে ধোলাই দেবেই।"

তার অদ্ভুত চোখ দুটো রাগে জ্বলজ্বল করতে লাগল। তার পুরু ঠোঁটটা নীচের দিকে ঝুলে পড়ল—দেখা গেল দাঁতের সারি। সে গরগর করে উঠলো, "যা-তোর সর্বনাশ হোক !"...

"কিন্তু সত্যি বলো", আমি বললাম, "এইসব আজেবাজে কথায় তুমি বিশ্বাস করো না। বলো—করো ?"

সে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। পোড়া কাঠগুলোর খোঁচা দিয়ে দিয়ে লাঠির আগায় আগুন ধরিয়ে তার চারদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে আগের মত একটা অগ্নিরেখার বৃত্ত রচনা করলে।

"মানে তুমি শয়তানের কথা বলছ ?" অপ্রত্যাশিত ভাবে সে বললে। "শয়তানে আমি কেন বিশ্বাস করব না ?" তার গলার স্বরে যেন স্নেহ মাখানো, কিন্তু ওটা কৃত্রিম বলে মনে হলো। আমার দিকে সে ক্রূর দৃষ্টিতে তাকালে।

মনে মনে আমি ভাবতে লাগলাম—আমাকে ধোলাই দেওয়ার জন্যে নির্ঘাৎ লোকগুলোকে ও হুকুম দেবে।

সে অবশ্য কথা বলতে লাগল সেই স্নেহমাখা কণ্ঠে। জিজ্ঞেস করলে—আমি কে, কোথায় আমি লেখাপড়া করেছি, কোথায় বা চলেছি। তার নিজের অজ্ঞাতেই যেন তার ব্যবহার বদলে গেল। তার কথাবার্তার মধ্যে একটা প্রাধান্য, একটা জমজমাট সুলতানী ভাব, অধমের প্রতি যেন একটা অদ্ভুত গর্বোদ্ধত ঔদাসীন্য লক্ষ্য করলাম।

শয়তানে সে বিশ্বাস করে কিনা—একথা যখন তাকে আবার জিজ্ঞেস করলাম—সে হাসল।

"আচ্ছা", সে জবাব দিলে, "তুমি কি কোনো কিছুতে বিশ্বাস করো না ? ধরো ঈশ্বর ? বা অলৌকিক কিছু ?" তারপর চোখ মটকে সে বললে, "বোধ করি তুমি, এমন কি প্রগতিও বিশ্বাস করো ?"

আগুনের একটা ঝলক লেগেছে ওর হলদে গালের ওপর—সেই ঝলকে ওর ঠোঁটের ওপর মিহি করে ছাঁটা গোঁফের রেখা দেখা যাচ্ছে রূপালী ছুঁচের মতো।

"তুমি একজন কল্পনাবাদী", সে বলে চললো। 'শাশ্বত, প্রজ্ঞা ও দয়ার'*

* নেক্রাসভের কবিতার একটি লাইন

বীজ তুমি বুনে দিচ্ছ মানুষের মধ্যে—তাই না ?" তারপর মাথা ঝাঁকি দিয়ে বলে উঠল, "তুমি নির্বোধ। যখনি তোমাকে দেখেছি তখনি চিনেছি। আমি জানি তোমার কায়দা।"...

এই কথাগুলো যখন সে বলছিল তখন সন্দিগ্ধ চোখে চারদিকে চেয়ে দেখছিল এবং একটা অদ্ভুত অস্বস্তি যেন তাকে পেয়ে বসেছিল।

জ্বলন্ত কাঠের স্বর্ণাভ আলোকচ্ছটায় আগুনের লাল জিভগুলো লকলক্ করে নেচে নেচে উঠছিল এবং ফুটে উঠছিল নীল নীল ফুল। একটা উজ্জ্বল খিলান যেন ঝুলছিল আগুনের ওপরে অন্ধকারে। আমরা বসেছিলাম সেই উজ্জ্বল ছাদের তলায় আর চারিদিকের অন্ধকার যেন আমাদের ঘিরে ধরেছিল, চেপে ধরেছিল। শারদ রাত্রির গুরুভার নিঃশব্দতা গোটা পরিবেশটাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল এবং সেই অন্ধকারে ভাঙা পাথরের টুকরোগুলো হয়তো তুষারমণ্ডিত হয়ে জমে কঠিন হয়ে গেছে।

"আগুনে আরও কিছু কাঠ ফেলে দাও হে।"

জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর কিছু ডালপালা ছুঁড়ে দিলাম। ঘন ধোঁয়ায় ওপরের দিকটা ভরে উঠল এবং আমাদের আশপাশের চারিদিকটা যেন আরও অন্ধকার, আরও সংকুচিত বলে মনে হল। ডালপালার মধ্যে হলদে সাপগুলো কড়কড় শব্দে, কুণ্ডলী পাকিয়ে, জড়িয়ে জড়িয়ে হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠে রাতের অন্ধকার প্রান্তসীমাকে যেন দূরে ঠেলে সরিয়ে দিলে। ঠিক সেই মুহূর্তে কুঁজো মানুষটির গলার সাড়া শোনা গেল। তার প্রথম দিকের কথাগুলো প্রায় অস্পষ্ট এবং আমার কাছে পৌঁছবার আগেই শূন্যে হারিয়ে গেল ; কারণ খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিল সে—যেন ঘুমিয়ে পড়ছিল : "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ ঠাট্টামস্করা নয়।... তারা মানুষের মত, তেলাপোকার মত, জীবাণুর মতো সত্য। শয়তানেরা ভিন্ন ভিন্ন আকার ও আয়তনের হতে পারে।"...

"তুমি সত্যি সত্যি বলছ ?"

সে কোনো উত্তর দিলে না—শুধু মাথা নাড়ল, যেন অদৃশ্য, শব্দহীন কিন্তু জমাট কোনো কিছুর ওপরে কপাল ঠুকল। আগুনের দিকে চেয়ে নীচু গলায় সে বলতে লাগল :

"যেমন ধরো, আছে ধোঁয়াটে রঙের শয়তান ; ওদের কোনো আকার নেই, মেরুদণ্ডহীন পেশল জীবের মত ; শামুকের মত ওরা ধীরে চলে আর দেখতে স্বচ্ছ। যখন ওদের অনেকগুলো একসঙ্গে জড়ো হয় তখন ওদের আঠালো

দেহগুলো হয় মেঘের মতো। সংখ্যা ওদের কোটি কোটি। ওদের কাজ হলো অশান্তি ছড়িয়ে দেওয়া। ওরা এমন একটা টক গন্ধ ছড়ায় যাতে আত্মা হয়ে পড়ে নিরানন্দময় আর ক্লান্ত। মানুষের সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর শত্রু ওরা।"

ও কি ঠাট্টা করছে? মনে মনে ভাবলুম। যদি তাই হয়—তবে বিস্ময়কর ওর ঠাট্টার রীতি, চাতুর্যে সেরা শিল্পী। ওর চোখ জ্বলছে ঐন্দ্রজালিকের মত এবং তোবড়ানো মুখটা যেন আরও ছুঁচলো হয়ে উঠেছে। লাঠির আগা দিয়ে সে জ্বলন্ত কাঠগুলো নেড়ে-চেড়ে সাজিয়ে নিলে এবং জ্বলন্ত কাঠকয়লা-গুলোর ওপর আস্তে আস্তে আঘাত দিয়ে ফুলঝুরির মতো অগ্নিকণাগুলো ছড়াতে লাগল।

"ওলন্দাজ শয়তানেরা হলো খুদে খুদে—গিরিমাটির রঙ। বলের মত গোল এবং উজ্জ্বল। তাদের মাথাগুলো গোলমরিচের দানার মতো কুঁচকে গেছে, তাদের থাবাগুলো লম্বা লম্বা এবং সুতোর মত সরু, তাদের আঙুলগুলো পাতলা চামড়ায় জোড়া এবং প্রত্যেকটি আঙুলের শেষে বঁড়শির মত কাঁটা—রক্তের মতো গাঢ় লাল। ওরা মানুষকে বিস্ময়কর কামনায় উত্তেজিত করে তোলে; ওদের প্রভাবে যে কোন লোক এক জন রাজনীতিবিদকেও বলতে পারে—'মুখ্যু কোথাকার!' সে তার নিজের মেয়েকেও ভ্রষ্টা করতে পারে, গীর্জায় সিগারেট ধরাতে পারে। হ্যাঁ, হ্যাঁ! ওরা হলো ভিত্তিহীন পাগলামীর শয়তান। ...

"চেক শয়তান হলো আঁকাবাঁকা রেখার একটা বিশৃঙ্খলা, আক্ষেপে এবং অবাধে বাতাসে তারা ভেসে বেড়ায়, অদ্ভুত সব আকার সৃষ্টি করে—আবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো নষ্ট করে ফেলে। মানুষের দৃষ্টিতে তারা ক্লান্তিকর—এক ধরনের মরীচিকার মতো। তাদের লক্ষ্য হলো মানুষ যখন যেখানে যেতে চায়—বা যেখানে যাওয়া তার উচিত—তাতে বাধা সৃষ্টি করা। ...

"কাপড় মার্কা শয়তানেরা তাদের চেহারায় মনে করিয়ে দেয় লোহার পেরেকের কথা—শেষ দিকটা যার ছুঁচলো ও চেরা। মাথায় তাদের কালো টুপি, মুখগুলো সবুজ এবং তাদের শরীর থেকে ছিটকে পড়ছে মেঘের মতো দলা বাঁধা ফসফরাসের আলো। তারা চলে বেড়ায় লাফ দিয়ে দিয়ে—দাবা খেলার রাজাদের মত। মানুষের মগজের মধ্যে তারা জ্বেলে দেয় মত্ততার নীল আগুন। মাতালদের বন্ধু তারা।"...

এক ভাবে গলা নামিয়ে কথা বলে যাচ্ছিল কুঁজো—যেন পাঠ্যবস্তু

আউড়ে যাচ্ছে। পরম আগ্রহে তার কথা শুনতে শুনতে সবিস্ময়ে আমি ভাবছিলাম—এ কী বাক্যবাগীশের আবোল তাবোল—না, পাগলের প্রলাপ ?

"অত্যন্ত সাংঘাতিক শয়তান হলো—ঘণ্টাধ্বনির ঐকতান। তাদের সব ডানা আছে—শয়তান বাহিনীর মধ্যে তারাই হল একমাত্র ডানাওয়ালা জীব। তারা মানুষকে লাম্পট্যে টেনে আনে। চড়াইয়ের মতো তারা সদাচঞ্চল। মানুষকে বিদ্ধ করে, কামনার আগুনে তাকে পুড়িয়ে ঝলসে দেয়। সম্ভবতঃ গীর্জার চূড়োয় তাদের আস্তানা—কারণ গীর্জার ঘণ্টায় যখন ঐকতানের সুর বেজে ওঠে তখনই সে মানুষকে ভীষণ ভাবে নির্যাতন করে।

"কিন্তু সবচেয়ে সাংঘাতিক হলো চাঁদনী রাতের শয়তানেরা। তারা সাবানের ফেনার মতো—যার ওপর শুধু মাত্র একটা মুখের ছায়াই অবিচ্ছিন্ন ভাবে একবার দেখা দেয়, আবার মিলিয়ে যায়। এ হলো নীল, স্বচ্ছ, এবং বিষণ্ণ। চোখগুলো এর গোল গোল, চোখের তারা নেই এবং ভুরুর জায়গায় একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন। ওদের গাত ওপর নীচে সরল রেখায়—অন্তহীন নিঃসঙ্গতার চিন্তায় মানুষকে এরা বিদ্ধ করে। অবিরাম এরা কানের কাছে ফিস ফিস করে। মানুষ তখন নিজেকে বলে—এই পৃথিবীতে অন্য অনেক মানুষের মধ্যে আমি নিঃসঙ্গতার একটা অর্ধস্ফুট পূর্বাবস্থায় বেঁচে আছি মাত্র। আমার সত্যিকার নিঃসঙ্গতা আসবে মৃত্যুর পরে—যখন আত্মা আমার উড়ে যাবে অন্তহীন শূন্যে। সেখানে একটা জায়গায় নিশ্চলভাবে শেকলে বাঁধা পড়ব। শুধু শূন্যতা ছাড়া সামনে আর কিছুই দেখতে পাব না, আমার পার্থিব জীবনের আত অকিঞ্চিৎকর কথাগুলো স্মরণ করে অনন্তকালের জন্য শুধু নিজের দিকে তাকাতে বাধ্য হব। শুধু একটি মাত্র স্মৃতি যুগের পর যুগ : অতীতের সকরুণ নিবু'দ্ধিতার স্মৃতির মধ্যে বেঁচে থাকা। আর শুধু নীরব … এবং নিঃসীম শূন্যতা।"…

কাঠের আগুনের মধ্যে সে তার লাঠিটা স্থিরভাবে ধরে রইল এবং লেলিহ অগ্নিশিখা আস্তে আস্তে তার হাতের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আগুনের হলকা হাতে এসে লাগতে সে চমকে উঠল। লাঠিটা মাটিতে ঠুকে আগুনের ফুলকিগুলো ঝেড়ে ফেললে এবং লাঠির আগুন-লাগা প্রান্তটা পাথরে ঘষতে লাগল। সবটা ভীষণ ধুঁইয়ে উঠল। তারপর আবার সে পোড়া লাঠিটা দিয়ে জ্বলন্ত অঙ্গারগুলোকে ভেঙে গুঁড়ো করতে লাগল, বাতাসে ছিটকে পড়ল আগুনের ফুলকি। তারপর চুপচাপ নিঃসাড় হয়ে বসে রইল সে।

এক মিনিট কেটে গেল, তারপর দু মিনিট তিন মিনিট। সবটা কেমন ভুতুড়ে ভুতুড়ে লাগছিল।

"সত্যি তুমি বিশ্বাস কর···," শেষ পর্যন্ত আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

আমার কথা শেষ হলো না, সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, "দূর হও!" এবং পোড়া লাঠিটা তুলে সে আমাকে শাসালে। "ওরা কালই তোমাকে ভাল রকম ধোলাই দেবে," সে বললে, "দেখে নিও।"

তার শাসানিটা বাস্তবিক ঘটুক এ আমি চাইনি, যদিও আমার মনে হলো—ওই রকম পরিণাম একটা ঘটতেও পারে। তাই, কুঁজো যখন তাঁবুতে শুতে চলে গেল তখন ও জায়গা ছেড়ে আমিও রওয়ান দিলাম ভ্লাদি-ককেসাসের দিকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ যাদুকরী

সেকেলে এক কুঁড়ের বাইরে মাটির বেদীর উপর মোকীফ বসেছিল—ছোটখাটো সিটকে মারা বুড়ো মানুষটি। গায়ের জামা খুলে ফেলে জুন মাসের উজ্জ্বল রোদে কালজীর্ণ শরীরটাকে সে একটু গরম করে নিচ্ছিল এবং গ্রন্থিল আঙুল চালিয়ে একটা টানা-জাল মেরামত করছিল। গলার দু পাশে চামড়ার তলা থেকে কণ্ঠাস্থি দুটো করুণভাবে ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে বুড়োর এবং পাঁজরটা যেন হাঁপাচ্ছে শ্রান্তিতে। দিনটা ছিল ভারি সুন্দর উজ্জ্বল; বীর-বিক্রমে সূর্য তার কর্তব্যে রত; নেবু গাছে ফুল ধরেছে—ভারি সুন্দর একটা গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে চারিদিকে। অস্পষ্ট একটা সুর যেন ভেসে বেড়াচ্ছে গরম হাওয়ায়, ও সেই মৌমাছির গুঞ্জন—ফসল কাটার সময়ে ওদের কাজের নিষ্ঠা এবং জেদ দু'ই যেন বেড়ে যায় অসম্ভব।

"এক অচেনা পথিক একবার এই দিক দিয়ে যেতে যেতে আমায় বলেছিল," মোকীফ কর্কশ গলায় বিড় বিড় করে নিজেকেই যেন শোনাচ্ছিল, "মানুষের জীবন একটা আশীর্বাদ,—শুধু মালিক মহাজনের জীবনই নয়—প্রত্যেকটি কিসানের জীবনও একটা আশীর্বাদ, সম্মানের বস্তু। কিন্তু আমাদের এখানে? যখন কোনো মানুষকে 'ভাগ্যের আশীর্বাদ' বলে মনে কবি তখন আমরা বোঝাতে চাই যে, লোকটা বেশ ডানপিটে, কুৎসিত এবং বদমাস। আমরা যেখানে যে যেমন আছি—সেই রকম সব ধারা।"

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে যেন সে তার বাগ্মিতা অভ্যেস করছিল। আর তার

কর্কশ গলার একঘেয়ে ভ্যান্‌ভ্যানানি যেন মৌমাছির গুঞ্জন, চড়াইয়ের কিচির-মিচির আর অদৃশ্য চাতক পাখির সঙ্গীতের সঙ্গে ঐকতানের মত মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। নদীর ধার থেকে উঠছে কাস্তের ফসলকাটা শন্ শন্ শব্দ, ঘাস কাটার খস খস শব্দ—কিন্তু এ শব্দে বহু দূরের সেই নীল আকাশের প্রশান্ত নীরবতা এতটুকু বিঘ্নিত নয়—সে এত নির্মল, এত স্নিগ্ধ। চারদিক জুড়ে একটা অনাড়ম্বর আর অপূর্ব পরিবেশ—রাশিয়াতে প্রায়ই যা দেখা যায়।

"রাজকুমার গোলিৎসিন? আরে তারা রাজকুমার হতে বাধ্য—তুমি তার করবেটা কী? এর জন্যে যত খুশি তুমি গাল পাড়তে পার—ওরা সেই রাজকুমারই থাকবে। তোমার জোর দেখাতে যেয়ো না রাজকুমারদের বিরুদ্ধে। আমি বলে দিচ্ছি। ওতে ফল কিছুই হবে না। কিন্তু এ সেই আইভানিখা—যে গ্রামের লোকগুলোকে ক্ষেপিয়ে দিলে। আরে এই যে… সুপ্রভাত আইভানিখা।"

বলতে বলতে একটি গাঁট্টাগোট্টা কড়াধাতের মেয়েলোক, পরণে কালো সারাফান (রুশ জাতীয় পোশাক), একটু অস্বাভাবিক বড় আকারের মাথা—নীল রুমাল বাঁধা মাথায়, নিঃশব্দে এসে আমাদের পাশে দাঁড়াল। এক হাতে তার একটা লাঠি, অন্য হাতে একটা শক্ত-জব্দ চুবড়ি—সুগন্ধি টাইম ও অন্যান্য শাকসব্জিতে ভরা। ভারী মাথাটা যেন কষ্টে একটু তুলে মহিলা নীরস ও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিলে, "সুপ্রভাত বুড়ো বচনবাগীস।"

তার ময়লা, কর্কশ, পুরুষালি মুখে গালের হাড় দুটো ঠেলে উঠেছে, এখানে ওখানে শাদা দাড়ির চুল। কুঞ্চিত রেখার জালে সারা মুখ ভরা। চিবুকটা তার মাংসল—ঝুলে পড়েছে কুকুরের মতো। গোরুর চোখের মতো ভোঁতা দুটো চোখ, চোখের সাদা অংশ জুড়ে সরু সরু লাল শিরাগুলো তার দৃষ্টিকে করে তুলেছে অপ্রসন্ন ও কঠিন। তার বাঁ হাতের আঙুলগুলো সব সময় নড়ছে এবং আঙুলে আঙুল ঘষার শুকনো খসখসে শব্দটুকুও যেন আমার কানে এসে লাগছিল। আমার দিকে তার লাঠি দেখিয়ে সে বললে, "ও আবার কে?"

মোকীফ দীর্ঘ ব্যাখ্যা শুরু করলে—জানালে যে আমি রাজকুমার গোলিৎসিন ও গ্রামবাসীদের মামলা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য উকীলের কাছ থেকে এসেছি এবং রবিবারে একটা সভা হবে।

মোকীফের কথা শেষ হতে-না-হতে বুড়ি মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলে এবং আমার হাঁটুতে লাঠি ঠেকিয়ে বললে, "আমার সঙ্গে দেখা ক'রো।"

"সে কোথায় ?"

"যে কেউ তোমাকে বলে দেবে। এই ঘন্টা খানেকের মধ্যে এসো।"

তার অপটু, গুরুভার দেহ। কিন্তু তার বয়সের অনুপাতে অস্বাভাবিক এক লঘুপদবিক্ষেপে সে দিব্যি হেঁটে চলে গেল।

গ্রামের বুড়ো মানুষেরা উদ্ভট সব কথা এবং তাদের নিজস্ব কথা যেমন গর্বের সঙ্গে বলে তেমনি ভাবেই মোকীফ আমাকে আইভানিখার কথা বলতে লাগল। বুড়ি নাকি সারা জেলায় যাদুকরী বলে পরিচিত।

"এতে আবার ভেবে বসো না যে ও ডাইনী। না-না। ও তার শক্তিটুকু পেয়েছে ঈশ্বরের কাছ থেকে। একটি মেয়েকে সারিয়ে তুলবার জন্যে ওকে ডেকে নিয়ে গেল পেন্‌জায়—মেয়েটা নাকি হাঁটতে পারে না। ও গিয়েই ব্যবস্থা দিলে—দেরি না করে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হোক। ব্যাপারটা কি হলো জান? মেয়েটা সিধে উঠে দাঁড়াল এবং একটুও না খুঁড়িয়ে, সোজা হেঁটে চলে গেল। তারপরে, আইভানিখা মেয়ের মা-বাপকে বললে—'তোমরা একদম বোকা। যদি ওদের কি করে সামলাতে হয়—না জানো, তবে ছেলেমেয়ে তোমাদের হয় কেন?' ওরা ছিল মস্ত ধনী ব্যবসা-দার—মানে ওই মেয়ের বাপ-মা।··· হ্যাঁ—সব, সব ও সারিয়ে তুলতে পারে—পশু, মানুষ, হাঁস, মুরগী—সব। একবার তার নিসনিত্তে ডাক পড়ল। ওখানে একটা বাচ্চা ছেলের ওপর নাকি ভর নেমেছে। প্রায় সপ্তাহ দুই সে একভাবে শুয়ে পড়ে আছে। প্রায় কবরে নিয়ে যাওয়ার অবস্থা। বুঝলে—আইভানিখা গিয়ে দিলে বাচ্চাটাকে একটা ছুঁচ ফুটিয়ে—ব্যাস, বাচ্চাটা প্রায় ছাদ পর্যন্ত লাফিয়ে উঠল। ওতেই ভালো হয়ে গেল তার ভর। এর জন্যে ও পেয়েছিল পঁচিশ রুবল এবং পশমের একটা পোশাক।···

"আমাদের গাঁয়ে ওর ভীষণ প্রভাব। আমাদের সব অনুষ্ঠানে ওকে সসম্মানে ডাকা হয় এবং ওর কথা মানা হয়। এমন কি, এখানকার পুলিসটা পর্যন্ত ওকে ভয় পায়। একবার তার তিনটে দাঁত ও তুলে দিয়ে-ছিল—প্রত্যেকটার গোড়ার দিকটা প্রায় এক ইঞ্চি করে লম্বা এবং শেষের দিকটা বঁড়শীর মত বাঁকা। কেউ সেগুলোকে তুলে দিতে পারে নি—কিন্তু ও ··· ওর অসাধ্য কিছু নেই। কোনো ভয় ভাবনা নেই ওর—এবং সব গুণ-বিদ্যে

ওর জানা। ও শুধু তোমার দিকে একবার তাকিয়েই বলে দিতে পারে—কি তুমি ভাবছিলে। তুমি কোনো আড়াল দিয়েই রুখতে পারবে না। কপাটের মতো তোমার আত্মাকে ওর সামনে তুমি অবারিত করে খুলে দেবেই—আর ও দেখে নেবে সেখানে কি আছে।”

গর্বভরে—এমন কি বেশ বড়াই করেই মোকীফ বলতে শুরু করেছিল কিন্তু একটু একটু করে তার বুড়ো কর্কশ গলার স্বর খাদে নেমে এল; তার ভাবভঙ্গী বদলে গেল এবং একটা ভয়ের আভাস যেন পাওয়া গেল তার গলার স্বরে। তার গ্রন্থিল আঙুলগুলো কাজ করতে করতে থেমে গেল জালের ওপরে এবং ছুঁচলো হাঁটুর ওপরে ক্লান্ত হয়ে যেন থেমে গেল।

আমি জানতে পারলাম—আইভানিখা হলো একজন অখৃষ্ট মরডোভিয়ের কন্যা, লোকটা ছিল ভালুক-শিকারী এবং যাদুকর—চল্লিশ সালে মরডোভিয়ার আন্দোলনের সময় নিহত হয়।

“তার বাপ ছিল মরডোভিয়ার দেবতা কুজ্‌কার বন্ধু স্বয়ং।” ···

বাপের মৃত্যুর পর আইভানিখা হয়ে গেল অনাথা। যৌবনে উত্তীর্ণ হলে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হলো এবং অল্প কিছুদিন পরেই এক বনরক্ষককে বিয়ে করলো। প্রায় বছর তিনেক সে কাটিয়েছিল লোকটির সঙ্গে—ছেলেপুলে হয় নি। চতুর্থ বছরের বসন্তকালে ভালুকের হাতে মারা গেল বনরক্ষক। তার মৃত্যুর পর বনরক্ষকের ছোট্ট ঘরটিতে তাকে থাকার অনুমতি দেওয়া হলো এবং সে-ও ভালুক শিকার সুরু করে দিলে। সেরগাচের জঙ্গল অনেক ভালুকের আশ্রয়স্থান হিসাবে বিখ্যাত এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর সোত্তর দশক পর্যন্ত সেরগাচের চাষীরা সারা রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ ভালুক-শিকারী এবং ভালুকের তালিমদার বলে গণ্য হতো। আইভানিখা মরডোভীয় প্রথাতে ভালুক শিকার করতো: ডান হাত ঢেকে বেঁধে নিত কাঠের পাটা এবং তার ওপরে একটা ফোট্ট জাড়িয়ে নিত কাঁধ পর্যন্ত। তারপর ডান হাতের মুঠোয় একটা ছুরি এবং বাঁ হাতে কশাইদের একটা ছোট কুড়ুল—দেখতে হ্যাকং ছুরির মতো। ভালুক যখন মুখব্যাদন করে ছুটে আসতো তার কাছে—ও তার থাবার বরাবর কুড়ুল দিয়ে বসাতো কোপ এবং হাঁ-করা মুখের মধ্যে ছুরি চালিয়ে তার গলা ফেলতো চিরে।

“এইভাবে শুধু মরডোভিয়ার মানুষরাই ভালুক শিকার করে। এর জন্যে তোমাকে যথেষ্ট শক্তিমান হতে হবে। সতের নম্বরের ভালুকটি অবশ্য ওর

পাঁজরার একটা হাড় ভেঙে দিয়েছিল, আর তিরিশ নম্বরেরটি ওর ঘাড়টা একটু মটকে দিয়েছিল—তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, কিভাবে ও মাথা নাড়ে—তার কারণ হলো ওই। ও যদিও চল্লিশ নম্বর পর্যন্ত আর যেতে পারে নি; চল্লিশ নম্বর হলো শিকারী-ভাগ্যের নিয়তি* এবং আইভানিখাও ভড়কে গেল। চল্লিশ নম্বর ভালুকের হাত থেকে বেঁচে ফিরতে পারে অল্প লোকেই। চল্লিশের কাছাকাছি গেলেই শিকারী বুঝতে পারে সে-আর কতদিন বেঁচে থাকবে। প্রায় বছর বিশেক আগে আমার বাড়িতে একজন হিন্দু এসে বাসা নিয়েছিল। সে ছিল বিখ্যাত শিকারী—এসেছিল শহর থেকে। দো-নলা বন্দুক, সাংঘাতিক ছুরি এবং ভালুক-মারা বল্লম—এই রকম সব অস্ত্র নিয়ে যে শিকারে বেরুত। তার চল্লিশ নম্বরের ভালুকটি অবশ্য এসব অস্ত্রকে পরোয়াই করে নি—ছিঁড়ে নিয়েছিল তার কান এবং দাড়ি সমেত গোটা চিবুকটা।

"হিন্দু কেন জিজ্ঞেস করছো? কারণ, আমার ধারণা—সে ওইভাবেই জন্মেছিল। কাউন্ট উপাধি ছিল তার কিন্তু জন্মেছিল সে ভারতবর্ষে। ওই রকম বহুলোক কাস্পিয়ান সাগরের পেছনে বসবাস করে; তাদের সকলের নীলচে চুল এবং মাতাল প্রত্যেকেই। তাদের পারস্যের মানুষ ভাবছ? না—তারা অন্য রকম। পারস্যের মানুষেরা একভাবে তো আমাদের বন্দী। ওরা আমাদের তো মান্য করবেই—তাতার, চুভাস এবং মরডোভীয়দের মতো। কিন্তু হিন্দুরা—ওরা স্বাধীন জাত, এবং স্বাধীন জারের প্রজা ওরা! অন্যদের থেকে ওদের পার্থক্যের চিহ্ন হলো—ওদের মুখের ভেতরে নাকি একটা করে সোনার দাঁত আছে। চমৎকার লোক ওরা এবং কথা বলে গম্ভীর গলায়। আমার ওই হিন্দুটি গোটা শীতকাল এবং বসন্তকালে বেশ কয়েকটি যুবতী মেয়েকে ঘায়েল করতে পেরেছিল—তা বাজি ধরে বলতে পারি ··· অন্ততঃ পাঁচটা। ওরা তাকে শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। দাড়ি ওদের রাখতেই হবে—না রাখলে অসম্মানের ব্যাপার। ও ব্যাপারে ওরা আমাদেরি মত কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ওরা ওদের জাতের নিয়ম মেনে চলে। তাইতো—তার নামটা যেন কি? ও—হ্যাঁ! ফেডোর কারলিচ! ভারি ভাল, ভারি আমুদে মানুষটি ছিল সে।"

মোকীফ দমক দিয়ে কথা বলছিল—যেন সে পাহাড় থেকে পাক দেওয়া রাস্তায় ঘোড়ায় চড়ে নামছে। হয়তো সে অনেক রাত অবধি গল্প চালিয়ে যেত। কিন্তু আমি তার সঙ্গে প্রায় ইতিমধ্যেই ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে দিয়েছি। এবং

* একটি রুশ শ্লেষ: Sorok—চল্লিশ; Srok—সীমা—অর্থাৎ চল্লিশই শেষ সীমা।

মনে পড়ল আইভানিখার আমন্ত্রণ। আমি তাকে আইভানিখার বাড়িটা দেখিয়ে দিতে বললাম।

"ওই তো ওখানে—দেখতে পাচ্ছ? ঢালের ওপর ছোট্ট পরিষ্কার কুঁড়ে একটা।...ওই জাতের লোকেরা সব সময়ে সাধারণের চলাচলের বাইরেই থাকে।..."

আমি যখন আইভানিখার ছোট্ট পরিচ্ছন্ন কুঁড়ের কাছে পৌঁছলাম তখন দেখি খোলা গেটের সামনে সদ্য-কাটা ঘাস-ভর্তি একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির চাকার আল আটকে গেছে গেটের দরজার বাজুর সঙ্গে এবং মাথায় শনের মতো চুলওয়ালা এক ছোকরা লাগাম টেনে ধরে খয়েরী রঙের ঘোড়াটাকে পিছু হটাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। আইভানিখা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাটির জলাধারে হাত ধুচ্ছিল এবং রাগে গাল পাড়ছিল।

"ঘোড়াটাকে খুলে দে। খুলে দে, আমি বলছি।"

ছোকরা কোনো কথাই বললে না। বরং মুখে হিস্ হিস্ শব্দ করে ঘোড়াটার মুখে মারতে লাগল। বৃদ্ধা মহিলা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল, দ্রুত ঘোড়াটাকে খুলে দিলে এবং চাকার ডাণ্ডাটা তুলে ধরল। তারপর একটু ঝুঁকে, লোহার মতো শক্ত পা দুটো ঠিকভাবে রেখে গাড়িটাকে গেটের বাইরে খানিকটা তফাতে ঠেলে বার করে দিলে। তারপর অতি দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে চাকার ডাণ্ডাটা নিজেই তুলে ধরে অতি সহজে গাড়িটাকে উঠোনের ভেতরে টেনে নিয়ে এল।

"গোঁয়ার খুদে বুদ্ধু একটা তুই।" সে চিৎকার করে বললে।

"ও তোমার গায়ে জোর খুব—তাই পারলে", ছোকরা ঘোড়াটাকে আস্তাবলে নিয়ে যেতে যেতে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জবাব দিলে।

"গায়ের জোর বই কি! কদিন বাদে সোত্তরে পড়ব। কোনো কম্মের নোস তুই—তোকে রেখে লাভ কি!"

আমাকে দেখে তার অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে আমাকে একবার খুঁটিয়ে দেখে নিলে, তারপর স্বাগত জানিয়ে বললে, "ঘরের ভেতরে এসো।"

ঘরের খোলা জানালা দিয়ে অস্তোন্মুখ সূর্য একাগ্র হয়ে তাকিয়ে আছে। নরম তুলতুলে কটা বেড়ালের বাচ্চা পরিষ্কার ঝকঝকে মেঝের ওপর খেলা করছে, শুকনো খড়ের গন্ধে গোটা ঘর ভরপুর। এককোণে একটা ঝকঝকে

কেটলি সোঁ সোঁ শব্দে ধোঁয়া ছাড়ছে। উনুনের পাশে তাকের ওপর বোতল, গ্লাস, জার এবং সার্ডিন মাছের টিন ঝকমক্ করছে। উনুনের ঢালু তাকের ওপর নানা রকম গাছ-গাছড়ার গোছা—সেন্টজনের কপি, প্রিমরোজ ফুল, সামুদ্রিক একজাতের কপি, জলায় জন্মায় এক ধরনের বিশ্রী ঘাস, পবিত্র এক ধরনের কাঁটা গাছের শেকড়, হেমলক বিষের গাছড়া এবং বাণ্ডিল করে বাঁধা কিছু ডালপালা।

সওদাগরদের কেতা মতো হাতে একটা প্লেট ধরে আইভানিখা আমাকে জিজ্ঞেস করলে :

"শহরে ওরা কি বলে? চাষীরা কি কিছু জমি পাবে? ওদের সাবধান হওয়া উচিত ছিল—চাষীরা ক্ষেপে উঠছে। গোলিৎসিনদের তুমি এ কথা ব'লো। তাদের জিজ্ঞেস ক'রো—কি তারা ভাবছে। এখানে ন' বছর ধরে জনসাধারণের বিরুদ্ধে তারা নির্লজ্জের মতো মামলা চালিয়ে যাচ্ছে—এবং কারুর পক্ষেই ভালো কিছু হচ্ছে না। চাষীদের ওরা বোকা বানাচ্ছে—এইটি তারা করছে মাত্র। ওদের মুক্তি দেবে—এই নাকি ওদের বাসনা—কিন্তু ওদের ওই মুক্তির মূল্য কতখানি? চাষীরা জমির জন্যে মুখিয়ে আছে—শুয়োপোকার দলার মতো। ওদের মুক্তির চেষ্টা চাষীদের জন্যে এই মাত্র করেছে।"

তার গাল ফোলা কালচে মুখে কেমন একটা কুটিল ভাব। তার রক্তচক্ষু হাতের পিরিচে যেন উঁকি মারলো, তার ঠোঁটের ওপরে ভেজা গোঁফ কুঁচকে উঠলো। লক্ষ্য করলাম, তার বাঁ কানের নিচে ঘাড়ের ওপরে একটা সকেশ আঁচিল। ঠোঁট চুষে চুষে নীরবে সে একটুকরো মিছরি চিবোতে লাগল। কেবল উন্নত বক্ষদেশটুকু ছাড়া, কেউ বুঝতে পারবে না—সে নারী।

মিষ্টি কথায় কৌশলে জানতে চেষ্টা করলুম কেমন করে সে ভালুকগুলোকে মেরেছিল। অনিচ্ছায় সে জবাব দিতে লাগল এবং মনে হলো—ইচ্ছে করেই তার কণ্ঠস্বরকে সে কর্কশ ও কঠিন করে তুলছে।

"হ্যাঁ—আমি খুব সবলই ছিলাম। সারা জেলায় মাত্র জনা দুই পুরুষ ছিল যারা আমাকে হারিয়ে দিতে পারত। অবশ্য আমার স্বামীকে বাদ দিয়ে। আমি তাঁর ওপরেও টেক্কা দিয়েছি ঠিক, কিন্তু তারপর—তিনি আমার স্বামী, তাই পারলুম না। খেলাচ্ছলে তাঁর সঙ্গে আমি একবার লড়াই করেছিলুম কিন্তু ঠিক আন্তরিকতা দিয়ে নয়। আমার সাহস হয় নি। এখানকার মানুষেরা শক্তিমান বুনো জাত।"

বলতে বলতে সে যেন গরম হয়ে উঠল—মুখে দেখা গেল ঘামের ফোঁটা। মাথা থেকে সে তার শালটা খুলে ফেললে এবং তার রুক্ষ কেশভারের মধ্যে দেখা গেল ঘন পাকা চুলের গুচ্ছ। একটা রুমাল দিয়ে সে তার কুঞ্চিত মুখমণ্ডল মুছতে লাগল—তারপর সেটা তার জখমি গলার ওপর জড়িয়ে নিলে। বড় বড় দুটো হাত—খোন্তা কোদালির মত এবং আঙুলগুলো অস্থির ভাবে নড়ছে—যেন কিছু গুছোচ্ছে অথবা সূতোর লেচি খুলছে। ওকে দেখতে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। মোটমাট আইভানিখাকে দেখে একটা অলৌকিক, অমানুষিক ভাব জেগে ওঠে।

তার চল্লিশ নম্বরের ভালুকটি সম্পর্কে আমি জিজ্ঞেস করলুম।

"ভালুক দেবতার বাহন। কেরেমেত (মরডোভীয় দেবতা) আকাশে এক পাল ভালুক তাড়া করে নিয়ে চলেছেন—সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলেছেন সূর্যকেও। সূর্য বেশ বড় সড়ই—বেশ বড় একটা পুকুরের মতো। ভারীও বেশ—একেবারে খাঁটী সোনায় তৈরী। মানুষকেও দরকার দেবতার। মৌমাছিরা মানুষের সেবা করে; মানুষ সেবা করে দেবতার। কেরেমেত মানুষকে বললে: 'ভালুকদের মারো---যার জন্যে আমি তোমাদের কষ্টও দেবো যখন তুমি অনেক-গুলোকে মারবে---সূর্য উঠবে, মনে রেখো! তারপর আমি তোমার বিরুদ্ধে বেশ শক্তিমান দেখে একটা ভালুক পাঠাব---এবং সে তোমাকে মেরে ফেলবে। মানুষ রাজি হলো দেবতার কথায়। মানুষ বড় বিব্রত ছিল তার গোরু ছাগল নিয়ে, তার মধু নিয়ে, তার ওট ফসল নিয়ে। ভালুক ও সবের বড্ড ক্ষতি করে।' "

ছুরির ডগা দিয়ে মাথার তালু চুলকে নিয়ে, হাতের তালুতে খানিকটা থুতু ফেলে তাই দিয়ে তার এলোমেলো চুলগুলো গোছগাছ মসৃণ করে নিলে। তাকালো আমার দিকে ভোঁতা, যাচাই করা দৃষ্টিতে। নাকটা ওর বেশ চওড়া এবং নাকের ফুটো দুটো উটের মতো, ভেতর দিকটা বাইরে ঠেলে বেরিয়ে আছে।

"তোমরা যারা যুবক এইটে তাদের জেনে রাখা উচিত। প্রত্যেকটি পুরুষের একটি নারী আছে—যে ওই চল্লিশ নম্বর ভালুকের মতো। তুমি তিনটিকে ভালবাসতে পার, ন' টিকেও ভালবাসতে পার—সব ঠিক থাকবে। কিন্তু ওই বিশেষ একটি যদি তোমার জীবনে এসে পড়ে, সে চার নম্বরই হোক আর সাত নম্বরই হোক,—তোমার অন্তিম ঘনিয়ে এসেছে জেনো। তোমার ওপরে সে তার

মোহজাল ছড়িয়ে দেবে এবং তোমাকে বেঁধে ফেলবে। তাকে ছাড়া পৃথিবীর কোনো আলোই যেন আর দেখতে পাবে না। তারপর থেকে একটা অন্ধ মানুষের মতো তুমি জীবন কাটাবে। সেই নারী তোমার নিয়তি—কেরেমেত তাকেই পাঠান শাস্তি হিসেবে। দেবতার প্রয়োজন আছে ছেলেপুলের। তাঁর পুরুষের দরকার। এবং যখন ওটা একটা খেলা মাত্র হয়ে ওঠে—ছেলেপুলে থাকে না—দেবতা রাগ করেন। ওই খেলায় তাঁর দরকার নেই।…"

"তুমি কি গীর্জায় যাও?" জিজ্ঞেস করলুম।

আমার প্রশ্ন শুনে বোধ করি সে বিস্মিত হলো এবং বিরূপ ভাবে জবাব দিলে, "আমরা যাই। যাব না কেন? রাজকুমারের তৈরী আমাদের সুন্দর একটা গীর্জা আছে। এবং পাদ্রীটিও চমৎকার, চতুর। মৌমাছিরা তাকে পছন্দ করে। আমরা এখানে শান্তভাবেই বাস করি। এবং সুখে ও শান্তিতেই আছি। চারদিকে আছে জঙ্গল।…"

বেড়ালের বাচ্চাগুলো আঁচড়ে আঁচড়ে তার হাঁটুর ওপর উঠতে চাইছিল; সে তার বড় বড় হাতের থাবায় দুটোকে একসঙ্গে করে তুলে ধরল। মুখের কাছে খুদে খুদে জীবগুলোকে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলে, "কি চাই তোদের?" তারপর টেবিলের ওপরে নিজের প্লেটে খানিকটা দুধ ঢেলে ঠেলে দিলে বাচ্চা দুটোর দিকে। সামান্য কৃষক এ রকমটা করত না।

"খা এইটুকুন। তিনের নম্বরটি কোথায়? ছোট্ট ভাইটি?"

ছোট্ট ভাইটি তখন আমার জুতো চিবুচ্ছে। তাকে আমি টেবিলের ওপর তুলে দিলাম।

"খুব চালাক প্রাণী—এই এরা। এরা কারুকে বিশ্বাস করে না।" আইভানিখা বললে। "এবং ওদের স্মৃতিশক্তি চমৎকার। ওদের কারুকে যদি মারধর করো পাঁচটি বছর ওরা মনে করে রাখবে—যখন হয়তো তুমি সব ভুলেই গেছ। কিন্তু মানুষের স্মৃতিশক্তি বড় দুর্বল: যারা ওদের মারে তাদের মনে রাখে না।…"

তখন বেশ বেলা পড়ে এসেছিল। মাঠ থেকে গোরু-বাছুর ফিরে এল। রাস্তা দিয়ে ফিরে চলেছে কৃষকের দল—জানালায় তাদের শানিত কাস্তে ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে এবং প্রতিফলিত হচ্ছে অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা। যেতে যেতে মেয়েরা উঁকি দিয়ে যাচ্ছে ঘরের ভেতরে।

"আচ্ছা—আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে," আইভানিখা বললে।

"মোকীফের ওখানে গিয়েছিলে কেন? ওখানকার লোকগুলো দুর্ভাগা। পরের বার আমার এখানে এসে থেকো। আমার বাড়িতে মানুষজন এসে উঠুক—এ আমি পছন্দ করি।"

ফটক পর্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে সে এল। একটি মেয়েকে যেতে দেখে সে হেঁকে উঠল, "মারিয়া—তোমার পা বেঁধেছ তো?"

"ও মাগো, বাঁধবার সময় পাই নি মা!"

"বোকা মেয়ে। আচ্ছা থাক—আমি নিজেই বেঁধে দেবো' খন।" ...

সন্ধ্যের খাওয়া-দাওয়ার পর মোকীফ নদীতে জাল ফেলবার জন্য আমাকে সাহায্য করতে ডাকলে। যেতে যেতে সে বললে—প্রায় বছর দশেক আগে বুড়ি যুবকদের উপদেশ দিত কিভাবে তারা স্ত্রীদের সঙ্গে ব্যবহার করবে।

"এর জন্যে সে পাঁচ পেনি করে নিত অথবা এক পাউণ্ড কড়কড়ে বিস্কুট। মৌরির সঙ্গে এই কড়কড়ে বিস্কুট খেতে ও ভালোবাসত। এই সব করার জন্য প্রথম দিকে তারা সবাই হাসত কিন্তু পরে তাদের অভ্যাস হয়ে গেল। আর আইভানিখা বকাবকি করত ছোকরাদের, বোকা বলে ডাকত। বোকা—সব সময় এই হলো ওর প্রথম কথা। চেঁচামেচি করে ও বলত—'তোমাদের গোরুগুলো তোমরা দেখাশোনা করছ, ঘোড়াগুলোর দিকেও তোমাদের নজর আছে আর মেয়েদের বেলায় তোমাদের চিন্তা নেই!' আমার মনে হয়—ওর কথাই ঠিক। ছোকরাগুলো আস্ত জোয়ান ভালুক। বিয়ে করে কিন্তু জানে না মেয়েদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়। একেবারে প্রথম থেকে বৌকে নষ্ট করে বসে ওরা—তারপর মিষ্টি নয় আর চালাক নয় বলে লাগায় মার।' "...

আকাশে ঝলমল করছে চাঁদ আর বাতাস ভারী হয়ে আছে সদ্য কাটা ঘাসের তীব্র, ভেজা ভেজা গন্ধে। একটা গাছের বেরিয়ে থাকা শেকড়ে ঠোক্কর খেয়ে বুড়ো গালাগাল দিয়ে উঠল এবং সেই মুখেই সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের সহায়তা প্রার্থনা করলে। তারপর খুঁড়িয়ে চলতে চলতে দ্রুত সে বিষয়ান্তরে চলে গেল। বললে, "ওকে সবাই ভয় করে—ওই আইভানিখাকে। এবং সম্মানও করে। ও খুব কড়া খদ্দের বাবা—এ বলে দিলুম তোমাকে।..."

একটু থেমে আবার সে বলতে লাগল: "আবার উপকারীও। কর্তৃপক্ষ চেয়েছিল—ওই ঘর থেকে, জঙ্গল থেকে ওকে তাড়ায়। পেতলের বোতাম আঁটা একজন লোকও এসেছিল শহর থেকে দেখাশোনা করতে—যাতে নাকি কাজটা হাঁসিল হয়। সে তাড়াও লাগাত ছেড়ে যাওয়ার জন্য। সে বলত,

'একজন স্ত্রীলোক বনরক্ষক হবে—এমন রীতিও নেই বা আইনও নেই। না—এমন কখনও ছিল না।' লোকজন তাকে সাবধান করে দিয়েছিল। তারা বলেছিল—'সত্যি বটে ও স্ত্রীলোক কিন্তু জঙ্গলের দানবও ওর চেয়ে ভয়ংকর নয়।' লোকটি বিশ্বাস করে নি কথাটা। আচ্ছা,—ভাবতে পারো, ও কি করেছিল? দুই হাত জড়ালো চামড়ার ফেট্টিতে, সঙ্গে নিলে একটা ছুরি এবং বাকি সব অস্ত্র—তারপর হাজির হলো লোকটির কাছে—যেন সে-ই আসল ভালুক। তাকে খুব একটা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল আইভানিখা। লোকটি বললে, 'সর্বনাশ হোক তোর—মাদি শয়তান, তোকে সাইবেরিয়ায় পাঠানো উচিত।' সেই থেকে আইভানিখা জঙ্গলেই থেকে গেল—পরে অবশ্য স্বেচ্ছায় ছেড়ে চলে এল। তার জায়গায় নেওয়া হলো বুড়ো জ্যাকভকে কিন্তু প্রথম শীতেই, একদিন সে মাতাল হয়ে জঙ্গলে পড়েছিল, নেকড়েরা তাকে খেয়ে ফেললে।... ভারী সুন্দর দেশ আমাদের—খুব শান্তিপূর্ণ," অপ্রত্যাশিত ভাবে সে উপসংহার করলে পরিপূর্ণ প্রত্যয়ে।

সারা মাঠ প্রান্তর উষ্ণ ছায়ায় আবৃত করে ধীরে ধীরে এবং একান্ত গোপনে রাত্রি উঁকি মারছিল অরণ্যের ভেতর থেকে। একটা নীরবতা যেন ডুবে যাচ্ছিল নীল, অলস ছোট্ট নদীটিতে। ওদিকে চাঁদের চারিদিকে জ্বলজ্বল করছে তারার দল, যেন ফুলের চারিদিকে মৌমাছিরা।...

মাস তিনেক পরে, যখন আমি ছুটিতে ছিলাম, সেই সময়ে বেরেজিয়াংকার পথ ধরে এসে পড়লাম আবার একদিন। এসে উঠলাম আইভানিখার বাড়িতে এবং গ্রামের সকলকে জড়ো করে জানালুম—গতবার আমার যাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত ওদের ব্যাপারটা কতদূর এগিয়েছে। শরতের রাত্রিতে বৃদ্ধার সঙ্গে বসে চা খেতে খেতে তার গল্প শুনি। গ্রীষ্মের সমস্ত ঘটনার কথাই সে বলে গেল: বললে এক অগ্নিকাণ্ডের কথা যাতে সৌভাগ্য-ক্রমে মাত্র তিনটে ঝুপড়ি পুড়ে গেছে, কে কে অসুস্থ হয়েছিল, কে কে মারধর খেয়েছে, ব্যাঙের ছাতার বিষক্রিয়ায় ভুগেছে কে কে, কোন বাচ্চা মেয়েটা জঙ্গলের ভেতরে ভয় পেয়ে মাথা বিগড়ে গেছে। এখন সে উনুনের পাশে রাতদিন একটা অন্ধকার কোণে বসে থাকে আর বলে—'ওমা, মামনি, চলো দৌড়ে পালাই—চলো!'

তারপর, আঙুলগুলো তেমনি নাড়তে নাড়তে সে কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল, "সেই জমির ব্যাপারে এখনও কিছু ফয়সালা হয় নি—তাই না?"

আমি যখন বললাম—'এখনও হয় নি', সে আমার দিকে তাকালো অবিশ্বাস ভরে। "আমার কাছ থেকে জিনিসটা ঢাকবার চেষ্টা করো না।" সে বললে। "হুঁশিয়ার হও ; ওই জমির ব্যাপার চাষীদের ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে।"

জানালার পেছনে বাতাস নাড়া দিচ্ছে গাছে এবং শোঁ শোঁ করছে চিমনিতে, শার্সিতে এসে পড়ছে বৃষ্টির ছাট। রুশ দেশের বিষাদময় অক্টোবর মাসের খাপে মোড়া এ দেশ—যেন শ্বাসরুদ্ধ। এ এক এমন বিষাদময়তা—যার ভয়ংকরতার তুলনা করা চলে আশা-আশ্বাসহীন কোনো মারাত্মক ব্যাধির সঙ্গে। আমি যাদুকরীর কাছে চাইছিলাম—কেরেমেত সম্পর্কে আরও কিছু সে বলুক, কি ধরনের দেবতা একটু ব্যাখ্যা করে বলুক। তাই যখন তার চা খাওয়া শেষ হলো, প্লেটগুলো ধুয়ে মুছে যথাস্থানে রেখে দিলে এবং টেবিলের পাশে বসে মোজা বুনতে শুরু করে দিলে, আমি খুব সাবধানে তাকে কথাটা জিজ্ঞেস করলুম।

তার পুরু ঠোঁট দুটো অপ্রসন্ন ক্রোধে যেন কুঁচকে গেল; অতি দ্রুত আঙুলগুলো নাড়তে নাড়তে এবং বোনার কাঁটার ঝিলিক দিতে দিতে অনিচ্ছাতেই সে জবাব দিলে। কুঁচকে উঠল তার উটের মত নাসারন্ধ্র এবং ছুঁচালো হয়ে উঠলো কাল নাকটা।

"আমি পাদ্রী পুরোহিত নই," সে বললে। "ভগবানের সঙ্গে আমি কোনো সম্পর্কেই বাঁধা নই।"

"কিন্তু কেরেমেত কি ভাল দেবতা ?"

"দেবতা ঘোড়া নয়। দাঁত দেখে তুমি তার বিচার করতে পার না।··· তাদের চোখে দেখার সযোগও তোমার নেই।" ···

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওই রকম কুণ্ঠায় ও রাগতভাবে সে আমার জবাব দিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, আমার কিছু মন্তব্যের ফলে তাকে আমি ধরতে পারলুম। নাসারন্ধ্র ফুলিয়ে, সবজে সবজে ভেড়ার মতো দাঁতগুলো বের করে, বোনার কাঁটায় আরও দ্রুত কাজ করতে করতে অসহ্য গলায় সে গর গর করে করে বলতে লাগল :

"পিপে তৈরী করা মিস্ত্রীর মতো কি তুমি হাতুড়ী পেটাচ্ছ ? যেমন ভাবে একটা বুড়োর হাতে একটা যুবতীকে গছিয়ে দাও তেমনি ঈশ্বরের হাতে একটা মানুষকে তুমি গছিয়ে দিতে পার না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো একটা লোককে তুমি ঈশ্বরের কাছে টেনে নিয়ে যেতে পার না। ওই ধরনের বিয়ে ভালো হয় না। ওর মধ্যে কোনো সত্য থাকবে না।"

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম—বিশুদ্ধ রুশীয় রীতিতে তার বাক্য-গঠন প্রণালী নয়, যদিও সে ঝাঁঝালো এবং অনর্গলভাবে বলে যাচ্ছিল। রূঢ় ভঙ্গীতে সে তার শালটা মাথায় টেনে তুললে। কপালটা তার উঁচু হয়ে উঠল বলে মনে হলো। মোটা মোটা দুটো ভুরুর তল দিয়ে যে চোখ দুটো অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল—তা যেন ক্ষুদ্রতর এবং পরিষ্কার। সেই সঙ্গে তার কুঞ্চিত মুখটা যেন আরও কুঁচকে গেল এবং কঠিন হয়ে উঠল।

"তোমাদের ঈশ্বর ভালবাসে বিশ্বাস কিন্তু কেরেমেত ভালোবাসে সত্য।" সে বলে চললো: "বিশ্বাসের চেয়ে সত্য বড়। কেরেমেত জানেন—যদি ঈশ্বর ও মানুষ বন্ধু হয়, সেইখানে জন্ম নেবে সত্য। মানুষের আত্মা তাঁরই আত্মা—যা তিনি শয়তানের হাতে কখনই ছেড়ে দেবেন না। তোমাদের ঈশ্বর খৃষ্ট কিছুই চান না—শুধু চান বিশ্বাস। কেরেমেত চান মানুষকে, কারণ তিনি জানেন যে মানুষ ও ঈশ্বরের মিলনই সত্য। একক ঈশ্বর স্বয়ং অসত্য। কেরেমেত দানের সাগর। এই পশুরা, এই মাছেরা, এই মৌমাছিরা—এসব তিনি দিয়েছেন মানুষকে। তিনি তাদের জমিও দেন। তিনি মানবজাতির রাখাল। তিনি সে রাখাল নন যিনি একজন পাদ্রী, তবে তিনি সেই রাখাল যিনি ঈশ্বর। তোমাদের তিনি পাদ্রী। খৃষ্ট বলেন, 'বিশ্বাস রাখ।' কেরেমেত বলেন 'সত্যের মধ্যে বাঁচ। যদি তা কর, তুমি হবে আমার বন্ধু।' তুমি টাকা দিয়ে সত্যকে কেন না। পাদ্রীরা টাকার কাঙাল। তারা কুকুরের লড়াই লাগাবার মত কেরেমেত আর ঈশ্বরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়। তারা লড়াই করে আর গর্জন করে—তোমাদের ঈশ্বর আমাদের ওপর আর আমাদের ঈশ্বর তোমাদের ওপর।"

তার বোনা থেমে গেল, পশমের গোলা আর বোনার কাঁটা নামিয়ে রাখলে এবং ঠোঁটে চুক্‌চুক্ শব্দ করে বিষণ্ণ ভাবে নিস্তেজ কণ্ঠে বলে চললো: " 'জাতি' যাকে বলে মরডোভায় তা আর নেই। মরডোভার মানুষ জানে না কাকে তারা বিশ্বাস করবে। তুমিও, তুমিও—সেই 'জাতি'-গত মানুষ আর নও। কেরেমেত তোমাদের ওপর রাগ করেছেন এবং তাই নানা জটিলতায় ভরেছে তোমাদের জীবন। দুই দেবতাই তাই করছেন: আমাদের দেবতা তোমাদের ওপর, তোমাদের দেবতা আমাদের ওপর। তাঁরা দুজনেই আজ মন্দবুদ্ধি। ঈশ্বর মানুষের পরিপোষণ করে এবং তাই মানুষও হয়ে উঠেছে মন্দবুদ্ধি ও নির্দয়।"

বৃদ্ধার দুটি চোখ যেন ঘোরমুক্ত হয়ে উঠল এবং রূঢ় একটা অস্বীকার ঝলক দিয়ে উঠল। সে যেন ক্রমে ক্রমে অরুণীয় হয়ে উঠতে লাগল। কেমন একটা প্রাধান্যপূর্ণ স্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল তার কণ্ঠে। আস্তে আস্তে এমনভাবে সে ঘাড়টা নামাল, মনে হলো মাথাটা প্রায় ঠুকে দেবে আমার গায়ে। একটা বিশ্রী পরিণামের কথা ভেবে আমি চেয়ারে নড়ে চড়ে সজাগ হয়ে বসলাম। সেই সব কথা, মরডোভিয়ার কথা—তার বক্তব্যের মধ্যে ক্রমশ বেশী বেশী এসে দেখা দিচ্ছিল—আমার কাছে তারা অদ্ভুত এবং অপরিচিত। যাই হোক, আমার নড়চড়ন দেখে সে আপাতত কিছুটা সংযত হলো যেন—কারণ, টেবিল থেকে আবার বোনার মোজাটা তুলে নিলে এবং বোনার কাঁটা আবার দ্রুত ঝিলিক দিতে লাগল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গলা নামিয়ে আবার সে সুরু করলো: "ঈশ্বর এক নির্দয় দেবতা, কিন্তু পাদ্রী সবার চেয়ে বেশী নির্দয়। ঠিক ঠিক ভাবে মানুষ-দের ভাগ করে ফেলা উচিত—একভাগ এই দেবতাকে, অন্যভাগ অন্য দেবতার। তাহলে দেবতারাও যে যার দল নিয়ে শান্তি ও সমঝোতায় থাকতে পারবে। সৎপ্রভুর কোনো বিদ্বেষ থাকে না। তোমরা বল, 'ঈশ্বর সত্য ভালোবাসেন—কিন্তু স্বীকৃতিটা দ্রুত নয়।'* কেন তিনি দ্রুত নন? যদি তোমরা জবাবটা জান, এখুনি বল। কেরেমেত জানেন যে বিশ্বাসের চেয়ে সত্য শ্রেয়। এই কথাই তিনি বলতেন কিন্তু যখন ওরা তাঁর পিছু ধাওয়া করলে, তিনি থামলেন। তিনি রুষ্ট হলেন। বললেন, 'আমাকে ছাড়াই তবে বাঁচ।' আমাদের পক্ষে এ অমঙ্গল কিন্তু শয়তানের পক্ষে ভাল।"

গাঁয়ের কিছু মানুষ আমাকে দেখবার জন্য জলে ভিজে একসা হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। নাকের শব্দ করতে করতে এবং হাতে দাড়ির জল মুছতে মুছতে ওরা একটা বেঞ্চের ওপর এসে বসল। শহর ও জমিজমা সম্পর্কে ওরা সতর্ক আলোচনা সুরু করে দিলে—এবং আমাকে বাজিয়ে জেনে নিতে চাইলে, জীবন-সংগ্রাম একটু সহজতর হওয়ার কোনো লক্ষণ আছে কিনা। অবশ্য আমার কাছ থেকে তারা কিছুই জানতে পারল না।

ওরা চলে যাওয়ার পর আইভানিধা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমাকে অনুরোধ করলে: "চাষীরা যা বললে—সেই সব কথা শহরে গিয়ে ওদের কিছু ব'লো না। গভরনরকে কিছু ব'লো না—দোহাই।..."

* একটি রুশ প্রবচন

ঘুমোবার জন্য সে শুয়ে পড়ল উনুনের পাশে এবং আমি শুয়ে পড়লাম তাকের বাংকে—যেখানে ভুরভুর করছে শুকনো ঘাসের গন্ধ।

চিমনির ওপরে বাতাসের কান্না এবং একটা গভীর, খস্‌খসে ফিস্‌-ফিসানিতে মাঝরাত্রে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তাক থেকে নিচে তাকিয়ে দেখতে পেলাম—আইভানিখা হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছে। একটা আকারহীন স্তূপের মতো মনে হলো তাকে—যেন পলিত এবং বিবর্ণশ্রী কিছু একটা, যেন কিছুটা পাথরের মতো। তার অস্পষ্ট গলা অদ্ভুতভাবে যেন বুদ্বুদ্ধ তুলতে লাগল; ভীষণ ভাবে জল ফুটলে অথবা গলা ঘড় ঘড় করে উঠলে যেমন একটা শব্দ বের হয়—এ যেন তেমনি। ধীরে ধীরে সেই ঘড়ঘড়ানির ভেতর থেকে বিস্ময়কর ভাবে ফুটে উঠলো কথার পর কথা :

"হে খৃষ্ট, এ কেমন ভ্রান্তি!... এ কি লজ্জা! খৃষ্ট।... এলিজা ক্রুদ্ধ, তুমি ক্রুদ্ধ। কেরেমেত ক্রুদ্ধ। তুমি শক্তিমান এবং বহু লোক তোমাকে অনুসরণ করে। তোমার দয়ালু হওয়া উচিত। দেবতা যদি নির্দয় হন তাহলে মানুষকে কে দয়া করবে? হে খৃষ্ট! তুমি অবশ্যই আমার কথা শুনবে! অবশ্যই শুনবে! আমি অনেক জানি। তোমার মেয়েরা অত্যাচারিত, তোমার পুরুষেরা অত্যাচারিত। কেন? এ অন্যায়।..."

ক্রশের চিহ্ন না করে সে তার দুটো হাত এদিক ওদিক ছুঁড়তে লাগল —কখনো তা মেলে ধরলে কালো একটা আইকনের সামনে, কখনো চেপে ধরলে পাছার ওপরে, কখনো চাপড়াতে লাগল বুকে। এবং সর্বক্ষণই তার উচ্চারিত কথাগুলো যেন রুদ্ধকণ্ঠ হয়ে ফিস ফিস করতে লাগল অস্পষ্ট গলায় অথবা তিরস্কার করতে লাগল ভয়ংকর ভাবে :

"হে খৃষ্ট, তোমার পাদ্রীরা কেরেমেতকে অসন্তুষ্ট করেছে! তাদের এ কী দুঃসাহস? কেরেমেত কি তোমার চেয়ে খাটো? এ কি ভুল—কি ভ্রান্তি হে খৃষ্ট। দেবতা শত্রুতা করছে দেবতার—কি ভাববে মানুষে - হে খৃষ্ট, তুমি খারাপ দেবতা, ঈর্ষাকাতর দেবতা, এক নির্দয় দেবতা, মানব-দেবতা একেবারেই নও। তোমার অনুগত থাকা মানুষের পক্ষে কঠিন। তোমার উদ্দেশ্য আমাদের কাছে স্পষ্ট করো। নবীন যৌবনেই আইভান কেন মরলো? আর মিস্‌কা—একেবারে বাচ্চা, খুদে ফুটফুটে মিসকা? কেন? গুসেফের গোরু মরে গেল—কোন উদ্দেশ্যে? অন্যের প্রতি করুণা তোমার না থাক, নিজের জন্য তুমি কি দুঃখিত নও? কি দুঃখ—কি দুঃখ। তুমি কার সেবা করছ খৃষ্ট?

কোন মানুষদের সেবা করছ তুমি? এই আমি—একটা স্ত্রীলোক, মানুষের সেবা করছি—সাহায্য করছি তোমার অনুগামীদের, তাতারদের এবং চুভাসদের।* আমার কাছে তারা সকলে সমান। কিন্তু তুমি? তোমার পাদ্রীরা বলে—তুমি আমাদের সকলের জন্য বিরাজ করছ কিন্তু তুমি তোমার লোকদেরই ভালবাস না। না, ভালোবাস না। লজ্জা, ওঃ কি লজ্জা খৃষ্ট, এ রকম করা উচিত নয়। আমি সত্যি বলছি। কি লজ্জার বিষয় তুমি! তোমার লোকেদের দিকে তাকাও। তারা ভালো মানুষ, কিন্তু কেমন করে তারা বাঁচে? ও খৃষ্ট, তুমি জান না? দেবতা ভাল কাজই করেন—যখন তিনি মানুষের কথা শোনেন, তেমনি মানুষও ভাল কাজ করে—যখন তারা দেবতার কথা শোনে। আমার কথা শোন। আমি ভুল কিছুই বলছি না। আমি সত্যিই বলছি, তোমার উচিত চোখ মেলে তাকানো এবং দেখা। সত্যকে দেবতার ভাল করেই জানা উচিত। সত্যকে আমি তোমার চেয়ে ভালো করে জানি, তোমার আগে থেকে জানি, হে খৃষ্ট! ...”

এমনি ভাবে অনেকক্ষণ ধরে সে খৃষ্টের উপর দোষারোপ করলে, তার রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠস্বর অপার্থিব গুঞ্জনে ধ্বনিত হয়ে উঠল, কথাগুলো গলার ভেতরে বুদ্বুদ্ধ তুলে কখনো করুণ স্বরে, কখনো কটু এবং কখনো প্রচণ্ড উগ্রতায় ফেটে পড়তে লাগল।

চালের খড়ে পড়ছে বৃষ্টির সুতীব্র চাবুক, বাতাস করে উঠছে মর্মভেদী পাশব আর্তনাদ—একটা মানুষের হৃদয়ের অভিযোগকে সকলের কাছ থেকে আড়াল করে রাখার যেন চেষ্টা তার। ভোর ভোর আমি গ্রাম ছেড়ে চললাম এবং সঙ্গে নিয়ে গেলাম মানুষের সঙ্গে দেবতার চমৎকার এক কথোপকথনের স্মৃতি—আমার সারা জীবনে এ রকম যত শুনেছি—বোধ করি তার মধ্যে এটি সর্বোত্তম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ মাকোফ ও মাকড়সা

পুরানো জিনিসের কারবারী বুড়ো এরমোলাই মাকোফ দিব্যি ঢ্যাঙাপানা মানুষটি, খুঁটির মতো যেমন খাড়া তেমনি ডিগ্‌ডিগে রোগা। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটে—যেন কুচকাওয়াজী সৈনিক। ষাঁড়ের মতো ড্যাবড্যাবে দুটো চোখ দিয়ে সব কিছু সে লক্ষ্য করতে করতে চলে। চোখের ম্যাটমেটে পাণ্ডুর

* উত্তর রাশিয়ার মোঙ্গল জাতীয় অধিবাসী।

নীল তারায় কেমন এক ধরনের বিষণ্ণতা মেশানো। তার চরিত্রের ইচ্ছাকৃত খামখেয়ালিপনায় আমি তাকে খুব দুর্বোধ্য মানুষ বলেই মনে করতুম। যেমন ধরো—কোনো কেরানীর একটা দোয়াত-দানি বা শুঁড়ির দোকান থেকে সংগ্রহ করা বড় একটা হাতা বা পুরানো একটা মুদ্রা নিয়ে সে হাজির হলো এবং বেশ লাভজনক না হওয়া পর্যন্ত সে নাছোড়বান্দা হয়ে দর কষাকষি করলে এবং শেষ পর্যন্ত একটা দামও ঠিক হলো। তারপর হঠাৎ বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে বসল: "নাঃ, আমি এটা বেচবো না।"

"কেন বেচবে না?"

"বেচতে চাই না—তাই।"

"তা হলে এত দর কষাকষি করতে গিয়ে আমার পুরো একটি ঘণ্টা নষ্ট করলে কেন?"

তার ওভারকোটের পকেটের গভীরে বস্তুটা নিঃশব্দে সে চালান করে দেবে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবে এবং চলে যাবে। যাওয়ার সময় একটা বিদায় সম্ভাষণও জানাবে না। ভান করবে—যেন ভয়ানক আহত হয়েছে।

কিন্তু একদিন কি দুদিন—কখনো বা ঘণ্টা খানেক বাদেই, সে আবার অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে উদয় হবে এবং টেবিলের ওপরে জিনিসটা রেখে বলবে হয়ত, "এটা নাও।"

"তখন তবে দিলে না কেন?"

"তখন ইচ্ছে ছিল না।"

টাকা পয়সার ব্যাপারে সে লোভী নয়। গরীব দুঃখীদের সে অনেক কিছুই বিলিয়ে দিয়েছে কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সে এতটুকুও সচেতন নয়। কি শীতে আর কি গ্রীষ্মে—অঙ্গে তার সেই এক ওভার-কোট, মাথায় দুমড়ানো একটা গরম কাপড়ের টুপি এবং পায়ে ছেঁড়া জুতো। তার নিজের কোনো ঘর নেই, ঘুরে বেড়ায় সে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে—নিঝ্‌নি থেকে মুরোম, মুরোম থেকে সুজদাল, বোস্টফ, জারোস্লাভ। আবার ফিরে আসে নিঝনিতে। এখানেই সে বুবনোফের নোংরা আস্তানায় ঘাঁটি গেড়েছে। যত চিড়িয়াওয়ালা, শানওয়ালা, গোয়েন্দা এবং ওই রকম আরও অনেকের আস্তানা ওইটে। সবাই ওরা সুখের সন্ধানী। এখানে আসে তারা সুখের সন্ধানে—আর তামাকের পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ায় গড়াগড়ি দেয় ভেঙে পড়া অত্যন্ত জীর্ণ সোফাগুলোর ওপরে।

একেবারে হাতের কাছের মানুষ এবং গল্পবাজ হিসাবে মাকোফই এই মানব-আবর্জনার মধ্যে সবচেয়ে বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে। তার গল্পগুলো হলো বড় বড় বনেদী ঘরের ধ্বংসের কাহিনী—জমিদারী তছনছের কাহিনী। জমিদারদের অদূরদর্শিতাকে সামনে তুলে ধ'রে এবং বেশ রং চড়িয়ে তার বক্তব্যকে সে এক জমাট বিষাদের মধ্যে ফেনিয়ে তুলতে পারে।

"ওরা শুধু বল গড়িয়ে বেড়াচ্ছে।" সে বলে, "কাঠের মুগুরের মত একটা কি নিয়ে বল গড়াতে ওরা ভালবাসে—এই এক ধরনের খেলা ওদের। এবং ওরা নিজেরাও হয়ে গেছে এক ধরনের বলের মতো—পৃথিবীর এখানে ওখানে গড়িয়ে বেড়াচ্ছে উদ্দেশ্যহীন ভাবে।"

একবার কাজান যাওয়ার পথে এক কুয়াশাচ্ছন্ন হেমন্তের রাতে মাকোফের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এক জাহাজে। জাহাজের জল-টানা পাখ্‌নাটা প্রায় ঘুরছিলই না। কোনো রকমে অন্ধের মতো স্রোত বেয়ে যেন সন্তর্পণে গড়িয়ে চলছিল। জাহাজের সব আলোগুলো কেমন ফেকাসে—মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে ধূসর জলরাশি আর পাণ্ডুর কুয়াশার সঙ্গে। জাহাজটা ভোঁ দিচ্ছে অনবরত—কেমন একটা বিষণ্ণতা সে শব্দে। দুঃস্বপ্নের মধ্যে যেন একটা দুশ্চিন্তা বুকটাকে চেপে ধরেছে।

জাহাজের একেবারে পেছন দিকে বসে ছিল মাকোফ—একা, যেন কারুর কাছ থেকে গা-ঢাকা দিয়েছে। আমরা কথা-বার্তা সুরু করলাম। তখনই সে এই কাহিনীটি আমায় বলে।

"আজ তেইশ বছর ধরে আমি একটা অশেষ ভয়ের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছি—যার হাত থেকে পরিত্রাণ খুঁজে পাইনি। আর এই ভয়—জানেন মশায়, এক অদ্ভুত ধরনের। অদ্ভুত এক আত্মা যেন আমার শরীরে এসে ভর করেছে।

"আমার তিরিশ বছর বয়সে আমি একটি মেয়ের সংস্পর্শে আসি এবং মেয়েটি একেবারে সাক্ষাৎ ডাকিনী। তার স্বামী—আমার বন্ধু, দয়ালু মানুষ ছিল সে কিন্তু সে অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং তার অবস্থা হল মর-মর। যে রাতে সে মারা গেল আমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সেই বদমাস মেয়ে লোকটি মন্ত্রের সাহায্যে আমার আত্মাটি বের করে নিয়ে তার স্বামীর আত্মা চালান করে দিলে আমার শরীরে। নিজের লাভের দিকে নজর রেখেই সে এটা করেছিল। কারণ আমার চেয়ে, তার স্বামীই ওই অপদার্থ মেয়েটাকে ভালবাসত ঢের বেশী। যাক, স্বামী তো মারা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য

করলাম, আমি আর সে আগের মানুষ নেই। আমি তোমাকে খোলাখুলিই বলতে পারি—স্ত্রীলোকটিকে আমি কোন দিনই ভালবাসিনি। তার সঙ্গে আমি প্রেমের খেলা খেলেছি। কিন্তু বুঝতে পারলাম—আমার আত্মা তার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কেমন করে তা হতে পারে? সে ছিল আমার কাছে বিরক্তিকর—তবু তার কাছ থেকে আমি পালাতে পারলাম না।

"আমার সব মহৎ গুণ ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে গেল। পেয়ে বসল কেমন এক অস্পষ্ট বিষণ্ণতা। মেয়েটির কাছে আমি হয়ে গেলাম একান্ত বশংবদ। তার মুখ চোখ জ্বলে উঠতো আগুনের মত কিন্তু আমার চার পাশে সব কিছু হয়ে গেল ধূসর—সব যেন ছাই ভস্মে আচ্ছন্ন।

"আমার সঙ্গে সে সুরু করল খেলা এবং রাতে আমায় সে টেনে নিয়ে যেত পাপের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারলাম—সে আমার আত্মাকে বদলে দিয়েছে এবং আমি বেঁচে আছি আর একজনের আত্মা নিয়ে। কিন্তু আমার আত্মা—ঈশ্বর যা আমায় দিয়েছিলেন, সে কোথায়? আমি ভয় পেয়ে গেলাম।..."

অতিপ্রাকৃত একটা শব্দের মতো বেজে উঠল জাহাজের ভোঁ, কিন্তু দম-চাপা সে শব্দ হারিয়ে গেল কুয়াশায়। কুয়াশা যেন চেপে ধরেছে জাহাজটাকে আর তার মধ্যে ওটা পিছলে পিছলে এগিয়ে চলেছে। ওর তলায় কালো পাতলা রজনের মত জলরাশি ছলছলিয়ে উঠছে—গর্ গর্ করে উঠছে। বুড়ো মাকোফ জাহাজের গায়ে হেলান দিয়ে বসল, ভারি বুট-পরা পা দুটো ডেকে ঠুকে দিলে, শূন্যে হাওয়ায় কি যেন অদ্ভুত ভাবে ধরবার চেষ্টা করল। তারপর গলা নামিয়ে বলতে লাগল:

"আমি এত ভয় পেয়েছিলাম যে একদিন আমি চিল্‌কোঠায় গিয়ে বরগায় একটা দড়ির ফাঁস লাগালাম। কিন্তু কপাল খারাপ, একটা ধোপানী দেখতে পেয়ে গেল এবং সবাই মিলে আমাকে ঠিক সময়ে ফাঁস থেকে বাঁচিয়ে দিলে। সেইদিন থেকে, প্রতিনিয়ত একটা অদ্ভুত প্রাণী রয়েছে আমার পাশে পাশে: —যাকে ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না—সে এক ছ'ঠ্যাংওয়ালা মাকড়সা, হাঁটে পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে, আকারে হবে প্রায় একটা ছাগলের মতো। তার দাড়ি আছে, শিং আছে, মেয়েদের মত বুক, চোখ তার তিনটে—দুটো কপালে এবং তৃতীয়টা দুই স্তনের মাঝখানে, সব সময়ে মুখ নীচু করে চোখ দিয়ে রেখেছে আমার প্রতিটি পদক্ষেপে। যেখানেই যাই—সে আমার অনুসরণ করে

চলেছে প্রতিনিয়ত—একটা কুৎসিত, লোমশ প্রাণী, ছ'টা তার পা। ও যেন চাঁদের সেই ছায়ার মতো। আমি ছাড়া তাকে আর কেউ দেখতে পায় না—এই তো এখানেই সে আছে, শুধু তুমি তাকে দেখতে পাবে না। এই তো এখন সে এখানে!"

বাঁদিকে হাতটা বাড়িয়ে মাকোফ জাহাজের ডেক থেকে প্রায় হাত দেড়েক উঁচুতে হাওয়ায় টোকা দিলে এবং হাঁটুর ওপরে হাতটা মুছে নিয়ে বিড় বিড় করে বললে, "ওটা একেবারে ভিজে গেছে।"

"তুমি তাহলে এই বিশ বছর মাকড়সার সঙ্গে জীবন কাটাচ্ছ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তেইশ বছর। তুমি হয়তো ভাবছ—আমি পাগল। এই তো এখানে—আমার পাহারাদার, তাকিয়ে দেখ—গুটিসুটি মেরে বসে আছে।"

"এ ব্যাপারে কোনো ডাক্তারের পরামর্শ নাওনি কেন?"

"তাদের পরামর্শ নিতে যাবো কি জন্যে মশায়? এ ব্যাপারে ডাক্তাররা আমার কি সাহায্য করতে পারে? এতো আর ফোড়া নয় যে ছুরি দিয়ে ফালা করে দেবে; কোনো লোশন দিয়ে তুমি একে তাড়াতে পারবে না বা প্লাস্টার দিয়ে বাঁধতে পারবে না। ডাক্তার মাকড়সাকে দেখতে পাবে না—পাবে কি?"

"মাকড়সাটা কি তোমার সঙ্গে কথা বলে?"

মাকোফ সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকাল।

"তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করছ?" সে বলল। "মাকড়সা কথা বলবে কি করে? আমাকে ভয় দেখাবার জন্যই একে পাঠানো হয়েছে, এ সারাক্ষণ আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে—অন্যের আত্মাকে আমি তাড়িয়ে দিতে পারি না—বিনাশ করতে পারি না। ভুলে যেওনা—যে আত্মার এখন আমি মালিক সে আমার নিজের আত্মা নয়—এ যেন আমি চুরি করেছি।

"বছর দশেক আগে জলে ডুবে মরবার আমি সংকল্প করেছিলাম। একটা গাধা বোট থেকে আমি জলে ঝাঁপ দিয়েছিলাম। কিন্তু সেবারেও ওই মাকড়সা—তার বাঁকা একটা নখ দিয়ে ধরে ফেললে আমাকে, অন্য আর একটা নখ দিয়ে ধরে রাখল বোটের গলুই। আমি শূন্যে ঝুলতে লাগলাম। আমি ভান করেছিলাম—হঠাৎ যেন একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় ব্যাপারটা ঘটে গেছে! কিন্তু পরে বোটের মাঝি-মাল্লারা আমায় বলেছিল যে আমার ওভার কোটে কি যেন বিঁধে আমাকে ধরে রেখেছিল।... গায়ে এই সেই ওভার কোট।"

মাকোফ আবার ভিজে হাওয়ায় হাত বুলিয়ে কাকে যেন আদর করল।

একটা মানুষ—যে সম্পূর্ণ পাগল নয়, অথচ তারই নিজের কল্পনায় তৈরী একটা অদ্ভুত প্রাণীর সঙ্গে পাশাপাশি জীবন কাটাচ্ছে—তাকে যে আমি কি বলব ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইলাম।

"বহুদিন থেকেই এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম," সে বিড় বিড় করে বললে। "তুমি সব কিছুতেই সাহস করে কথা বলো—তাই তোমার কথায় বিশ্বাস করি। বলো—দয়া করে বলো আমাকে—এ সম্বন্ধে তুমি কি মনে কর। ঈশ্বর না শয়তান—মাকড়সা কার কাছ থেকে আসে?"

"আমি জানি না।"

"হয়তো তুমি এ নিয়ে ভেবে দেখবে ··· আমার মনে হয় ও এসেছে ঈশ্বরের কাছ থেকে। তিনি আমার মধ্যে সেই অপরিচিত আত্মাকে পাহারায় রেখেছেন। ও কাজের জন্য কোনো দেবদূত তিনি নিযুক্ত করেননি, কারণ তার যোগ্য আমি নই। দিয়েছেন একটা মাকড়সা—বুদ্ধিমান তিনি। এবং এমন একটা ভয়ানক মাকড়সা! ওর সঙ্গে প্রথমে ধাতস্থ হতে আমার কেটে গেছে দীর্ঘ দিন।"

মাথার টুপিটা খুলে মাকোফ ক্রুশ চিহ্ন আঁকলে এবং গলা নামিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রার্থনা করলে: মহান তুমি—দয়াল তুমি, হে সর্বশক্তিমান, বিচারবুদ্ধির প্রভু ও পিতা তুমি, আত্মার রাখাল।···

এর কয়েক সপ্তাহ পরে, এক জ্যোৎস্নারাতে নিঝনির এক জনবিরল পথে মাকোফের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ফুটপাথ দিয়ে সে হেঁটে চলেছে, একেবারে দেয়াল ঘেঁষে—যেন আর কারুকে যাওয়ার জায়গা করে দিয়েছে।

"এই যে, মাকড়সাটা বেঁচে আছে তো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বৃদ্ধ হাসল এবং ঝুঁকে হাওয়ায় হাত বুলাল। মৃদু কণ্ঠে বলল, "এই তো সে।···"

বছর তিনেক বাদে, ১৯০৫ সালে শুনতে পেলাম—বালাখার কাছাকাছি কোথায় যেন মাকোফের রাহাজানি হয়ে গেছে এবং সে মারা গেছে।

*

সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥ বদরিয়াজিন

লোমশ, একচোখ কানা কবর-খোদাইকর বদরিয়াজিনকে যেদিন আমি তার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত একটা কনসার্টিনা বাজনা উপহার দিলাম্—সে তার ডান হাতটা জোরে বুকে চেপে ধরলে এবং আনন্দের বিদ্যুৎস্পর্শে সেই একটি মাত্র নিঃসঙ্গ, শান্ত এবং কখনো কখনো রহস্যময় হয়ে ওঠা চোখটা তার বুজে এল। 'ওঃ। .' বলে অস্ফুট একটু শব্দ করে উঠল।

তারপর তার আবেগ সামলে টাক-পড়া মাথাটা নাড়তে লাগল এবং এক নিঃশ্বাসে বিড় বিড় করে বললে :

'যাই হোক, আলেক্সি ম্যাক্সিমিচ, এ তুমি নিশ্চয় জেনো, তুমি মরলে তোমার আমি ভাল ভাবে কবরের ব্যবস্থা করবো।'

এমন কি কবর খোঁড়বার সময়েও সে সঙ্গে নিয়ে যেত তার কনসার্টিনা এবং কাজ করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ত তখন সপ্রেমে এবং আস্তে আস্তে বাজাত পোল্‌কা। ওই একটা মাত্র সুর—যা সে বাজাতে পারত। এটাকে কখনো সে বলত 'ট্র্যাং ব্ল্যাং', কখনো বলত 'ডার্ণ ব্লার্ণ।'

একদিন যখন সে এই রকম বাজনা সুরু করেছে—তখন পাশেই গীর্জার এক পাদ্রী একটি অন্ত্যেষ্টির কাজ পরিচালন করছিলেন। তার বাজনা শেষ হলে পাদ্রী তাকে ডেকে পাঠালেন এবং গালাগাল দিলেন।

'মৃতের তুই অসম্মান করেছিস শূয়োর!'

বদরিয়াজিন আমার কাছে এল এবং অনুযোগ করলে। বললে, 'ঠিক, আমি স্বীকার করছি আমি ভুল করেছিলুম। কিন্তু উনি কি করে জানলেন মরা লোকটি অসম্মানিত হয়েছে?"

তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, নরক বলে কোনো জায়গা নেই। তার মতে, দেহের মৃত্যুর পর ধার্মিক লোকেদের আত্মা উড়ে চলে যায় 'পবিত্র স্বর্গে'; আর পাপীদের আত্মা থাকে তাদের দেহের মধ্যেই এবং ওই কবরের মধ্যেই বাস করে যতদিন না পোকায় খেয়ে ফেলে। 'তারপরে, ধরিত্রী তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে আত্মাকে বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে দেয় এবং বাতাস তাকে ছড়িয়ে দেয় ধরা-ছোঁয়ার অতীত ধুলোর অনু-পরমাণুর সঙ্গে।' এই তার ধারনা।

ছ'বছরের মেয়ে নিকোলায়েভা—যাকে আমি কত ভালবাসতাম, তার দেহটা যেদিন কবরে দেওয়া হলো এবং লোকজন সবাই সমাধিভূমি ছেড়ে

চলে গেল, কোসটিয়া বদরিয়াজিন স্তূপ করা মাটিগুলো কোদাল দিয়ে টেনে সমান করতে করতে আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

বললে, 'দুঃখ করো না বন্ধু। বোধ হয় পরলোকে ওরা কথা বলে আমাদের চেয়ে আরও ভালো, আরো আনন্দময় ভাষায়। অথবা হয়তো তারা কোনো কথাই ব্যবহার করে না—শুধু বেহালা বাজায়।'

সঙ্গীতের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল অদ্ভুত এবং তার একটা বিপদের দিকও ছিল। এই সঙ্গীত তার সব কিছু ভুলিয়ে দিত। সে সেনাবাহিনীর বাদ্যিবাজনা হোক অথবা রাস্তায় কোথাও অর্গ্যান কিংবা পিয়ানো বাজুক, সে কান খাড়া করবে এবং যেদিক থেকে সুর ভেসে আসছে সেদিকে গলা বাড়িয়ে দেবে। হাত দুটো পেছনে মুড়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, কাল চোখটা বিস্ফারিত—ঠেলে বেরুনো, যেন ওটা দিয়েও সে শুনতে পাচ্ছে। রাস্তায় থাকলে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটত। এবং এইরকম বিমুগ্ধ, হুঁশিয়ারীতেও বধির ও বিপদ সম্পর্কে অসাবধান হওয়ার ফলে প্রায় বার দুই ঘোড়ার ধাক্কা খেয়ে সে পড়ে গেছে ও বহুবার মারও খেয়েছে কচুয়ানের হাতে।

'যখন আমি কোনো সুর শুনি' সে ব্যাখ্যান করে বলত, 'তখন আমি যেন নদীর তলায় তলিয়ে যাই।'

গীর্জার ধারের এক ভিখারিনী সোরোকিনার সঙ্গে তার একটা হৃদয়গত ব্যাপার ছিল। সোরোকিনা তার চেয়ে বছর পনেরোর বড়, একটা মাতাল বুড়ি—আর ওর বয়স ছিল বছর চল্লিশের ওপরে।

'এ আবার কি?' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

'আচ্ছা, তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কেউ আছে?' সে উত্তর দিয়েছিল। 'আমি ছাড়া কেউ নেই। এবং যার সান্ত্বনা দেওয়ার কেউ নেই তাকে আমি সান্ত্বনা দিতে ভালবাসি। আমার নিজের কোনো দুঃখ নেই—তাই—মানে··· অন্যের দুঃখ দূর করতে আমি সাহায্য করি।'

একটা বার্চ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছিলাম। হঠাৎ জুন মাসের এক পশলা বৃষ্টিতে ভিজে গেলাম। তার টাক-পড়া চাঁদির ওপরে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে থাকায় কোস্টিয়া আনন্দে আত্মহারা। 'মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দিতে আমি ভালবাসি।···' সে বিড়বিড় করে বললে।

পেটের ক্যানসারে সে স্পষ্টতই ভুগছিল—কারণ তাকে ঘিরে কেমন একটা পচা গন্ধ উঠত। খেতে পারত না কিছুই এবং বমির আক্রমণও হয়ে

গেছে। এসব সত্ত্বেও সে কাজ করে যেত অবিচল ভাবে, সমাধিভূমিতে ঘুরে বেড়াত মনের আনন্দে। এবং মারাও গেল তাস খেলতে খেলতে, খেলার সঙ্গী ছিল তার আরও কয়েকজন কবর-খোদাইকর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ শাস্তি

নিঝনির গোয়েন্দা-পুলিস বিভাগের কর্তা গ্রেসনার ছিল একজন কবি। কিছু কিছু সনাতন-পন্থী কাগজে তার কবিতা প্রকাশিত হত! তাছাড়া, যতদূর মনে পড়ে, 'নিভা' এবং 'রোডনাতে'-ও লেখা বেরুতো। সে-সব কবিতা থেকে কিছু কিছু পংক্তি আমার মনে পড়ে:

চুলো থেকে শুঁড়ি মেরে বেরিয়ে আসছে লালসা,
প্রত্যেক বাড়ি থেকেই বেরিয়ে আসছে সে,
কিন্তু যদিও সে আমাদের আত্মাকে বিকলাঙ্গ করে,
তবু জীবন আনন্দময় তখনই যখন সে বিরাজমান। ...
আমার লালসা ছাড়া এত নিঃসঙ্গ বোধ করি আমি।
মানুষ আর পশু না থাকলে পৃথিবীটা হয়তো ফুঁপিয়ে মরতো।

এক সময় সে মেয়েদের একটা এ্যালবামে কয়েক লাইন ইন্দ্রিয়-উত্তেজক কবিতা লিখেছিল—তার শুরুটা এই রকম:

একটি থামের গায়ে, সদর দরজার সামনে
একটা বছর তিনেকের ছেলে দাঁড়িয়ে আছে হেলান দিয়ে,
তার মুখটা আমার কাছে এত পরিচিত,
হা তার ছাই!—সে যে আমিই। ...

এর পরে কিছু অশ্লীল রূপক এবং তুলনা উপমার প্রয়োগ।

গ্রেসনার নিহত হয়েছিল এক উনিশ বছরের যুবকের হাতে—নাম আলেকজাণ্ডার নিকিফোরোভ; বিখ্যাত টলস্টয়-বিশেষজ্ঞ এবং অনুবাদক লিও নিকিফোরোভের ছেলে। লিওর জীবনেও ঘটেছিল একটার পর একটা বিয়োগান্ত ঘটনা। চারটি সন্তানের পিতা তিনি এবং তারা একের পর এক মারা যায়। বড় ছেলে ছিল সোশ্যাল ডেমোক্রাট, কারাগার এবং নির্বাসনে প্রায় নিঃশেষিত হয়ে মারা যায় হৃদরোগে। অন্য একটি ছেলে সর্বাঙ্গে পেট্রোল ঢেলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে জীবন্ত মারা যায়! তৃতীয়টি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। এবং সর্ব কনিষ্ঠ সাশা (আলেকজাণ্ডার) গ্রেসনারকে হত্যা করার জন্য ফাঁসীতে প্রাণ দেয়। গ্রেসনারকে সে প্রকাশ্য দিবালোকেই হত্যা করে রাস্তার মাঝখানে,

গোয়েন্দা-পুলিস অফিসের একেবারে দরজার সামনেই। গ্রেসনার হেঁটে যাচ্ছিল একজন মহিলার হাতে হাত জড়িয়ে। সাশা তার কাছাকাছি গিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'এই পুলিস।...' গ্রেসনার যেমনি ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, সাশা তার মুখে এবং বুকে মারল গুলি।

সঙ্গে সঙ্গেই সাশা ধরা পড়ে এবং তার প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু নিঝনি কারাগারে এমন একটিও আসামী পাওয়া গেল না যে এই ঘৃণ্য ফাঁসী দেওয়ার কাজটার ভার নেবে। শেষ পর্যন্ত পুলিস-প্রধান পোইরেট চিড়িয়াওয়ালা বেদে গ্রিসকা নেরকুলোফকে পঁচিশ রুবল পারিশ্রমিক দিয়ে সাশাকে ফাঁসী দেওয়ার জন্য জোগাড় করলে। এই পোইরেট লোকটি ছিল এক সময়ে গভর্নর বারানোভের রাঁধুনি, যেমন অহংকারী তেমনি মাতাল। নিজেকে চালাত সে বিখ্যাত প্রহসন-নট ক্যারান দ্য' আকের ভাই বলে।

গ্রিসকারও ছিল দারুন পানাসক্তি ; বয়স পঁয়ত্রিশ—লম্বা, পাকাটে পেশী বহুল ; ঘোড়ার মত চোয়ালে চিবুকে অল্প-সল্প দাড়ির কালো গুচ্ছ এবং খোঁচা ভুরুর নীচে তার ঢুলু ঢুলু চোখ দুটি স্বপ্নাচ্ছন্নের মত। নিকিফোরোভকে ফাঁসী দেওয়ার পর সে একটা লাল রঙের স্কার্ফ কিনেছিল। তার লম্বা গলা এবং কণ্ঠার উঁচু হাড়টা তাই দিয়ে সে ঢেকে রাখত। হঠাৎ সে ভদ্‌কা খাওয়া বন্ধ করে দিলে এবং দেখা গেল, বেশ সরস চিত্তাকর্ষক একটা গলা-ঝাড়ানি কাশি সে আমদানি করেছে।

তার বন্ধুরা জিজ্ঞেস করত, "তোমার এত গুমোর বাড়ল কেন গ্রিসকা ?"

জবাবে সে বলত, "সরকারের একটা গোপন কাজে আমি নিযুক্ত হয়েছি।"

কিন্তু একদিন যখন সে ভুলে প্রকাশ করে ফেললে যে সে একটা মানুষকে ফাঁসী দিয়েছে, তখন তার বন্ধুরা তাকে গাল পাড়তে সুরু করলে। এমন কি ঘা কতক বসিয়েও দিলে। এরপর সে গোয়েন্দা-পুলিসের প্রধান কেভদিনের কাছে এক আবেদনপত্র পাঠিয়ে প্রার্থনা করল যে, তাকে লাল রঙের কোট এবং লাল ডোরা-কাটা পাৎলুন পরবার অনুমতি দেওয়া হোক।

সে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে লিখলে, "যাতে জনসাধারণ বুঝতে পারে যে আমি কে এবং যেহেতু আমি একজন সরকারী ফাঁসুড়ে, তাই তারা আর তাদের নোংরা হাত আমার উপরে তুলতে সাহস পাবে না।"

আরও কয়েকজন খুনেকে ফাঁসি দেওয়ার ব্যাপারে কেভদিন তাকে কাজে লাগিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত গ্রিসকা চলে গেল মস্কো, সেখানে গিয়েও কাকে

যেন ফাঁসি দিলে। ফিরে এলো সে নিজের সম্বন্ধে একটা সুগভীর গুরুত্বপূর্ণ বোধ নিয়ে। কিন্তু নিঝনিতে ফিরে এসেই সে ছুটল আগে ডাক্তার স্মিরনফের সঙ্গে দেখা করতে। এই ডাক্তারটি ছিলেন একজন অলৌকিক-তত্ত্বে বিশ্বাসী এবং 'ব্ল্যাক হানড্রেডের'* একজন সদস্য। গ্রিসকা ডাক্তারকে জানালে যে, তার বুকের কাছে এমন একটা হাওয়ার বুদ্বুদ ওঠে—যেটা নাকি তাকে একেবারে আকাশ পর্যন্ত ঠেলে তুলতে পারে।

"এর ক্ষমতা এত ভয়ানক যে মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য আমাকে রীতি-মতো চেষ্টা করতে হয় এবং আমাকে কোনো কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে হয় —যাতে করে আমি লাফালাফি না করি এবং লোকে যাতে আমাকে দেখে না হাসে। বিশেষ একটা নচ্ছারকে ফাঁসি দেওয়ার পর থেকেই এই রকম ঘটনা প্রথম ঘটে। হঠাৎ কি একটা যেন আমার বুকের মধ্যে নড়েচড়ে উঠল এবং আমার ভেতরে সেটা ফেঁপে উঠতে সুরু করল। সেটা এখন এতদূর পর্যন্ত বেড়েছে যে আমি ঘুমোতে পর্যন্ত পারি না। রাত্রে আমি ছাদের তলায় গিয়ে ঠেকে যাই। আমি বুঝতে পারছি না—এই নিয়ে আমি কি করি। পোশাক-আসাক যা আছে সব আমি গায়ে জড়াই এবং যত পকেট আছে—সব, এমন কি হাতা পর্যন্ত ইটের টুকরো দিয়ে ভর্তি করি—যাতে করে ভার বাড়ে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। বুকে, পেটে টেবিল চাপিয়ে চেষ্টা করে দেখেছি, খাটের সঙ্গে পা বেঁধে দেখেছি—কিন্তু সে-ই আমি উপরে ঠেলে উঠি। দোহাই আপনার, আমাকে অপারেসন করে দেখুন এবং ভেতরের বাতাসটা বার করে দিন। তা নাহলে মাটিতে আমি আর বেশীদিন আদৌ থাকতে পারব না।"

ডাক্তার তাকে একজন স্নায়ুবিদের কাছে যেতে উপদেশ দিলেন কিন্তু গ্রিসকা চটে বললে, "এ সব হচ্ছে আমার বুকের মধ্যে, আমার মাথা থেকে নয়।..." এর অল্প কিছুদিন পরে সে একটা ছাদের ওপর থেকে পড়ে যায় এবং তার মেরুদণ্ড আর মাথার চাঁদি একেবারে ভেঙে চৌচির হয়ে যায়। মৃত্যু শয্যায় শুয়ে সে বারবার ডাক্তার নিফন্ট ডোলগোপোলফকে জিজ্ঞেস করেছে, "আমার শব-যাত্রায় ব্যাণ্ডের বাজনা দেবে তো?"

মৃত্যুর মুহূর্ত কয়েক আগে সে বিড় বিড় করে বলেছিল, "আ-বা-র সেই! আমি ওপরে ঠেলে উঠছি।"...

* প্রতিক্রিয়াশীল গোঁড়া জাতীয়তাবাদী পার্টি।

নবম পরিচ্ছেদ ॥ ভাগ্যের উৎস সন্ধানে

স্টেপান প্রোখোরফ ছিল সেস্‌ত্রোরিৎস্ক স্নানাগারের একজন কর্মী—বছর ষাটেকের মতো বয়স হবে, দিব্যি চমৎকার শক্তিমান বৃদ্ধ। পুতুলের মতো ঠেলে বেরিয়ে আসা দুটো চোখ—চারদিকের সংসারের সব কিছু লক্ষ্য করতে করতে সে চোখে কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টি ঘনিয়ে উঠত। যদিও সে দৃষ্টিতে একটু বেশী উজ্জ্বলতা ও কাঠিন্য দেখা যেত—তবু তা ছিল শান্ত, এমন কি সহৃদয় খুশিতে ভরা। সকলের মধ্যেই এমন একটা জিনিস যেন সে দেখছে যা সহানুভূতির যোগ্য।

এমন ভাবে সে মানবতার সেবা করছে যেন সে হলো সমস্ত মানুষের মধ্যে বিজ্ঞতম। সতর্ক পদক্ষেপে সে ঘোরাফেরা করে এবং কথা বলে গলা নামিয়ে—যেন তার চারদিকের লোকজন সব ঘুমিয়ে পড়েছে এবং তাব মতলব নেই তাদের জাগিয়ে দেওয়ার। সে ছিল অবিচল এবং অশ্রান্ত কর্মী এবং অন্যের কাজের ভার নিতেও সদাপ্রস্তুত। স্নানাগারের কর্মচারীদের মধ্যে কেউ যদি তার কোনো কাজ কবে দিতে বলতো, অল্পকথার মানুষ প্রোখোরফ সঙ্গে সঙ্গে রাজি। "বেশ তো ভায়া", সে বলত, "বেশ তো। আমি করে দেবো, ও নিয়ে তুমি ভাবনা ক'রো না।"

কতগুলো অলস মানুষকে যেন করুণা বিতরণ করছে এই ভাবে সে অন্যের কাজ করে দিত, কোনো বৈরীভাব বা দম্ভ ছিল না তার মধ্যে।

লোকজনের সঙ্গে সে মেলামেশা করত না—এটা তার অভ্যাস, থাকত একা একা। কি কাজের সময় আর কি অবকাশে, আমি তাকে তার সহকর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনায় দেখিনি বললেই চলে। তার সম্পর্কে অন্যদের খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তবে আমার বিশ্বাস—তারা ওকে খুব চতুর ভাবত না। আমি যখন তাদের জিজ্ঞেস করতাম—প্রোখোরফ লোক কেমন, তারা জবাব দিত, "ওঃ, তার সম্পর্কে অসামান্যতা কিছু নেই।" কিন্তু একবার হোটেলের এক পরিচারক একটু ভেবে, পরে বলেছিল, "একটু গর্বিত, কড়া ধাতের বুড়ো।"

এক সন্ধ্যায়, আমার ঘরে প্রোখোরফকে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণে আসতে বললাম। একটা শস্যাগারের মত বড় ছিল আমার ঘরটা, ঘরকে গরম রাখার বাষ্পীয় ব্যবস্থা আছে, পার্কের দিকে বড় বড় দুটো ভিনিসীয় কেতার জানালা। (প্রতিদিন রাত নটার সময় বাষ্পের পাইপটা এমন ভাবে শাঁ

শাঁ আর ঘড়্ঘড়্ করতো—যেন কে একঘেয়ে শব্দে ফিসফিসিয়ে বলতো : "তোমার কিছু রবার আছে ?"—"মাছ কি ভাল খানা ?")

বৃদ্ধ এল, দিব্যি ছিমছাম ভাবে সাজগোছ, গোলাপী রঙের নতুন সূতীর সার্ট গায়ে, পাঁশুটে রঙের প্যান্ট এবং জমাট পশমের নতুন জুতো। লালচে রঙের চওড়া দাড়ি সযত্নে বুরুশ করা এবং মাথায় পাকা চুলে কোনো মলম মাখিয়ে চিকন্ করা—যা থেকে কড়া ভুরভুরে একটা গন্ধ উঠছে। গম্ভীর ভাবে চায়ে সে চুমুক দিলে এবং আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

"আমার যে দয়ামায়া আছে", সে বললে, "এ তো তুমি ভালভাবে লক্ষ্য করেই দেখেছ এবং সঠিক বিচারই করেছ। তবে অন্য সকলের মতই, আমি জন্মেছি এবং জীবনের অর্ধেক ভাগ বেঁচেছি অন্য সম্পর্কে কোনো পরোয়া না করেই—এ কথা অবশ্য আমার স্বীকার করে নেওয়া ভাল। শুধু ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাবার পরই আমি দয়ালু হতে পেরেছি।

"ব্যাপারটা ঘটেছিল একটানা সাফল্যের একটা জীবন কাটাবার পর। জন্মের দিন থেকেই ভাগ্য আমাকে অনুগ্রহ করেছে। আমার বাবা ছিলেন মজেনেস্ক-এর এক তালাচাবি তৈরীর কর্মকার। তিনি বলতেন—'স্টেপান্কা জন্মেছে সৌভাগ্য নিয়ে।' কারণ আমার জন্মের বছরেই তাঁর ব্যবসার বাড়বাড়ন্ত এতটা হয়েছিল যে, তিনি নিজস্ব একটা কারখানাই খুলতে পেরেছিলেন।

"খেলাধুলোতেও আমি ছিলাম সৌভাগ্যবান, আর লেখাপড়া ছিল আমার কাছে ছেলেখেলার মত। আমাব কখনো কোনো অসুখ বা কোনো ধরনের অসুবিধে হয় নি। যখন আমি স্কুলের লেখাপড়া শেষ করলাম, তার পরে পরেই এক সৎ ও দয়াবান লোকের জমিদারী সেরেস্তায় একটা কাজ পেয়ে গেলাম। আমার কর্তা আমাকে ভালবাসতেন এবং তাঁর স্ত্রী বলতেন, 'তোমার ক্ষমতা আছে খুব স্টেপান ; সে সম্পর্কে সতর্ক থেকো।' তা সত্যি : আমার এমন সব অসাধারণ গুণ ছিল যে আমি নিজেই অবাক হতাম এই ভেবে, তা কোথা থেকে এল। এমন কি আমি ঘোড়ার চিকিৎসা পর্যন্ত সুরু করে দিলাম—যদিও রোগের কারণ সম্বন্ধে কোনো ধারনাই আমার ছিল না। শুধু দয়া দেখিয়ে এবং বেত লাঠি ব্যবহার না করেই কুকুরকে তার পেছনের দু'পায়ে হাঁটাতে পারতুম।

"মেয়েদের সম্পর্কে—ভাগ্যবান ছিলুম সেখানেও ; যে মেয়ের দিকে একবার তাকাতুম আমার কাছে সে আসতই, বিফল হতুম না।

"আমি প্রধান গোমস্তা হয়েছিলাম ছাব্বিশ বছর বয়সে এবং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই ছিল না যে, সহজেই আমি সেরেস্তার ম্যানেজার হতে পারবো। মিস্টার মার্কেভিচ, তোমার মতই একজন লেখক ছিলেন—উল্লসিত হয়ে উঠতেন প্রায়ই। তিনি জোর গলায় বলতেন, 'প্রোখোরফ সত্যিকারের একজন রাশিয়ান, দ্বিতীয় একজন পারসোভ।' পারসোভ কে ছিলেন আমি জানি না, তবে মিস্টার মার্কেভিচ লোকজন সম্পর্কে সাধারণত খুব কড়া সমালোচক ছিলেন। এবং তাঁর প্রশংসা তামাসা ছিল না। নিজের জন্যে আমি খুবই গর্বিত ছিলাম—এবং সবই আমার দিব্যি চলে যাচ্ছিল। বিয়ে করবো বলে অল্প কিছু টাকা আমি আলাদা ক'রে রেখেছিলাম—কারণ একটি সুন্দর ও যোগ্য তরুণী পাত্রী আমি খুঁজে পেয়েছিলাম। এই সময়ে হঠাৎ, প্রায় বুদ্ধির অগোচরে, আমার বোধ হলো—যেন সাংঘাতিক একটা বিপদ আমাকে আক্রমণ করতে আসছে। ভারি অদ্ভুত একটা জিজ্ঞাসা আমাকে আগুনের মত পোড়াতে লাগল: সব বিষয়েই আমি সৌভাগ্যবান হবো কেন? কেন আমি এই ভাবে আনুকূল্য পেয়ে যাব?—এই সব প্রশ্ন মাথায় অনবরত জ্বলতে লাগল এবং আমাকে রাতের পর রাত জাগিয়ে রাখল।

"কখনো কখনো সারাদিনের কাজের পরে লাঙলটানা ঘোড়ার মতো পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তাম। শুয়ে পড়তাম এবং বড় বড় চোখ করে ভাবতে থাকতাম। এত সৌভাগ্য আমার কেন? অবশ্যই আমার ক্ষমতা আছে; ধর্মভীরু মানুষ আমি, অনুদ্ধত ও সংযত, বোকা নই। অথচ, আমার চারদিকে এমন সব লোকজনকে দেখি যারা সব দিক দিয়েই আমার চেয়ে ভালো কিন্তু ভাগ্য তাদের জন্যে প্রসন্ন হাসি হাসে না। এ তো সম্পূর্ণ সত্যি।

"এইভাবে আমি, ভাবতুম আর ভাবতুম—ঈশ্বর কেমন করে এটা হতে দিচ্ছেন। এই যে আমি এখানে আছি, এক ভাঁড় মধুর মধ্যে মাছির মতো দিব্যি সুখে আছি এবং এমন লোক কে আছে যে আমার ক্ষতি করতে পারে? ধারনাটা আমার মনে ক্রমাগত ঘা দিতে লাগল। আমার বোধ হতো—আমার জীবনের এই সাফল্যের পেছনে কোনো একটা রহস্যময় ব্যাপার আছে, কোন একটা যাদু কাজ করছে। কিন্তু কোন্ উদ্দেশ্যে? বার বার আমি ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করতুম—কি তাঁর উদ্দেশ্য হতে পারে, কোন দিকে আমাকে তিনি নিয়ে চলেছেন?

"কিন্তু ঈশ্বর নীরব··· উত্তরে তিনি একটা কথাও বললেন না।

"তারপর আমি মনস্থির করে ফেললাম। ভাবলাম—যদি কিছু বেইমানী আমি করি—তাহলে কি ঘটতে পারে? সেই মতো আমি চারশ' কুড়ি রুবল্ দেরাজ থেকে সরিয়ে নিলাম, এটা জেনেই নিলাম যে তিনশ' রুবলের বেশী চুরি করলে কঠিন দণ্ড পাওনা। যাই হোক, টাকাটা তো সরালাম। বলা বাহুল্য, এই খোয়া সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ল। ম্যানেজার ফিলিপ কার্লে'াভিচ সহৃদয় মানুষ, টাকার ব্যাপার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। কারণ টাকাটা আমি এমন ভাবে চুরি করেছিলাম যে আমাকে ছাড়া আর কারুকে সন্দেহ হতে পারে না। দেখলাম ফিলিপ কার্লে'াভিচ হাঙ্গামে পড়েছেন এবং ঘাবড়ে গেছেন। যাক—মনে মনে বললাম, ভালো লোকটাকে যন্ত্রণা দিয়ে লাভ কি? তাই আমি বললাম—'টাকাটা আমিই চুরি করেছি।' তিনি আমাকে বিশ্বাস করলেন না; ভাবলেন—আমি ঠাট্টা করছি। শেষ পর্যন্ত যাই হোক, বিশ্বাস না করে তাঁর আর পথ ছিল না। সেইভাবে তিনি আমার কর্তার স্ত্রীকে আমার জবানী জানিয়ে দিলেন। শুনে তিনি তো অবাক এবং শংকিত। 'তোমার কি ব্যাপার স্টেপান?'—তিনি শুধোলেন। জবাবে বললাম, 'আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে ধরিয়ে দিতে পারেন।' তিনি লজ্জিত হলেন এবং চটে গেলেন, ঘাবড়ে গিয়ে তাঁর জামার প্রান্ত টানতে লাগলেন। বললেন, 'তোমাকে আমি ধরিয়ে দিচ্ছি না। কিন্তু তোমার ব্যবহার যে অত্যন্ত নির্লজ্জ—এ তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে।'

"আমি স্বীকার করলাম এবং ওদের বাড়ি ছাড়লাম। চলে গেলাম মস্কোয়—আমার নামোল্লেখ না করে টাকাটা ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম।"…

"এ কাজ তুমি কেন করেছিলে?" বৃদ্ধকে আমি জিজ্ঞেস করলাম। "দুর্ভোগ ভোগ করতে চেয়েছিলে?"

তার মোটা ভুরু দুটো তুললো সে সবিস্ময়ে—এবং হাসলো দাড়ির অন্তরালে। মাথার কোঁকড়া চুলে হাত বুলোতে বুলোতে হাসি তার মিলিয়ে গেল।

"মানে—না, নিশ্চয়ই না। কেন আমি দুর্ভোগ চাইব? আমি শান্তির জীবন পছন্দ করি। আমাকে পেয়ে বসেছিল সেই কৌতূহল। আমার সৌভাগ্যের রহস্য সন্ধানের জন্য আমি হা-পিত্যেশ করেছিলুম। আমার সৌভাগ্য কতটা পাকাপোক্ত হতে পারে তা যাচাই করার একটা আকাঙ্ক্ষা —এবং হুঁশিয়ার হওয়া, বোধ করি এই রকম একটা চেতনা আমাকে তাগিদ

দিয়েছিল। বলা বাহুল্য, বয়স আমার অল্প, যেন খেলছিলুম—নিজের সঙ্গেই এ এক খেলা। যদিও, বাস্তবিক পক্ষে আমি যা করে ফেলেছিলাম তা আমার কাছে খেলা ছিল না—অর্থাৎ শুধু খেলা মাত্র নয়। আমার জীবন এমনি বৈচিত্রহীন ছিল—কোলের পোষা ছোট্ট কুকুরটির মতো আমি বেঁচে ছিলাম প্রেমে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে। আমার চারপাশের লোকজন ভ্রূকুটি করছে, অভিযোগ করছে—আর আমি যেন ঈশ্বরের অভিশাপে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একটা শান্ত জীবন কাটিয়ে যাব। প্রত্যেকেরই লড়াই করবার মতো ঝঞ্ঝাট আছে, গোলমাল আছে, আর আমার তেমন কিছুই ছিল না। স্বাভাবিক মানুষের মতো ওই জিনিসগুলো পাওয়ার উপযুক্ত যেন আমি ছিলাম না। আমার মনে হয়—ব্যাপারটা এইরকম একটা কিছু ছিল।...

"মস্কোর এক হোটেলে আমার ঘরে শুয়েছিলাম আর নিজেকে বলছিলাম—একটা রুবলের জন্যে অন্য যে কোনো লোক হয়তো পুলিসের হাতে পড়ত। আর আমি চারশ' রুবল চুরির পরও আমার কিছু হলো না। কপাল খারাপের এই একটা নজির শেষ পর্যন্ত। আমার হাসি পেল।

"'না', মনে মনে ভাবলাম, 'একটু তুমি সবুর করো স্টেপান।' আমি হোটেলের লোকজনদের লক্ষ্য করতে লাগলাম। ওটা ছিল একটা নোংরা গর্ত এবং তার বেশীর ভাগ লোকই ছিল শানওয়ালা, অভিনেতা এবং হত-ভাগিনী কিছু স্ত্রীলোক। একটি লোক ভান করে দেখাত যে, সে ছিল রাঁধুনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ল—সে একটা জাত-চোর। আমি তার সঙ্গে কথাবার্তা সুরু করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার চলছে কেমন?' সে বললে, 'এই—এক রকম। ব্যবসায় উঠাত পড়তি আছে তো।' আমরা যখন আরও অন্তরঙ্গ হলাম—সে কিছুটা প্রাণখোলা হলো। 'আমার মাথায় একটা মতলব আছে,' সে প্রকাশ করলে, 'কিন্তু তার জন্যে কিছু ভাল যন্ত্রপাতি চাই—দামী জিনিস সব এবং কিন্তু আমার কোনো টাকা পয়সা নেই।' 'আহা'—আমি ভাবলাম, 'শেষ পর্যন্ত এই তো পেলাম।' জিজ্ঞেস করলাম, 'কারুকে মেরে টেরে ফেলার ব্যাপার কি?' আমার প্রশ্নে মনে হল সে রাগ করলে। 'ঈশ্বর না করুন,' সে বললে, 'আমার নিজের মাথাটাকে খুবই আমি মূল্যবান মনে করি।'

"যাই হোক, আমি তাকে যন্ত্রপাতি কেনার টাকা দিলাম—এই শর্তে যে, আমাকে সে তার সঙ্গে নেবে। সে মুখ বাঁকাল এবং আমার কথার ভাবে

সংকুচিত হয়ে গেল কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজি হলো। তার দুঃসাহসিক কাজকে আমি মোটেই পছন্দ করি নি। আমরা একটা বাড়িতে গেলাম এবং ভান করলাম—যেন দেখা করতে এসেছি। বাড়িতে কোনো লোকজনের দেখা পেলাম না। বেশ সুন্দর মতো একটি মেয়ে দরজা খুলে দিল—স্পষ্ট বুঝলাম, মেয়েটি এই লোকটির বান্ধবী। সঙ্গে সঙ্গে সে খুব নিপুণভাবে তার হাত-পা বেঁধে ফেললে এবং থালা-বাসনের আলমারি হাতড়াতে সুরু করে দিলে—এই সঙ্গে চললো তার শিস্ দেওয়া। সবটা এত সহজ—তাই না? কোনো হাঙ্গামা ছাড়াই আমরা যেমন এসেছিলাম তেমনি চলে গেলাম। পরে অল্প-দিনের মধ্যেই লোকটি মস্কো থেকে গা-ঢাকা দিলে এবং আমার দিন কাটতে লাগল আবার শুধু নিজেকে নিয়ে।

"চুরির ব্যাপারটা তা হলে এই, মনে মনে ভাবলাম। আবার সেই ভাগ্য। সবটা ছিল খুব মজার এবং সেই সঙ্গে ক্ষেপিয়ে দেওয়ার মতো।

"যাই বলো—স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি কিনা আমার কাণ্ডকারখানা সবই দেখতে পাচ্ছেন সেই ঈশ্বরের উপরে এবং নিজের ওপরে অত্যন্ত বিরূপ হয়ে এক রাতে চলে গেলাম থিয়েটার দেখতে। ঝোলা বারান্দার এক আসনে গিয়ে বসেছিলাম—সহসা চোখে পড়ল, সেই সুন্দর মতো মেয়েটি, যার হাত-পা আমরা বেঁধেছিলাম। একটা আসনের পরেই বসেছিল সে, মঞ্চের দিকে তাকিয়ে ছিল এবং রুমাল দিয়ে চোখ মুছছিল।

"দুই অংকের মাঝামাঝি এক বিরাম সময়ে আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম। তাকে বললাম, 'আমার মনে হয়—পরস্পরকে আমরা চিনি।' বোধ হয় তার কথা বলার ইচ্ছে ছিল না—তবু দু-একটা কথা তাকে মনে করিয়ে দিলাম।

"সে বলে উঠল, 'ইস্—চুপ করবে?'

"আমি বললাম, 'চেঁচাচ্ছ কেন?'

"সে বলল, 'রাজকুমারের জন্যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।' (মঞ্চে জনৈক রাজ-কুমারের ওপর তখন খুব অসদ্ব্যবহার করা হচ্ছিল।) অভিনয় শেষে আমার সঙ্গে সে এক পানশালায় গেল। ওখান থেকে তাকে নিয়ে গেলাম আমার ঘরে এবং প্রেমিক-যুগলের মত আমরা একসঙ্গে বাস করতে লাগলাম।

"আমাকে সে জাত-চোর বলেই মনে করেছিল এবং প্রায়ই জিজ্ঞেস করত—হাতে কোনো নতুন কাজ আছে কিনা।

" 'না, কিছু নেই,' আমি জবাব দিতাম।

"'আচ্ছা, আমি কয়েকজনের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব।' আলাপ সে করিয়ে দিলে এবং চোর হলেও তাদের খুব ভালো লোক বলেই মনে হলো—সব ক'জনকেই। তাদের মধ্যে বিশেষ করে একজন কোস্টিয়া বাসমাকফ, প্রকৃতির চমৎকার এক সন্তান, পুরোপুরি নিরীহ, উজ্জ্বল হাসিখুসি মেজাজের মানুষ। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠল।

"একদিন তাকে সব খুলে বললাম: 'যাহোক, ওই ধরণের জীবন বাস্তবিক আমি চাইনি এবং কৌতূহল বশেই আমি চোর হয়ে গিয়েছিলাম।'

"'আমরাও তাই,' সে বললে। 'শুধু সাহস দেখাতে গিয়ে এই বৃত্তিতে এসে পড়েছি। পৃথিবীতে এত সব সুন্দর জিনিস আছে এবং বেঁচে থাকাও তো একটা পরম লাভ। মাঝে মাঝে রাস্তায় আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়: বন্ধুগণ শোন—আমাকে ধরো, আমি একটা চোর।'

"অদ্ভুত মানুষ ছিল সে। একদিন সে পুরোদমে ছোটা এক ট্রেন থেকে দিলে লাফ এবং ফলে হাতটি ভাঙলো, পরে তাকে ধরল ক্ষয়রোগ এবং ঘোড়ার দুধ—'কুমিস' খেয়ে রোগ সারাতে চলে গেল প্রান্তরের দেশে।*

"চোদ্দ মাস ধরে বাকি তিনজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কেটে গেল আমার। ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে সিঁধ দিলাম, ট্রেনে ট্রেনে চুরি করলাম এবং আমি সব সময়ে প্রতীক্ষা করে রইলাম—পরের দিনই হয়তো বিস্ময়কর এবং সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে যাবে। কিন্তু আমাদের সব উৎকট প্রয়াস ঘটে যেতে লাগল দিব্যি অবলীলায়।

"আমাদের দলনায়ক মিখাইল পেট্রোভিচ বোরোখফ বেশ মগজওয়ালা সম্মানীয় লোক, একদিন আমাদের সকলকে ডেকে জড়ো করলে। 'আমাদের কপাল খুলে গেছে,' সে বললে, 'যেদিন থেকে স্টেপান আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।' ওই কথাগুলো আমার চৈতন্যোদয় ঘটিয়ে দিলে। আমার সে-ই পুরানো চিন্তায় ফিরে এলাম—যে উত্তেজনার জীবন কাটাচ্ছিলাম তাতে কিছু দিনের জন্য ওটা বিদায় হয়েছিল বটে। সবিস্ময়ে আমি ভাবলাম: এখন কি করা যায়? আমি কি খুন করবো?

"এই চিন্তা একটা কাঁটার মতো আমার মনের মধ্যে কাজ করতে লাগল। আমি তার থেকে রেহাই পেলাম না; ওটা যেন আমার ভেতরে বিঁধে গেছে

* সোভিয়েতের অন্তর্গত ইওরোপ ও এসিয়ার মধ্যবর্তী বিরাট প্রান্তর-বহুল দেশ।

এবং আমাকে বিষিয়ে তুলছে। আমি রাত্রে বিছানায় বসে থাকতাম, হাঁটুর দুপাশে হাত ঝুলিয়ে দিয়ে ভাবতাম: 'এ সম্পর্কে কি বলতে চাও ঈশ্বর? কেমন করে জীবন কাটাই এ তুমি পরোয়াও করো না। এই যে আমি, তৈরী হচ্ছি একটা মানুষকে মারবার জন্য—আমারি মত একটা মানুষ। এটা খুব সহজই হবে।'

"কিন্তু ঈশ্বর কোনো উত্তর দিলেন না।"...

বৃদ্ধ প্রোখোরফ গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে এবং রুটিতে জ্যাম মাখাতে লাগল।

"তুমি অহংকারী মানুষ।" আমি বললাম।

আবার তার মোটা লোমশ ভুরু তুলে গভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার পুতুলের মতো চোখ দুটো মনে হলো শূন্যতায় ভরে গেল, তবু একটা কুৎসিত দীপ্তি যেন তাতে ঝলকে উঠল।

"না; কেন আমি অহংকারী হব?" জ্যাম যাতে না লাগে, সাবধানে তার দাড়ি সামলাতে সামলাতে সে জবাব দিলে। "আমার মনে হয়—মানুষের গর্ব করার কিছুই নেই।"

তার সেই লোমশ মুখের ভেতরে সাবধানে ছোট ছোট রুটির টুকরো কয়েকটা ফেলে দিয়ে, মৃদুকণ্ঠে আগের মতো বলে চললো। যার কথা সে বলছে—সে যেন অচেনা কোনো মানুষ, যার সম্পর্কে তার কোনো পরোয়া করার নেই।

"হ্যাঁ, ..." সে বললে, "ঈশ্বর তো নীরব রইলেন। এবং অল্পদিনের মধ্যে একটা চিত্তাকর্ষক সুযোগ এসে গেল। রাত্রিতে এক গ্রামের বাড়িতে আমরা ঢুকে পড়লাম এবং কাজে লেগে গেলাম। এমন সময় হঠাৎ অন্ধকারে কোথা থেকে একটা ঘুম জড়ানো মিহি গলার শব্দ শুনতে পেলাম। 'কাকু, ওখানে কি তুমি?' সে চেঁচিয়ে উঠল। আমার বন্ধু বাইরের বারান্দায় লাফিয়ে পড়ল, কিন্তু আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম এবং একটা দরজা দেখতে পেলাম—তার পেছনে কে যেন নড়া-চড়া করছে। দরজাটা অল্প একটু খুললাম এবং দেখতে পেলাম—এক কোণায় বছর বারো বয়সের একটা ছেলে বিছানায় শুয়ে আছে এবং মাথা চুলকোচ্ছে—এত লম্বা লম্বা চুল তার। আবার সে জিজ্ঞেস করলে: 'কাকু—ওখানে কি তুমি?' আমি তাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম এবং অনুভব করলাম—আমার হাত পা কাঁপছে, আমার বুক ধড়ফড় করছে। এই আমার সুযোগ!

"নিজেকে বললাম, 'এবার—স্টেপান, এইবার—কাজ শেষ করো।' কিন্তু সময় মতো নিজেকে দমন করলাম। ভাবলাম, না—সে চেষ্টা আমি করব না, নিশ্চয়ই না। বোধ হয় ঈশ্বর সৌভাগ্যের সমস্ত বছরগুলো ধরে এই পাপের জন্যই আমাকে লোভ দেখিয়ে আসছে। একটা নিরীহ বাচ্চাকে খুন! আমার পথ যেখানে এসে শেষে হয়েছে—সেই গর্তে আমাকে তুমি টেনে এনেছ ঈশ্বর। না, না, না!

"এই ধারনাটা আমাকে এমন প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ করে তুলল যে, কখন আমি সেই বাড়িটা থেকে চলে এলাম, এবং কখন আবার বনের ধারে ফিরে গেলাম—জানতেই পারি নি। কিছুক্ষণ পরে দেখি, একটা গাছের তলায় বসে আছি এবং আমার বন্ধু আমার পাশে বসে বসে সিগারেট টানছে আর নিজের মনে মৃদু কণ্ঠে দিব্যি গালছে। ঝির্‌ঝিরে একটু বৃষ্টি পড়তে লাগল মাথার ওপরে, গাছপালায় তীব্র ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ। এবং যেন দেখতে পেলাম চোখের সামনে, অন্ধকারে, সেই ঘুম জড়ানো বাচ্চাটা—একেবারে অসহায়, আমার মুঠোর মধ্যে। কয়েকটা মুহূর্ত আর ··· এবং ছেলেটা আর থাকতো না। উঃ!···

"ওই চিন্তাটা আমাকে এমন জোরে আঘাত করল যে আমার মনে হলো, আমিই যেন সেই অসহায় ছেলেটা। মনে মনে বললাম নিজেকে, এই যে তুমি বসে আছ চুপচাপ, একটা মুহূর্তে কি তুমি করতে পারতে জানো না এবং তেমনি জানো না—কি তুমি করতে পার নি। হঠাৎ, ওই রকম সব অদ্ভুত চিন্তা ভিড় করে এল—আসে না ওই রকম?—হঠাৎ আসা সব চিন্তা ··· তুমি বাঁচবে আমার জন্যে, আমি বাচব তোমার জন্যে। পরস্পরের একি অসহায়তা! আর তাছাড়া—আমাদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত করে কে?

"সকালে আমি শহরে ফিরলাম এবং সোজা চলে গেলাম জজসাহেব মিঃ সৃভিয়াতুখিনের কাছে।

"আমি তাঁকে বললাম, 'দয়া করে আমাকে গ্রেপ্তার করুন স্যার—আমি একটা চোর।' লোকটি ভালো মানুষ বলে জানে সবাই, খুব শান্ত এবং রোগা রোগা, শুধু একটু বোকা বোকা মনে হয় অবশ্য।

" 'কেন তুমি ধরা দিচ্ছ?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন। 'তুমি কি তোমার সঙ্গীদের সঙ্গে ঝগড়া করেছ নাকি? বোধ করি ভাগাভাগি নিয়ে গণ্ডগোল?'

" 'আমার কোনো সঙ্গী ছিল না।' আমি বললাম। 'আমি একাই কাজ করতাম।' খুব বোকার মতই আমার জীবনের সমস্ত কাহিনী বললাম

তাঁকে—এই যেমন তোমাকেও এখন বলছি। কী নিষ্ঠুর খেলা ঈশ্বর আমার সঙ্গে খেলেছেন—বললাম তাঁকে।”

“কিন্তু ঈশ্বর কেন স্টেপান,” আমি বাধা দিয়ে বললাম, “শয়তান নয় কেন?”

প্রশান্ত আত্মার সঙ্গে বৃদ্ধ প্রোখোরফ ব্যাখ্যা করে বললে: “শয়তান বলে কিছু নেই, শয়তান হলো ধূর্ত মনের আবিষ্কার—নিজেদের নীচতার সাফাই গাইবার জন্য মানুষই তাকে সৃষ্টি করেছে; কিছুটা ঈশ্বরের সুবিধের জন্যও বটে—কারণ তাঁকে আর দুর্নামের ভাগী হতে হবে না। শুধু আছেন ঈশ্বর—এবং মানুষ, আর কিছু নেই। শয়তানের সমতুল্য আর যত আছে—যীশুর বিশ্বাসঘাতক জুডা, ভ্রাতৃহন্তা, জার, আইভান দি টেরিবল—এরা সবাই মানুষের আবিষ্কার,—সহস্রের সঞ্চিত পাশবতা ও পাপ যাতে একটা লোকের উপর চাপানো যায়, তার জন্যেই সৃষ্টি। বিশ্বাস করো—এটা তাই। হ্যাঁ, আমরা শয়তান পাপীর দল আমাদের পাপের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি এবং পরে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করি, আমাদের চেয়ে আরও খারাপ কে আছে—অল্প কথায়, শয়তান। আমরা খারাপ—এটা বুঝতে পারি কিন্তু খুব বেশী খারাপ নয়; আমাদের চেয়ে আরও খারাপ লোক আছে।…

“কিন্তু তোমাকে আমি জজসাহেবের কথা বলছিলাম। তাঁর ঘরের দেয়ালে কয়েকটি ছবি ঝুলছিল এবং ঘরটিও বেশ রুচিসম্মত এবং সাবলীল করে সাজানো। মুখে তাঁর দয়ার ভাব, যদিও ওতে কিছুই বোঝায় না—কারণ পচা মাল ভালো বিজ্ঞাপনে বিকিয়ে যায়। যাই হোক, আমি যখন তাঁকে আমার কাহিনী বলে যাচ্ছিলাম তখন আমাদের মাথার ওপরে, ওপরতলায় কেউ বুঝি জোরে জোরে পিয়ানো বাজাচ্ছিল, শব্দটা কর্কশভাবে কানে এসে লাগছিল। মনে মনে বললাম, ওই দেখ ঈশ্বর, সব কিছু নিয়ে কি তালগোল তুমি পাকাচ্ছ।

“অনেকক্ষণ ধরে আমি কথা বলছিলাম এবং গীর্জায় বুড়িরা যেমন পাদ্রীর কথা শোনে জজসাহেবও তেমনি আমার কথা শুনছিলেন। কিন্তু বুঝতে তিনি পারলেন না কিছুই।

“ ‘অবশ্যই তোমাকে গ্রেপ্তার করবো,’ তিনি বললেন। ‘এবং তোমার বিচার হবে। কিন্তু তুমি আমাকে যা সব বললে সে সব জুরিদের কাছে বললে তুমি যে খালাস পাবে—এমন কথা তোমাকে দিতে পারি না।’ তিনি আরও বললেন, ‘তোমার সামনে জেল দেখছি না, দেখছি মঠ।’

"মনে আঘাত পেলাম। 'আপনি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলেন না।' আমি তাঁকে বললাম, 'এবং আর একটি কথাও আমার বলার ইচ্ছে নেই।'

"ভাল রে ভাল! তারপর তিনি আমাকে পাঠালেন থানায় এবং সেখানে গোয়েন্দারা আমাকে ছেঁকে ধরলে। তারা বললে, 'আমরা জানি যে সব চুরি তুমি স্বীকার করেছ সেগুলো তোমার একার দ্বারা হয়নি। আমাদের বল—কারা তোমার সঙ্গী ছিল? তারপর এস আমাদের সঙ্গে কাজ কর।'

"বলা বাহুল্য, আমি কোনোটাই করতে রাজি হলাম না—তখন তারা আরম্ভ করলে ধোলাই। আমাকে তারা কিছুই খেতে দিলে না। উপবাসে ফেলে রেখে দিলে। এতে কিছুটা আমি কষ্ট পেয়েছিলাম একথা সত্যি।

"তারপর এল বিচার। জুরিরা গেল চটে এবং পাঠিয়ে দিলে জেলে। সেখানে এমন সব লোকদের মধ্যে গিয়ে পড়লাম যারা পোকা মাকড় বা পশুর চেয়ে কিছুটা উন্নত মাত্র।

"আবার আমি ভাবতে বসলাম, 'হায় ঈশ্বর, সব কিছু নিয়ে কি বিশ্রী তালগোল তুমি পাকিয়ে ভুলছো'। ওই চিন্তা আমার বারে বারে ফিরে ফিরে আসে। একটা মানুষের কি করতে পারা উচিত—এটা যেন আমার কর্তব্য বলে মনে হলো না—যেহেতু একমাত্র ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণেই তার জীবনের ভোগ সীমাবদ্ধ।

"আর ওই জেলখানাটা সম্পর্কে ভাল কিছু বলতে পারি না। ওখান থেকে যেদিন বেরিয়ে এলাম—তাকালাম আমার চারদিকে, এখানে ওখানে, জগতের এদিক ওদিক একটু ঘুরে বেড়ালাম, লোহার এক কারখানায় কাজ করলাম কিছুদিন—কিন্তু ছেড়ে দিলাম চটপট। ওখানে বড্ড গরম। তাছাড়া, লোহা বা অন্য যে কোনো ধাতু আমার ভালো লাগে না—জীবনের সমস্ত উপদ্রব আসে ওদের থেকে—সমস্ত দুঃখ, নোংরামি এবং মালিন্য। ধাতু ছাড়াই মানুষ আরও সরল এবং সহজ ভাবে বেঁচে থাকতে পারে।

"সব রকমের কাজ আমি করে দেখলাম—এমন কি পায়খানা সাফ করার কাজ পর্যন্ত। আমি স্বীকার করি, সবচেয়ে নোংরা সাফ-সুফের কাজগুলো যেন আমাকে বেশী আকর্ষণ করতো। তারপর এই স্নানাগারের কাজে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করব বলে ঠিক করলাম। আজ সতের বছর ধরে মানুষ-জনকে আমি সাফ করছি এবং তাদের বিপর্যস্ত করবার চেষ্টা করছি না। মানুষকে বিপর্যস্ত

করে কি লাভ? ওতে ফয়দা কি?—যদি তুমি অবশ্য ঠিক ভাবে দেখ। ঈশ্বর ছাড়াই আমি বেঁচে আছি। মানুষের প্রতি আমার করুণা হয়—কারণ তারা বড় পরিত্যক্ত! এবং মোটমাট জীবনটাকে আমার বড় একঘেয়েই মনে হয়।…"

দশম পরিচ্ছেদ ॥ অদ্ভুত এক খুনে

মৃত্যুর প্রায় মাস দুয়েক আগে জজসাহেব এল. এন. স্‌ভিয়াতুখিন একদিন আমাকে বললেন: "গত তের বছরের মধ্যে আমার কাছে যত খুনী এসেছে তার মধ্যে একমাত্র মেরকুলোফকে আমার মনে হয়েছিলো মানুষের সামনে এবং মানুষের পক্ষে ও যেন একটা বিভীষিকা। লোকটা ছিল মাল-বওয়া এক ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান। সাধারণ একটা খুনে অসম্ভব রকম নিরেট এবং ভোঁতা হয়ে থাকে, অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক পশু, নিজের অপরাধের গুরুত্ব বোঝার ক্ষমতাও তার থাকে না; অথবা হয় ধূর্ত নোংরা একটা জীব—ঘাপটি মারা শেয়ালের মতো, কখনো পড়ে যায় ফাঁদে, অথবা সর্বক্ষেত্রে অসাথক, একটা বায়ুগ্রস্ত বাতিকগ্রস্ত, মরিয়া ও নির্দয়। কিন্তু আসামীর কাঠগড়ায় মেরকুলোফ যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াল—সঙ্গে সঙ্গে তার সম্বন্ধে কেমন একটা অপার্থিব এবং অস্বাভাবিক ভাব আমার মনে উদয় হলো।"

স্‌ভিয়াতুখিন অর্ধমুদিতচোখে বোধ করি সেই ছবি স্মৃতিপটে এঁকে চললেন: "বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সের বিশালদেহী চওড়া কাঁধ এক চাষী, শুকনো শুকনো সুন্দর মতো মুখটি—নিষ্পাপ সাধু-সন্তের মূর্তির মধ্যে যা সাধারণত দেখা যায়। লম্বা পাকা দাড়ি, মাথার কোঁকড়া চুলগুলিও তার পাকা, চাঁদির দু'পাশ জুড়ে টাকপড়া, শুধু কপালের বরাবর ওপরে যেন রেগে ফুলে ওঠা এক গোছা চুল—কসাকদের যেমন থাকে, শিঙের মতো। এর সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন ভাবে চোখের গভীর গর্তের ভেতর থেকে কোমলতা ও করুণায় ভরা দুটি বুদ্ধিদীপ্ত খয়েরী চোখ তাকাল আমার দিকে।"

পেটের ক্যানসারে মৃত্যুপথযাত্রী স্‌ভিয়াতুখিন—একটা গভীর, দুর্গন্ধময় নিঃশ্বাস ফেললেন। বিবর্ণ দীপ্তিহীন মুখটা বিচলিত হয়ে যেন কুঁচকে উঠল।

"আমাকে যেটা বিশেষ ভাবে চমকে দিয়েছিল তা হলো ওর চোখের ওই করুণার দৃষ্টি। ওটা এল কোথা থেকে? এবং আমি স্বীকার করছি, একটা উদ্বিগ্ন কৌতূহল জাগিয়ে দিয়ে সে যেন আমার সরকারী অপক্ষপাতিত্ব কোথায় বিলুপ্ত করে দিলে। আমার কাছে এ এক নতুন এবং অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা।

"যে মানুষ বেশী কথা বলে না বা বলতে অভ্যস্ত নয়—তেমনি নিস্তেজ গলায় সে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল—তার জবাবগুলো ছিল ছোট ছোট এবং সংক্ষিপ্ত সঠিক। এটা বেশ পরিষ্কার যে সে একটা অকপট স্বীকারোক্তি দিতে চায়। আমি তাকে কয়েকটা কথা বললাম—এই রকম অবস্থায় যা আমি আর কখনো কারুকে বলিনি :

"তোমার মুখটি দেখতে সুন্দর মেরকুলোফ ; খুনীর মতো দেখতে নয়।"

"এই কথার পর সে কাঠগড়ার ভেতর চেয়ারটা এমন ভাবে টেনে বসলো —যেন সে আসামী নয়, অতিথি। চেয়ারে সে বেশ চেপে বসলো, হাঁটুর ওপরে হাতের চেটো দুটো চেপে বলতে সুরু করলে অদ্ভুত এক সুরেলা গলায়—যেন বাঁশী বাজাচ্ছে। বোধ করি, ঠিক উপমাটা দেওয়া হলো না—কারণ বাঁশীরও একঘেয়ে স্বর আছে।

'আপনি কি মনে করেন স্যার, যদি আমি এই খুন করে থাকি তা হলে—আমি একটা পশু ? না—আমি তা নই। আপনি যখন আমার ব্যাপারে উৎসুক হয়েছেন—আমার কাহিনী আপনাকে বলছি।'

"নিজের অপরাধের কোনো সাফাই না দিয়ে, অনুকম্পা আকর্ষণের চেষ্টা না করে সে আমাকে সব বলে গেল—শান্তভাবে, ধারাবাহিক ভাবে—সাধারণত খুনীরা যা করে না।"

খুব আস্তে আস্তে এবং অস্পষ্ট গলায় কথা বলছিলেন জজ সাহেব। পাঁশুটে রঙের চটা-ওঠা শুকনো ঠোঁট কষ্টেই যেন নড়ছে। চোখ বন্ধ করে, কালো জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিলেন।

"আমি তার নিজের কথা গুলোই মনে করে বলবার চেষ্টা করবো। তার মধ্যে একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। সেগুলো সেই ধরনের কথা যা একজনকে বিমূঢ় করে দেয়—ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। আমার দিকে মেলে ধরা তার সেই সহানুভূতি ভরা দৃষ্টি আমাকেও গুঁড়িয়ে দিয়েছে। বুঝলে ? করুণা নয়—সহানুভূতিতে ভরা। আমার জন্য সে বেদনাবোধ করেছিল, যদিও তখন আমার শরীর ভালই ছিল।

"তার প্রথম খুন সে এই রকম অবস্থায় করেছিল : এক শরৎকালের রাতে বন্দর থেকে গাড়িতে করে কিছু চিনির বস্তা সে নিয়ে যাচ্ছিল—এমন সময় তার চোখে পড়ল—একটা লোক গাড়ির পেছনে পেছনে আসছে। লোকটা বস্তা ফুটো করে পকেটে চিনি ভরে নিচ্ছিল। মেরকুলোফ গাড়ি থেকে নেমে

তার দিকে তেড়ে গেল এবং তার কপালের পাশে রগে একটা ঘুষি মারলে আর লোকটা পড়ে গেল।

"মেরকুলোফ বললে, 'তারপর তাকে আর একটা লাথি মারলাম এবং ছেঁড়া বস্তাটা ঠিকঠাক করতে লাগলাম। ওদিকে, এ সময়টুকু সে আমার পায়ের তলেই পড়েছিল—তার মুখ ওপরের দিকে, হাঁ করে আছে—চোখ বড় বড় হয়ে আছে। আমি ভয় পেলাম। তাই হাঁটু গেড়ে বসে দুই হাতে তার মাথাটা তুলে ধরলাম কিন্তু সেটা যেন সীসের মত ভারী, একদিক থেকে আর একদিকে গড়িয়ে গেল, চোখ দুটো যেন মিট মিট করছে আমার দিকে তাকিয়ে, তার নাক দিয়ে গল্‌ গল্‌ ক'রে রক্ত বেরিয়ে ভরিয়ে দিলে আমার হাত, আমি চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলাম—হা ঈশ্বর, আমি ওকে মেরে ফেলেছি!'

"মেরকুলোফ তার পর চলে গেল থানায়, সেখান থেকে পাঠালো তাকে জেলে।

"সে বললে, 'জেলে বসে আমার চারপাশের অপরাধীদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার মনে হলো—আমি যেন সব কিছু দেখছি কুয়াশার ভেতর দিয়ে--আমি সব কিছু ঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারছিলাম না। আমি ভয়ার্ত হয়ে উঠলাম, খেতে বা ঘুমোতে পারতাম না, কিন্তু ভেবে চলেছি: এ কী, এ কেমন করে হ'তে পারে? একটা লোক রাস্তা দিয়ে চলছিল, আমি তাকে ঘুষি মারলাম—আর সে খতম? এর মানে কি? আত্মা—সে কোথায়? যদিও সে ভেড়াও ছিল না বা বাছুরও ছিল না—এটা ওটা সে করতে পারত এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসও করত, সন্দেহ নেই! তাছাড়া, যদিও তার চরিত্রটা ভিন্ন রকমের ছিল, তা হলেও সে ঠিক আমারই মতো একটা প্রাণী ছিল। আর আমি দেখুন—এসে পড়লাম তার জীবনে, মেরে ফেললাম তাকে—যেন একটা পশু, সে আর নেই! এ যদি এমনিই হয় তা হলে আমারও তো এই রকম যে কোনোদিন ঘটে যেতে পারে: এই রকম আমিও একটা ঘুষি খেতে পারি—তারপর, আমারও সব শেষ! এই সব চিন্তায় আমি এত ভয়ার্ত হয়ে উঠলাম যে, আমি যেন আমার মাথার চুল গজানোর শব্দটুকুও শুনতে পেতাম।'

"তার কাহিনী বলার সময় মেরকুলোফ সোজা তাকিয়ে ছিল আমার মুখের দিকে। যদিও তার সহজ দৃষ্টি ছিল অচঞ্চল, তবুও আমার বোধ হলো—কেমন একটা কালো ভয় যেন তার পাঁশুটে চোখের তারায় ঝিকমিক করছে। হাত দুটো সে একসঙ্গে জোড় করে রেখেছে দুই হাঁটুর মধ্যে—এবং জোরে চাপ দিচ্ছে।

এ তার পূর্বপরিকল্পিত অপরাধ নয়—তাই সে খুব মৃদু শাস্তিই সেবার পেয়েছিল। তার প্রাথমিক গারদ-বাস বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং তাকে এক মঠে পাঠানো হয়েছিল অনুতাপের জন্য।

"মেরকুলোফ বলে চলল, 'ওখানে ওরা আমাকে দেখাশোনার জন্যে এক ছোটখাটো বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে নিযুক্ত করলে।' কেমন করে বাঁচতে হয়—এই তিনি আমাকে শিক্ষা দিতেন। এত শান্ত ছোটখাটো মানুষটি ছিলেন তিনি—ঈশ্বর সম্পর্কে যিনি বোধ করি সবচেয়ে সুন্দর ভাবে বলতে পারতেন। চরিত্রটি ছিল ভারী সুন্দর এবং বাবার মতোই তিনি আমাকে সম্ভাষণ করতেন: "বাছা, বাছা' বলে। তাঁর কথা শুনতে শুনতে মনে মনে না বলে পারতাম না, "হে ঈশ্বর, মানুষ এত অরক্ষিত কেন?" তখন সন্ন্যাসীকে আমি বলতাম, "নিজেকে রক্ষা করুন ফাদার পল; আপনি ঈশ্বরকে ভালোবাসেন এবং সম্ভবত ঈশ্বরও আপনাকে ভালোবাসেন। তবু, আপনাকে শুধু আমার একটি ঘুষি মারার ওয়াস্তা এবং আপনি মারা যাবেন মাছির মত। তখন কোথায় যাবে শান্ত আত্মা? বস্তুটা আপনার আত্মার মধ্যে নেই—ওটা আছে আমার পাপ চিন্তায়। আমি আপনাকে যে কোনো মুহূর্তে মেরে ফেলতে পারি। বাস্তবিক পক্ষে আমার কোন পাপ-চিন্তা ঠিক নেই। খুব ধীরভাবে, খুব শান্তভাবে প্রথমে আপনাকে একটা প্রার্থনা করতে দেব, তারপর আপনাকে মেরে ফেলব। এটাকে আপনি কি ভাবে ব্যাখ্যা করবেন?"—কিন্তু তিনি কিছু বলতে পারলেন না। শুধু বলতে লাগলেন: "এ সেই শয়তান, তোমার মধ্যে পশুত্বকে জাগিয়ে তুলছে। সে সব সময়েই তোমাকে তাড়না করছে।" তাঁকে আমি বললাম, "কে তাড়না করছে তাতে কিছু এসে যায় না; শুধু তাড়নাকে কেমন করে এড়ানো যায় সেইটে আপনার কাছ থেকে শিখতে চাই। আমি একটা পশু নই।" আমি তাঁকে বললাম, "আমার মধ্যে পশুত্ব কিছুই নেই; আমার আত্মা শুধু নিজের জন্য ভয় পেয়েছে।"

"প্রার্থনা করো"--সন্ন্যাসী আমাকে বলতেন, "যতক্ষণ না অবসন্ন হয়ে পড়ো ততোক্ষণ প্রার্থনা করো।" আমি তাই করতে লাগলাম, করতে করতে আমি রোগা হয়ে গেলাম, আমার কপালের দু'পাশের চুল শাদা হয়ে গেল, যদিও তখন আমার বয়স ছিল মাত্র আঠাশ। কিন্তু প্রার্থনা আমার ভয়কে স্তব্ধ করে দিতে পারলে না; এমন কি প্রার্থনার সময়েও ভাবতে থাকতাম: প্রিয় ঈশ্বর, এ কেমন? এই যে আমি যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো মানুষকে মেরে ফেলতে

পারি এবং যে কোনো লোক আমাকেও যে কোনো মুহূর্তে মেরে ফেলতে পারে! আমি ঘুমোতে গেলাম আর যে কেউ আমার গলায় ছুরি বসিয়ে দিতে পারে অথবা একটা ইঁট বা কাঠের বাড়ি অথবা যে কোনো একটা ভারী জিনিস মাথায় বসিয়ে দিতে পারে। কাণ্ডটি অনেক ভাবে হতে পারে! ···এই সব চিন্তায় আমার ঘুম হতো না, আমাকে আতংকিত করে দিত। প্রথম দিকে আমি শুতাম নতুন চেলাদের সঙ্গে এবং যদি কেউ নড়ে চড়ে উঠত সঙ্গে সঙ্গে আমি লাফ দিয়ে, চিৎকার করে উঠতাম: "কে খস্ খস্ করছ ওখানে? একদম চুপ—কুত্তা কোথাকার!" সবাই আমাকে ভয় করত এবং আমিও সবাইকে ভয় করতাম। তারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে এবং আমাকে আস্তাবলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেখানে আমি ঘোড়াগুলোর সঙ্গে থেকে শান্ত হলাম—ওরা আত্মাবিহীন পশু মাত্র। কিন্তু আসলে সেই এক ব্যাপারই থেকে গেল, ঘুমের সময় একটা চোখ আমার খোলা থাকত। আমি আতংকিত ছিলাম।'

"এই অনুতাপ দণ্ডের পালা শেষ হওয়ার পর মেরকুলোফ গাড়োয়ানের আর একটা চাকরি পেল এবং সংযতভাবে, কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে শহরের বাইরে বাজারের এক বাগানে বাস করতে লাগল।

"সে আমাকে বলল, 'স্বপ্নে যেমন মানুষের হাল হয় তেমনি ভাবে জীবন কাটছিল আমার। চুপচাপ থাকতাম একেবারে এবং মানুষজন এড়িয়ে চলতাম। অন্য সব গাড়োয়ানরা আমাকে জিজ্ঞেস করত: "অমন গোমড়া হয়ে থাক কেন ভ্যাসিলি? সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছ নাকি?" সন্ন্যাস আমি নিতে চাইব কেন? মঠের ভেতরেও যেমন মানুষ আছে—তার বাইরেও তেমনি মানুষ আছে—এবং যেখানেই মানুষ আছে সেইখানেই ভয় আছে। আমি লোকজনের দিকে তাকাতাম আর ভাবতাম: "ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন! অনিশ্চিত তোমার জীবন এবং আমার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার তোমার কোনো উপায় নেই—যেমন তোমার কাছ থেকে আমারও বাঁচোয়া নেই!" একটু শুধু ভেবে দেখুন স্যার, বুকের ভেতরে এই গুরুভার নিয়ে আমার বেঁচে থাকা কি রকম কঠিন ছিল।' "

স্ভিয়াতুখিন একট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন এবং পুরানো, সাফ করা হাড়ের মতো তাঁর টাক-পড়া মাথার চাঁদির ওপরে ছোট্ট কাল রেশমের টুপিটা ঠিক করে বসিয়ে নিলেন।

"সেই মুহূর্তে, ওই কথাগুলো বলতে বলতে মেরকুলোফ হাসল। আর সেই অপ্রত্যাশিত, অযাচিত হাসি এমন তীক্ষ্ণ ভাবে এঁকে বেঁকে বিকৃত করে তুলল তার চমৎকার মুখের আদলটিকে যে, সেই মুহূর্তে আমি নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলাম—লোকটা একটা নর-পিশাচ। হয়তো ওই সংক্ষিপ্ত হাসিটুকু হেসে সে তার শিকারগুলোকে খুন করেছে। অনুভব করলাম কেমন একটা বিশ্রী অস্বাভাবিক অনুভূতি। কেমন একটা যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে মেরকুলোফ বলে চলল:

'পেটের ভেতর ডিম নিয়ে একটা মুরগীর মতো আমি চলে ফিরে বেড়াতে লাগলাম। আর ডিমটা যে পচে গেছে আমি তা জানি। সেই মুহূর্তটা অনিবার্যভাবে আসবে যখন আমার ভেতরে ডিমটা ফেটে যাবে—এবং তখন কি ঘটবে আমার? আমি জানি না—কি ঘটবে আমার জানবার সাহসও নেই—কিন্তু আমি অনুমান করতে পারি, তা হবে একটা সাংঘাতিক কিছু।' "

জজসাহেব বললেন, "আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কখনো আত্মহত্যার চিন্তা তার মনে হয়েছে কি? কয়েক মুহূর্ত সে নিঃশব্দ রইল, তার ভুরু নড়েচড়ে উঠল এবং সে জবাব দিলে:

'আমার মনে পড়ে না—না, ওরকম চিন্তা আমার কখনো হয়নি।'...

তারপর বিস্মিত ভাবে সন্ধানী দৃষ্টিতে সে আমার দিকে ঘুরে তাকাল এবং বোধ করি খুব বিশ্বস্ত ভাবেই বললে: 'কি আশ্চর্য—ও সম্পর্কে আমি তো কোনোদিন ভাবিনি? এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। ...'

"হাঁটুর ওপর সে একটা চাঁটি মারলে, আদালত ঘরের একটা কোণের দিকে তাকাল শূন্য চোখে এবং ক্রোধে বিড় বিড় করে বললে:

"আহা ·· আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, আমার আত্মাকে আমি রাশ ছেড়ে দিতে চাচ্ছিলাম না। অন্য লোকদের সম্পর্কে কৌতূহলে এবং আমার নিজের আত্মার লজ্জাকর ভীরুতায় আমার হৃদয় ভীষণ যন্ত্রণাকাতর হয়ে উঠেছিল। নিজের কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আর আমার আত্মা নিঃশব্দে ভাবছিল: যদি এই লোকটাকে মেরে ফেলি—কি হবে তারপর?'···

' বছর দুই পরে মেরকুলোফ এক মালীর মেয়েকে মেরে ফেলে—মাত্রেস্কা ছিল তার নাম, একটু আধ-বোকা গোছের। তার খুনের ব্যাপারটা বলেছিল সে একটু অস্পষ্ট ভাবে—যেন সে নিজেও অপরাধের উদ্দেশ্যটা ঠিক বুঝতে পারেনি। তার কথা থেকে একজন এইটুকু বুঝতে পারে যে, মাত্রেস্কা ছিল কিছুটা আধ-পাগলা গোছের।

"মেরকুলোফ বলেছিল, 'মাঝে মাঝে মাত্রেস্কার এক ধরনের মোহ বা আচ্ছন্নের মতো অবস্থা হতো—তখন তার বিবেচনা শক্তি একেবারে মুছে যেত: ফুলের বাগিচা খোঁড়ার কাজ বা আগাছা সাফ করার কাজ ফেলে দিয়ে, হাসতে হাসতে হাঁ করে এমন ভাবে ঘুরে বেড়াত,—যেন কেউ তাকে ইসারা করে ডাকছে। গাছপালা, ঝোপঝাড় দেয়াল—যাই থাক, পার হতে গিয়ে ঠোক্কর খেত। একদিন বাগানের মাটি আঁচড়ানো আঁচড়ের কাঁটার ওপরে পড়ল পা—হলো জখম; রক্ত বইতে লাগল ফিন্‌কি দিয়ে, কিন্তু চলা-ফেরা করতে লাগল একভাবে, কোনো জ্বালা যন্ত্রণা নেই—এমন কি একটু ছটফটানি নেই। দেখতেও ছিল সে বিশ্রী, অত্যন্ত মোটা, বোকা ছিল বলে ব্যভিচারের দিকে ছিল ঝোঁক। আমার দিকে নজর পড়ে আমাকে বিরক্তও সে করেছে কিন্তু আমার চিন্তায় ছিল অন্য জাতের ভাবনা। তার যেটা আমাকে অবাক করেছিল সেটা হলো—কোনো কিছুই তাকে ঘায়েল করতে পারে না; সে খাদে পড়ুক আর ছাদ থেকেই পড়ুক—দিব্যি নিরাপদ এবং সুস্থ। যে কারুর হয়তো পা মচকে যায়, কি হাড় ভাঙে কিন্তু তার কিছু ঘটে না। অবশ্য সর্বাঙ্গ তার ছড়ে যায়, আঁচড় লাগে—কিন্তু সমান শক্ত। বোধ হয়—যেন সম্পূর্ণ নিরাপদে সে বেঁচে আছে।...

'এক রোববারে, প্রকাশ্যে তাকে আমি মেরে ফেললাম। গেটের কাছে একটা বেঞ্চে আমি বসেছিলাম এবং সে অত্যন্ত কুৎসিত ভাবে আমার মনোহরণ সুরু করলে। তাই জ্বালানি কাঠের একটা বাড়ি দিয়ে মারলাম এক ঘা। সে গড়িয়ে পড়ে গেল এবং আর নড়ল না। আমি তাকিয়ে দেখলাম—সে তখন মরে গেছে। আমি তার পাশে, মাটির ওপর বসে পড়লাম এবং কেঁদে উঠলাম: "ঈশ্বর—হে ঈশ্বর, আমার হলো কী? কেন এই দুর্বলতা, এই অসহায়তা?"

"দমক দিয়ে দিয়ে সে কথা বলছিল—যেন প্রলাপের ঘোরে, কিছুক্ষণ ঘ্যান্ ঘ্যান করলে মানুষের অসহায়তার ওপরে এবং সব সময়েই একটা অন্ধকার ভয় তার চোখে জেগে রইল। তার নীরস, সঙের মত মুখটা কালো হয়ে উঠল। দাঁত-চাপা হিস্‌হিসে সুরে সে বলে যেতে লাগল:

'একটু ভেবে দেখুন স্যার, এখানে—এই মুহূর্তে, পিটিয়ে আপনাকেও মেরে ফেলতে পারি! ব্যাপারটা একটু চিন্তা করুন! ওতে আমাকে কে বাধা দিতে পারে? কে আমাকে থামাতে পারে? কোনো কিছুই না, কিছুই না।...'

"মেয়েটাকে খুন করার জন্য তার শাস্তি হলো তিন বছরের গারদ-বাস—এই

শাস্তির কারণ ব্যাখ্যা করে সে বললে যে—এ তার উকিলের কৃতিত্ব। অবশ্য উকিলের নিন্দা করতেও সে দ্বিধা করলে না : 'বয়স অল্প, মাথার চুলগুলো এলোমেলো, কথা বলেন চেঁচিয়ে'। জুরিকে তিনি বোঝাতে লাগলেন : "এই লোকটির বিরুদ্ধে নিন্দার কথা কে বলতে পেরেছে? একটি সাক্ষীও তা পারেনি। তাছাড়া এটা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে মৃত মেয়ে লোকটি অর্ধ-নির্বোধ এবং ব্যভিচারিণী।" ওঃ, কি সব আইনজ্ঞ! যতো সব ভণ্ডামী, সময় নষ্ট করা। অপরাধ করার আগে আমি নিজের থেকে নিজেকে রক্ষা করবো যদি আপনি চান, কিন্তু অপরাধ একবার করে ফেলার পর আমি কারুর সাহায্য চাই না। যতক্ষণ আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি আপনি আমাকে ধরতে পারেন কিন্তু একবার আমি ছুটতে আরম্ভ করলে আমাকে আর ধরতে পারবেন না! আমি যদি ছুটি—যতক্ষণ না নিঃশেষ হয়ে আমি লুটিয়ে পড়ি ততক্ষণ আমি ছুটবো। কিন্তু গারদ! —ভণ্ডামী, অলস মানুষের সৃষ্টি।...

"'জেল থেকে বেরিয়ে এলাম হতবুদ্ধির মত—কিছুই যেন বুঝতে পারি না। হাঁটতে হাঁটতে লোকজন আমাকে ছাড়িয়ে চলে যায়, ছুটে চলে যায়, কাজ করে, ঘর বাঁধে, আর আমি সব সময় চিন্তা করে চলি : যে লোককে আমি বেছে নেবো তাকেই আমি মেরে ফেলতে পারি। এ বড় সাংঘাতিক চিন্তা। আমার মনে হতো—হাত দুটো আমার বড় হচ্ছে—বাড়ছে—যেন কোনো অচেনা মানুষের হাত। আমি মদ খেতে শুরু করলাম—কিন্তু অভ্যাস ধরে রাখতে পারলাম না, মদে আমি অসুস্থ বোধ করতাম। পেটে এক-আধটুক বেশী পড়লেই আমি কাঁদতে সুরু করতাম—একটা কোণায় লুকিয়ে আমি চিৎকার করতাম : "আমি মানুষ নই—আমি একটা উন্মাদ। আমার জীবন বৃথা।" আমি মদ খেতাম —এবং মাতাল হতাম না কিন্তু যখন অপ্রমত্ত থাকতাম তখন মাতালের চেয়েও খারাপ। আমি গর্ গর্ করতাম—গর্ গর্ করে উঠতাম সকলের ওপরে, মানুষ জনকে ভয় পাইয়ে তফাৎ করে দিতাম এবং নিজেও ভয় পেতাম তাদের। সব সময়ে আমি ভাবতাম : "হয় সে আমার হাতে মরবে—অথবা তার হাতে আমি মরব।"

" 'কাচের শাসির ওপরে মাছির মতো আমি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াই :' কাচটা যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে আর আমি পড়ে যেতে পারি— ঈশ্বর জানেন কোথায় পড়ব।...

" 'আমার কর্তা, আইভান কিরিলিচ—তাঁকেও মেরে ফেললাম একই কারণে,

কৌতূহল। তিনি ছিলেন হাসিখুশি দয়াদ্রহৃদয় মানুষ এবং অদ্ভুত রকম সাহসী। যখন তাঁর প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগল তখন স্মরণীয় বীর নায়কদের মতোই কাজ করেছিলেন তিনি। আগুনের ভিতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে গিয়ে এক বৃদ্ধা ধাত্রীকে তিনি বের করে আনলেন। আবার ট্রাংকের জন্য বৃদ্ধা কান্নাকাটি করছিল বলে ফিরে গিয়ে ট্রাংকটাও এনে দিলেন। সুখী মানুষ ছিলেন আইভান কিরিলিচ, ঈশ্বর তাঁর আত্মার শান্তি বিধান করুন। এ কথা সত্যি, আমি তাঁকে একটু যন্ত্রণা দিয়েছিলাম। অন্যদের আমি এক পলকে মেরে ফেলেছি। কিন্তু আইভানকে যন্ত্রণা দিয়েছিলাম—আমি দেখতে চেয়েছিলাম তিনি ভয় পান কিনা। তাঁর গড়ন ছিল দুর্বল ধরনের এবং তাড়াতাড়িই তাঁর গলা চেপে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিতে পেরেছিলাম। তাঁর চেঁচামেচি শুনে লোকজন ছুটে এল। তারা আমাকে মারধর করতে সুরু করলে ও বাঁধতে চাইল। আমি তাদের বললাম: "তোমরা বরং আমার আত্মাকে বাঁধ, আমার হাত নয় রে হাবার দল!"…

"মেরকুলোফ তার গল্প শেষ করে, মুখের ঘাম মুছে ফেললে এবং কিছুটা যেন রুদ্ধনিশ্বাসে বলে উঠেছিল:

'আমাকে খুব কঠিন শাস্তি দিন, ধর্মাবতার, মৃত্যুদণ্ড দিন—তা নইলে এত সবের কি দরকার? আমি লোকজনের সঙ্গে থাকতে পারিনে, এমন কি জেলেও। আমার অপরাধ হচ্ছে আমার আত্মার বিরুদ্ধে। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তাকে নিয়ে এবং আমার ভয় হয়—কবে আবার তাকে পরীক্ষা করে দেখতে চাইব—আর তাতে আরও কিছু লোকের ক্ষতি হবে।… আপনি আমাকে শেষ করে দিন স্যার—অবশ্যই।…'"

শ্রান্ত চোখে মিট্‌মিট্‌ করে চেয়ে জজসাহেব বলে চললেন:

"নিজের ইচ্ছে মাফিকই সে নিজেকে একদিন শেষ করে দিলে—জেলের কুঠরিতে গলা টিপে, একটু অস্বাভাবিক ভাবেই। যে লোহার শেকলে সে বাঁধা ছিল তারই সাহায্যে। শয়তানই জানে—কেমন করে তা সে করলে! আমি নিজে তাকে দেখিনি, তবে জেলবাবু আমাকে বলেছিলেন 'ওই রকম যন্ত্রণাদায়ক ও অসুবিধাজনক ভাবে নিজেকে মেরে ফেলবার জন্য দরকার দারুন ইচ্ছাশক্তির।' এই কথাটাই তিনি বলেছিলেন: 'অসুবিধাজনক।'"

তারপর চোখ বুজে সৃভিয়াতুখিন অস্ফুট গলায় বলেছিলেন:

"বোধ করি আমিই মেরকুলোফকে আত্মহত্যার ধারনাটা দিয়েছিলাম।…

হ্যাঁ, আমিই। ··· সরল এক রুশ চাষীর এ এক অদ্ভুত কাহিনী। ওর সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয় ?"

১১শ পরিচ্ছেদ ॥ এক ছাত্রের কৈফিয়ৎ

ছাত্র মাওকফ—হত্যা করেছিল তার স্ত্রীকে। মস্কোর আদালতে তার শেষ কথাগুলি ছিল এই :

"সে মৃত, সে শহিদ, হয়ত এখন সে স্বর্গে পবিত্র দেহ ধারণ করেছে ; আর আমি পড়ে আছি এই মর্ত্যে অপরাধ ও অনুতাপের গুরুভার ক্রুশ সারা জীবন ধরে বহন করবার জন্য। আমার আর শাস্তি কেন, যখন ইতিমধ্যেই আমি শাস্তি পেয়ে গেছি? আগের মতই তেমনি সুন্দর ছোট ছোট আপেল এবং ডিম আমি এখনও খেতে পারি, কিন্তু তাদের সেই আগের মিষ্টি গন্ধ আর নেই। এখন আমাকে কোনো কিছুই আর আনন্দ দিতে পারে না—তবে আর আমার শাস্তি কেন ?"

১২শ পরিচ্ছেদ ॥ আত্মার খোরাক

এ. এ. জে-র সঙ্গে দেখা করতে এসে তাকে পেলাম না, বাড়িতে নেই।

"কোথায় বেরিয়ে গেছে সে," তার বাড়িওয়ালী বললেন। বয়স্কা মহিলা, চেহারাটি সুন্দর—চোখে শিঙের ফ্রেমের চশমা, বাঁদিকের গালে একটা সকেশ আঁচিল। একটু বসে আমাকে জিরিয়ে নিতে বললেন। মৃদু মৃদু হেসে বললেন :

"আজকালকার তরুণ তোমরা সবাই বেঁচে আছ ঘাড়-ভাঙা পা ফেলে—এইটে আমার খুব অবাক লাগে—কে যেন তোমাদের বন্দুক থেকে গুলির মতো ছুঁড়ে দিয়েছে। সেকালের লোক জীবন কাটিয়েছে ধীরে-সুস্থে—এমন কি তাদের চলা ফেরাও ছিল অন্যরকম। এত তাড়াতাড়ি তাদের জুতো ক্ষয়ে যেত না—তার কারণ জুতোর চামড়াটা মজবুত ছিল বলে নয়, তারা হাঁটতো আরও আস্তে, আরও সাবধানে।

"এই ধরো একটা দৃষ্টান্ত : এ. এ. জে-র আগে এই ঘরে থেকে গেছেন একজন লেখন-কুশলী ক্যালিগ্রাফার—আলেক্সি আলেক্সিভিচ ছিল তাঁর নাম। তাঁর পারিবারিক নাম ছিল কুসমিন। চমৎকার প্রশান্ত মানুষ ছিলেন তিনি—সে যে কি প্রশান্ত, মনে করে সব আজ বলাও সম্ভব নয়। ভোর ভোর উঠে পড়তেন তিনি, জুতো জোড়াটি পরিষ্কার করতেন, প্যান্ট কোট বুরুস করতেন, তারপর

স্নান করে পোশাকআসাক করতেন—এবং সব কাজ করতেন এমন আস্তে আস্তে যেন তিনি মনে করতেন, শহরের সব লোক ঘুমিয়ে আছে, ভয় পেতেন যেন এই বুঝি তাদের জাগিয়ে তুললেন। প্রার্থনাও তিনি করতেন—বাইবেলের বিশেষ একটা পর্বের অনুশোচনার প্রার্থনা। এ সবের পরে তিনি এক গ্লাস চা খেতেন, একটুকরো মাখন রুটির সঙ্গে একটা ডিম খেতেন, তারপর চলে যেতেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, ফিরে এসে ডিনার খেতেন, একটুখানি বিশ্রাম নিতেন। তারপর সুরু হতো ছবি আঁকা—অথবা ছবির ফ্রেম তৈরী করা। এই যে এখানে যত ছবি দেখছ—সব তাঁর হাতের।"

ছোট ঘরটার দেয়াল জুড়ে সাজানো পেনসিলে আঁকা প্রচুর স্কেচ—ঘরে তৈরী কালো কাঠের ফ্রেমে বাঁধাই, ছবির মধ্যে বেশীর ভাগই বার্চ গাছ আর কাঁদুনে উইলো* গাছ—কোথাও সমাধির ওপরে, কোথাও প্রায়-ধ্বংসপ্রাপ্ত কোনো জল-যন্ত্রঘরের পাশে পুকুরের ওপরে ঝুঁকে পড়া—সর্বত্র বার্চ আর কাঁদুনে উইলো। শুধু একটা ছোট ছবিতে একটু অন্য রকম—সাবধানে আঁকা একটা সরু পথ উঠেছে একটা পাহাড় বেয়ে, পথটা জড়িয়ে গেছে মস্ত একটা গাছের শেকড়ের সঙ্গে—দেখতে যেটা সাপের মত, গাছের ওপরের অংশটা ভেঙে পড়েছে, দেখা যাচ্ছে কতকগুলো শুকনো শাখাপ্রশাখা।

ধূসর, শান্ত ছবিটা সাদরে দেখতে দেখতে বয়স্কা মহিলাটি প্রীতিভরা কণ্ঠে বলে চললেন: "সন্ধ্যার ছায়া একটু ঘনিয়ে এলে তিনি বাইরে বেরোতেন এবং আবহাওয়া যখন মেঘলা হত বা বৃষ্টি নামত তখন তিনি আরও পছন্দ করতেন। এইভাবে তাকে ঠাণ্ডা লেগে গেল। আমি তাঁকে বলতাম: 'সব সময় আপনি এমন আবহাওয়া পছন্দ করেন কেন?'

"তিনি বলতেন, 'কারণ এই রকম দিনে রাস্তায় বেশী লোকজন থাকে না। আমি শান্তশিষ্ট নির্বিরোধ মানুষ এবং অতো লোকজন আমার ভালো লাগে না। আর তাছাড়া—ওই সব লোকজন আমার মনে ওদের সম্পর্কে প্রায়ই সব খারাপ ভাব জাগিয়ে দেয়, তাই আমি তাদের এড়িয়ে চলতে চাই।'

"টুপিটি পরে, লম্বা কোটটি গায়ে দিয়ে, ছাতাটি নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন এবং রাস্তার ধারের বেড়া-গাছগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটতেন শান্ত ভাবে। যদি কেউ সামনের দিক থেকে এসে পড়ত—সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াতেন। খুব লঘু পায়ে হাঁটতেন তিনি—যেন তিনি মাটির ওপরে হাঁটছেনই

---

* এই গাছকে শোকের চিহ্নরূপে গ্রহণ করা হয়।

না। ভারি বেচারী গোছের মানুষ ছিলেন তিনি, ছোটখাট আর রোগা রোগা, একমাথা চুল মাথায়, নাকটা একটু হুকের মতো বাঁকানো, পরিষ্কার দাড়ি কামানো মুখ। চল্লিশ বছর বয়স হলেও তাঁকে দেখতে খুব তরুণই লাগত।

"সব সময় মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কাশতেন যাতে শব্দ না হয়। তাঁর দিকে তাকিয়ে কখনো কখনো আমি প্রশংসা করে মনে মনে ভেবেছি: সব মানুষ যদি ওই রকম হতো!

"একদিন তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'এই রকম নিঃসঙ্গ ভাবে থেকে আপনার একঘেয়ে লাগে না?'

"তিনি উত্তর দিলেন, 'না, একেবারেই একঘেয়ে লাগে না—আমি আত্মার সঙ্গে বাস করি, আর আত্মা একঘেয়েমী জানে না—একঘেয়েমীটা রক্তমাংসের দেওয়া যন্ত্রণা।' সব সময়ে তিনি এইভাবে জবাব দিতেন—বুড়োদের মতো।

"আমি হয়তো বলতাম, 'এ কি সম্ভব! মেয়েরা আপনাকে আকর্ষণ করে না এবং পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আপনি কোনোদিন চিন্তা করেন নি?'

"তিনি বলতেন, 'না, ওদিকে আমার কোনো ঝোঁক নেই। পরিবার থাকলেই নানা ঝঞ্ঝাট আসে—আর তাছাড়া, আমার শরীরেও তা কুলোবে না।'

"এইভাবে প্রায় তিন বছর তিনি আমার ভাড়াটে হিসেবে থেকে গেছেন—একটি শান্ত ছোট্ট ইঁদুরের মতো। তারপর ঘোড়ার দুধের চিকিৎসা করানোর জন্যে চলে গেলেন একদিন সেই প্রান্তরের দেশে এবং মারাও গেলেন সেইখানে। কেউ হয়তো আসবে এবং তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে যাবে—এই ভেবে আমি কিছুদিন অপেক্ষা করলাম কিন্তু বোধ করি তাঁর কোনো আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু ছিল না। কারণ কেউ আর এল না। সেই থেকে তাঁর সব জিনিসপত্র এইখানে পড়ে আছে—একটা ছোট অন্তর্বাস, ওই ছবিগুলো আর একটা নোট বই, অনেক টুকিটাকি তাতে লেখা।"

আমি তাঁকে সেই নোট বইটা দেখাতে বললাম। তিনি সাগ্রহে দেরাজ খুলে কালো কাপড়ে বাঁধাই একটা মোটা খাতা আমাকে এনে দিলেন। একটা মোটা কাগজের টুকরো খাতার ওপরে আঠা দিয়ে আঁটা—সুন্দর গথিক ধরনের অক্ষরে তাতে লেখা:

আত্মার আহার: স্মরণযোগ্য মন্তব্য

এ. এ. কে.—আমার

৩রা জানুয়ারী, খ্রীষ্টীয় সন ১৮৭৯ থেকে

প্রথম পৃষ্ঠায় একটি ছোট্ট ছবি, কলমে আঁকা ভারী সুন্দর ছবিটি—চারদিক ঘিরে ওকগাছের ও মেপ্‌ল্‌ গাছের পাতার নক্সা। মাঝখানে কাণ্ড-কাটা একটি গাছের ছবি—তার ওপরে জড়িয়ে আছে একটা সাপ, শূন্যে মাথা তুলে হাঁ করে আছে, বেরিয়ে পড়েছে দুটো বিষ-দাঁত। ছবির নিচে, যেন স্তম্ভলিপির মত সযত্নে গোল গোল ছাঁদে লেখা নিম্নলিখিত কথাগুলি :

"এটা দ্রুত প্রকাশ হয়ে পড়ল যে খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা অনেক,—যখন কেউ একটা অপরাধের তদন্ত সুরু করে তখন ঘটনা সাধারণত এই রকমই হয়ে দাঁড়ায়। [সম্রাট ট্রাজানের কাছে প্লিনির লেখা চিঠি থেকে।]

কিছু পরে হঠাৎ মুখোমুখি এসে পড়তে হয় একটা বড় ছাঁদের এবং কিছুটা মামুলি ধরনের হাতের লেখার সঙ্গে, চারপাশ ঘিরে নানা তরঙ্গিত রেখা ও অলঙ্কারের বাহার :

"করিনথিয়ান এ্যাপোলোর* চেয়ে আমি যথেষ্ট চতুর, সে যে একটা মাতাল এ আর না-ই উল্লেখ করলাম।"

প্রায় সমস্ত পাতাতেই আঁকা নানা নক্সা অথবা ছোট ছোট ছবি। ভোঁতা নাক ও একজোড়া কালমুক (মোঙ্গল) জাতীয় চোখ-আঁকা একটি স্ত্রীলোকের ছবি প্রায় চোখে পড়ে। টীকা-টীপ্পনী খুব বেশী নেই—কখনো একপৃষ্ঠা কি দু'পৃষ্ঠার বেশী চোখে পড়ে না—সাধারণত কয়েক লাইন মাত্র, তবে সব সময়েই খুব সযত্নে লেখা। কোথাও একটা কাটা নেই, ভুল নেই—সমস্ত জিনিসটার মধ্যে একটা সম্পূর্ণতার আভাষ—প্রথমে মোটামুটি একটা খসড়া করে নেওয়ার পর যেন এখানে লেখা হয়েছে। পর পর ঔৎসুক্য বোধ করে লেখার খাতাটি পকেটে ভরে আমি বাড়ি নিয়ে এলাম।

ওই কালো খাতায় পাওয়া কিছু কিছু লেখা আমি এখানে তুলে ধরছি।

"তথাকথিত আর্ট বা শিল্প প্রধানত পরিপুষ্ট হয় নানা ধরনের অপরাধের রূপায়ণ এবং বর্ণনায়। এ-ও আমি লক্ষ্য করেছি, অপরাধ যত জঘন্য হবে—বই ততো বেশী প্রলুব্ধ হয়ে লোকে পড়বে এবং সেই অপরাধের বর্ণনা ততো প্রশংসিত হবে। এইসব বিবেচনা করে দাঁড়ায় এই—শিল্পের প্রতি ঔৎসুক্য হলো অপরাধ-প্রবণতার প্রতি ঔৎসুক্য। এ থেকে অল্পবয়সীদের ওপর শিল্পের অসুস্থ এক প্রভাব প্রত্যক্ষ গোচর।"

"রুই-কাত্‌লা মাছের সঙ্গে গাজর দিতে হবে ঠেসে—কিন্তু ওই কাজটি করার কথা কেউ ভাবে না।"

* একজন রুশ লেখকের ছদ্মনাম

"প্রিন্স ভ্লাদিমির গালিচ গেলেন হাঙ্গেরীর রাজার কাজ করতে এবং এই কাজ করলেন চারটি বছর। তারপর, গালিচ ফিরে এসে, সময় কাটালেন গীর্জার পর গীর্জা তৈরী করে।"...

"প্রত্যেক অপরাধের জন্য চাই সে সম্পর্কে অন্তর্জাত নৈপুণ্য—বিশেষ করে মানুষ খুনের ব্যাপারে।"...

"করিনথিয়ান এ্যাপোলো আমাকে ঠাট্টা করে কিছু নোংরা ছোট ছোট কবিতা লিখেছে। যাই হোক, তার আক্রোশকে গ্রাহ্য না করেই কবিতাটা এখানে তুলে দিচ্ছি :

> সর্বাঙ্গীন স্থিতিস্থাপক হওয়া উচিত আত্মাব ;
> অর্থাৎ আবও নমনীয়, হ্যা—কিছুটা হাতিয়ারের মত ;
> আধ্যাত্মিক ব্যাযামেব পবিপোষণ একটু করো ;
> অর্থাৎ সহজ বাক্যে—ভাঁড়ামী।"

"একটা সফল হত্যা—অর্থাৎ ধরা না পড়া, তেমন খুনখারাপি করা উচিৎ অপ্রত্যাশিত, অতর্কিত ভাবে।" ..

এই ধরনের অদ্ভুত সব চিন্তা লিখিত হয়েছে সেই শান্ত ছোটখাটো মানুষটির দ্বারা নানা অক্ষরের ছাঁদে—চারকোণা, গথিক, ইংরেজি, স্লাভ এবং আরও কত। তাতে সুস্পষ্ট তার মুন্সিয়ানা। কিন্তু হত্যা সম্পর্কে সব কিছু লেখা হয়েছে সেই সুন্দর সুগোল ছাঁদে—যে ছাঁদে ট্রাজানকে লেখা প্লিনির চিঠির মর্মাংশ লেখা। একটু ঝুঁকি নিয়ে অনুমান করতে পারি, বোধ হয় এই ধরনটাই তার ব্যক্তিগত হাতের লেখা।

অপূর্ব এক আবর্তিত ছাঁদে এক জায়গায় লেখা :

"চিন্তা করা প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষের কর্তব্য।"

তারপর অলংকৃত স্লাভ অক্ষরে লেখা :

"আমি নিজেকে কখনো কোনো অপমান বিস্মৃত হতে দেবো না।" আবার অন্যদিকে সুন্দর সুগোল ছাঁদে লেখো ছিল :

> "অতর্কিত আক্রমণের ব্যাপারটা আক্রান্তের জীবন-ধারাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার প্রাথমিক কাজগুলোকে বাদ দিয়ে নয়। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হলো : কখন এবং কোথায় সে পায়চারী করে ; ক্লাশ নেওয়ার পর কোন সময়ে ব্যক্তিটি ফিরে আসে ; রাত্রে ক্লাব থেকেই বা কখন ফেরে।"

এর পরে দু'পৃষ্ঠা ভরে ভল্‌গায় নৌকা যাত্রার এক খুঁটিনাটি এবং একঘেয়ে বিবরণ, তারপর একটু হেলানো অক্ষরের ছাঁদে লেখা :

"পোল. পেতার-এর* একটা বিশ্রী বদ অভ্যাস আছে—আঙুল দিয়ে বাঁ হাঁটুর নিচের দিকটা চুলকানো। সে পায়ের ওপর পা তুলে বসতে ভালোবাসে—তার ফলে হাঁটুর নিচের দিকটা চুল্‌কে ওঠে—বোধ হয় ওতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আর নির্বোধ ভদ্রলোকটি ওটা দেখতে পায় না। আস্ত বোকা ভদ্রলোক। আর ভদ্র মহিলার বার বার একটা কথা বলার অভ্যাস—'কিছু মনে করোনি তো ?'—ওর মুখে কথাটা ঠাট্টার মতো শোনায়। পোলিন—অর্থাৎ পিলেজিয়া, কেমন বিশ্রী চাষাড়ে একটা নাম।"...

তারপর আবার সুগোল ছাঁদে লেখা :

"কি ভাবে শহর ছেড়ে যেতে হবে এবং ফিরে আসতে হবে অপ্রত্যাশিত ভাবে : একটা গাড়ি নাও—কথাটা বোকার মতো হলো —বলা উচিত—'গাড়ি ভাড়া করো, ঘরে ফেরার পথে মাঝ-রাস্তায় চট করে নেমে পড়, খুব পেট-ব্যথার ভান করে অকুস্থলে ছুটে যাও, খুন করো এবং গাড়ি নিয়ে সরে পড়ো।"...

পরে কালমুক জাতীয় একটি স্ত্রীলোকের মুখ আঁকা এবং ভয়ানক খুদে খুদে পা-ওয়ালা একটা খুদে পুরুষের মূর্তি, মুখটা খুব ছোট, চোখের জায়গায় প্রশ্নবোধক চিহ্ন, মুখ ভর্তি দাড়ি।

তারপর কেরাণীর অলংকৃত ছাঁদে লেখা :

"ওই বুড়ি ডাইনী, মহিলা-কবি নিসোভ্‌স্কির সঙ্গে সে দেখা সাক্ষাৎ—মানে বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে সুরু করেছে। সমস্ত স্থানীয় বিপ্লবীরা ওর বাড়িতে জড়ো হয়।"

আবার সেই সুগোল ছাঁদে লেখা :

"অতর্কিত আক্রমণই সাফল্যের অঙ্গীকার। বুড়ো কচুয়ান দেখেই গাড়ি ভাড়া করো, যদি সম্ভব হয়—চোখে যেন সে কম দেখে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ো, পেটে হাত দুটো চেপে ধরো—যেন পেট ব্যথা করছে। পাশের রাস্তা ধরে, যেখানে সে আছে, এগিয়ে যাও—সোজা এগিয়ে যাও তার দিকে, কিন্তু তাকে চিনতে পারনি এমন ভাব

---

* কোনো একটি স্ত্রীলোকের সংক্ষেপিত সাংকেতিক নাম।

দেখাও। এতে সে ঘাবড়ে যাবে। তাকে ছাড়িয়ে একটু এগোও—তারপর ঘুরে দাঁড়াও হঠাৎ এবং একটি আঘাত করো ঠিক জায়গা মতো। (এখানে বিশেষ পেশীটির সংক্ষিপ্ত লাটিন নাম)। ওয়েস্ট কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে তাড়াতাড়ি কচুয়ানের কাছে ফিরে এস এবং কোনো একটা অমার্জিত রসিকতা করো। ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে পেটের ব্যথার জন্য ক্লোরোডাইন আনতে পাঠাও। যদি কোনো কারণে সবটা বেরিয়ে পড়ে, কৌতূহল এবং হাল্কা মন নিয়ে মেলামেশা করো। অন্ত্যেষ্টিতে সাহায্য করো।"

এই বিষয়ের ওপর আর কোনো টীকা-টীপ্পনী নেই—শেষ টীকার পেছনে একটা ছোট ছবি : ক্রশহীন একটা সমাধি : তার ওপরে একটা মরা ভেঙে পড়া গাছ ; চারদিকে ঘন লম্বা লম্বা ঘাস ; ওদিকে আকাশে চাঁদের জায়গায় আঁকা কালমুক মেয়েটির অশ্রু সজল মুখ।

পরে আরও চারটি টীপ্পনী আছে :

"একটি জারমান পত্রিকায় নির্বোধের মতো একটা বাক্য : এক অধ্যাপক তার বউকে জিজ্ঞেস করল : "এডেলে—আমি যা বলি তুমি তাই ফের 'আবৃত্ত' (ব্যাকরণ ভুল) করো কেন ?"...

"আজ সূর্যাস্তের সময় একটা স্টারলিং পাখী কি চমৎকার গান করছিল বাগানে ; ও এমন ভাবে গাইছিল যেন এই ওর শেষ গান।"...

"একটা লোকের সঙ্গে দেখা করলেই সব সময় বিপদের কারণ ঘটে না। তবু পছন্দ মাফিক সঙ্গীর জন্য আরও সাবধান হওয়া উচিত। লাল চুল-ওয়ালা লোকগুলোকে জানবার চেষ্টা আমি আর কখনো করব না।" ...

"শুধু সেই জানে দাঁতের ব্যথা কি—যার ওটা হয়ে গেছে অথবা প্রকৃত পক্ষে ব্যথাটা তখনো চলছে। ব্যথা চলে গেলে পর, ওটা কতটা যন্ত্রণাদায়ক ছিল মানুষে ভুলে যায়। এটা একটা খুব প্রশংসনীয় ব্যাপার হতো যদি একই সময়ে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের প্রতি মাসে অন্তত ঘণ্টা কয়েকের জন্য একবার করে দাঁতের ব্যথা হতো। ..."

এইভাবে শেষ হয়েছে শান্ত ছোটখাটো, লিপিকর্মের শিক্ষকটির গ্রন্থ—

নামকরণ করেছেন "আত্মার আহার।" দেখা যাচ্ছে এই দিনলিপি তিনি রেখেছিলেন ন'বছর চার মাস।

১৩শ পরিচ্ছেদ। লেখকের দুর্ভাগ্য

সময়টা ছিল রাত্রি। ছোট্ট একটা নোংরা হোটেল, ধোঁয়াটে পরিবেশ। আধা মাতাল হুল্লোড়বাজদের আড্ডা। সেখানে একবার দেখতে বেশ শক্ত সমর্থ অথচ জীবনে মার খাওয়া একটা মানুষ আমাকে বলেছিল:

"জীবনটা আমার নষ্ট করে দিলে টেলিগ্রাফ-কেরানী মালাসিন।"

ঘোড়-দৌড়ের সওয়ারদের মতো মাথায় ছিল তার একটা ভাঁজ ধরা টুপি। মাথাটা একটু নুইয়ে টেবিলের তলায় তাকাল, হাত দিয়ে খোঁড়া পা-টা একটু সরিয়ে দিলে, তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল:

"হ্যাঁ, টেলিগ্রাফের কেরানীটিই কাণ্ডটি করলে। আমাদের পাদ্রীসাহেব তাকে বলতেন—'পবিত্র আনন যুবক,' আর মেয়েরা ডাকত 'মালাসা' বলে। ছোট-খাটো, রোগা রোগা চেহারার ছোকরা, গোলাপী গোলাপী গাল, পাঁশুটে চোখ, কালো ভুরু—হাত দুখানা মেয়েদের মতো; সব মিলে যেন একটা ছবি। সব সময় হাসিখুশি, সকলের সে প্রীতিভাজন। আমাদের ওই ছোট্ট শহরের সকলেই তাকে স্নেহ করত—এমন কি, বলা যায় ভালোবাসত। হাজার সাড়ে তিনের মতো অধিবাসী ছিল আমাদের—প্রাত্যহিক কর্মধারায় ধীরে সুস্থে টেনে চলত দিনের পর দিন।

"যখন আমার বিশ বছর বয়স—একটা বিশ্রী একঘেয়েমীতে জীবন যেন আমার ভরে গেল, আত্মা পর্যন্ত যেন অসাড়। মানুষ জনের নিঃশব্দ ছোটাছুটি যেন আমার স্নায়ুতে গিয়ে আঘাত করতে লাগল—এমন কি, ভয় পাইয়ে দিলে। এ সবের পেছনে কোন্ অর্থ লুকিয়ে আছে আমি বুঝতে পারতাম না এবং খানিকটা শংকার সঙ্গেই যেন আমার চার দিকের জীবন ধারাকে লক্ষ্য করতাম। একদিন যেন মুহূর্তের উত্তেজনায় প্রেরণার আবেগে একটা গল্প লিখে ফেললাম, যার নাম দিয়েছিলাম—'মানুষ কেমন করে বেঁচে আছে' এবং পাণ্ডুলিপিটা পাঠিয়ে দিলাম 'নিভা' পত্রিকায়। এক সপ্তাহ, এক মাস, দু'মাস কেটে গেল এবং শেষ পর্যন্ত সম্পাদকের কাছ থেকে কোনো খবর পাওয়ার আশা ছেড়েই দিলাম। নিজেকে বোঝালাম: 'বড় আশা যার, পায় সে অল্পই।'

"তারপর প্রায় মাস তিনেক পরে মালাসিনের সঙ্গে আমার দেখা হলো: সে

বললে, 'তোমার একটা চিঠি আছে আমার কাছে—' বলে আমাকে একটা পোস্টকার্ড দিলে। তাতে লেখা ছিল :

'আপনার গল্পটি পাঠক মনে বিশেষ কোনো একটা আগ্রহ সৃষ্টি করে না—তাই সফল বলা যায় না ! তবু মনে হয়, আপনার লেখার প্রতিভা আছে। আরও কিছু গল্প পাঠান।'

"কল্পনা করুন, এতে কতখানি আনন্দিত হয়েছিলাম। মালাসিন মধুর ভাবে আমাকে জানালে—চিঠিটা তিন দিন ধরে তার পকেটেই ঘুরছে। 'আমি ওটা রেখেছিলাম'—সে বললে, 'তোমাকে দেবো বলে কিন্তু ভুলেই যাচ্ছিলাম। দেখছি তুমি লেখক এবং অন্যতম কাউন্ট টলস্টয় হতে চাও !'

"আমরা একটু হাসাহাসি করে বিদায় নিলাম। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় আমি যখন বাড়ি ফিরছিলাম তখন আমাদের এক ধর্মযাজক তাঁর বাড়ির জানালা থেকে হেঁকে উঠলেন, 'ওহে লেখক ! এইটি তুমি খেতে চাও কেন !' এবং ঘুষি তুলে দেখালে। আনন্দে আমি ধর্মযাজকের এই ইঙ্গিতটা ভুল বুঝেছিলাম। এক অদ্ভুত ধরনের লোক হিসেবে আমি তাঁকে জানতাম। যৌবনে তিনি অপেরা থিয়েটারে গান গাইবার উৎসাহ দেখান কিন্তু কোরাস গানে তিন নম্বর সারি ছাড়িয়ে কখনো তিনি সামনের সারিতে স্থান পান নি। অভিনয়ে ইচ্ছামতো বাড়াবাড়ি করার ঝোঁকের ফলে তাঁর নিজের দেশেও অপেরার জীবিকায় সুবিধে করতে পারেননি। ধরলেন ঢালাও মদ, এবং যখন মত্ত হতেন তখন বাজী ধরে কপালে আখরোট ভাঙতেন। একবার এই রকম পাউণ্ডখানেক আখরোট ভাঙতে গিয়ে তাঁর কপালের চামড়া কেটে ছড়ে একাকার হয়ে গেল। পকেটে তিনি একটা টিনের কৌটা নিয়ে বেড়াতেন—গ্রীষ্মকালে তার মধ্যে রাখতেন ব্যাঙ এবং শীতকালে ইঁদুর। সুবিধে মতো সময়ে মহিলাদের ঘাড়ে ওগুলো ছুঁড়ে দিতেন। এই সব মস্করা তাঁর ক্ষমা করা হতো—তাঁর আমুদে স্বভাবের জন্য আর মাছ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার জন্য—লোকটি ছিলেন একেবারে পাকা জেলে ! নিজে তিনি মাছ খেতেন না—পাছে গলায় কাঁটা আটকে দম বন্ধ হয়ে যায়।—তবে মাছ যা ধরতেন বিলিয়ে দিতেন সঙ্গীসাথীদের মধ্যে। আর এইভাবে তাঁর বন্ধুগোষ্ঠীও বেশ বেড়ে গিয়েছিল।

"যাক সে কথা। বুঝতেই পারছেন—আপাতত নিজের খবরের আনন্দে চলে গেলাম নিজের পথে। ওই সময়ে আমি ছিলাম এক ভাবুক প্রকৃতির শান্তশিষ্ট যুবক—এবং চেহারাটা ছিল নিঃসন্দেহে জবড়জঙ্গ ধরনের।..."

দুই ঠোঁটের মাঝখানে সে তার পাৎলা গোঁফটা চেপে ধরলে, অনুজ্জ্বল চোখ দুটো বন্ধ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কম্পিত হাতে ভদকা ঢাললো গ্লাসে। বিশ বছর বয়সে ও নিশ্চয়ই অপটু ও ক্ষীণ-দেহী ছিল; ওর ঝাঁকড়া পাকা চুলের গুচ্ছ তখন হয়ত ছিল লাল; ওর দীপ্তিহীন চোখ ছিল হাল্‌কা নীল আর মুখ ছিল মেছেতায় ভরা। এখন ওর মাংসল গাল সূক্ষ্ম লাল শিরার জালে ভরা, পাৎলা গোঁফের ওপরে যেন বিষাদে ঝুলে পড়েছে নেশা-খোরের বিবর্ণ নাকটা। ভদকাও তাকে চাগিয়ে তুলতে পারল না এবং যেন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে কষ্টেই বলতে লাগল:

"নিজেকে মনে করতাম এক ফুলবাবু—কিছুটা বিশিষ্ট ধরনের ব্যক্তি। বাস্তবিকই—তাই ছিলাম। আমার আত্মা গান গাইত চাতক পাখির মত। একটা অস্থিরতার মধ্যে আমি লিখতে সুরু করলাম—লিখতে লিখতে সারা রাত কাটিয়ে দিতাম। কলম থেকে ঝর্ণার মতো বেরিয়ে আসত শব্দগুলো। ওঃ, কি সুখ তাতে! একটা জিনিস লক্ষ্য করতে সুরু করলাম—আমি যখন যেখানে যাই, শহরের লোকজন কেমন একটা অদ্ভুত মনোযোগে আমাকে দেখে। মনে মনে ভাবলাম—ওটা ঈর্ষা? ...

"একদিন মালাসিন আমাকে আবগারী কর্মচারীর বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন করলো। আবগারী কর্মচারীর একটি মেয়ে ছিল—বেশ ছিমছাম তরুণী। ওরা আরও কিছু যুবককে ওই সঙ্গে নেমন্তন্ন করেছিল। সেখানে আমাকে চেনে এমন যে-কেউ এসে আমাকে বলতে সুরু করল, 'তুমি লেখ, তাই না? তোমার চায়ে একটু চিনি দেব?'

"ওঃ, মনে মনে ভাবলাম, এখন ওরা আমাকে চিনি দিচ্ছে! চামচ দিয়ে আমি কাপে চিনি গুলে নিলাম এবং অবাক হলাম—ব্যাপারটা হলো কি! কারণ স্বাদ যে নোন্‌তা—বাস্তবিক পক্ষে রীতিমতো কটু। এবং সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল হঠাৎ। আর মালাসিন কড়া মুখভঙ্গী করে আমাকে বলল: 'কি হলো? ভাল মন্দের বিচার একজন লেখকের পক্ষে নিশ্চয়ই করা উচিত—আর তুমি কিনা নুন এবং চিনির তফাৎটাই বুঝতে পারলে না, এ কী!'

"ভয়ানক হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম আমি এবং আমার আত্মগৌরব দ্রুত নিঃশেষিত। আমি বললাম, 'এ তোমাদের ঠাট্টা।'

"এতে ওরা আরও জোরে হেসে উঠল। তারপর ওরা সকলে কোনো

একটা কবিতা আবৃত্তির জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আমি যে কবিতাও লিখতাম মালাসিন জানত।

'কবিরা সব সময়ে সমাজে কবিতা আবৃত্তি করে থাকে—তাই তোমাকেও করতে হবে।'

"এই সময়ে এক মেজরের ছেলে, মুখটা ভারী ভারী, প্রতিবাদ করে বলে উঠল, 'সেনাবাহিনীর লোকেরাই শুধু ভাল কবিতা লিখতে পারে।'

"ওই নিয়ে তর্ক বাধিয়ে দিলে মেয়েরা এবং ওই হট্টগোলের মাঝখানে অলক্ষ্যে আমি সরে পড়লাম।

"সেই সেদিনের সন্ধ্যে থেকে সারা শহর যেন আমার পেছু নিল—যেন আমি একটা অদ্ভুত জীব। পরের প্রথম রোববারেই আমার দেখা হল ধর্মযাজকটির সঙ্গে—হাতে মাছ ধরার ছিপ, চলেছেন মত্তহস্তীর মত।

"হেঁকে উঠলেন তিনি, 'এ্যাই—দাঁড়াও, তুমি তাহলে লেখ, তাই না—মুখ্যু কোথাকার? জানো আমি এখানে তিনটি বছর ধরে অপেরায় তালিম দিচ্ছি!' তিনি আরও বললেন, 'আর আমি তোমার যোগ্য নই! মোদ্দা কথা, তুমি কে হে! একটা মাছির বেশী কিছু নও। তোমার মত মাছিরাই সাহিত্যের আয়নাটাকে নোংরা করে দিচ্ছে—নচ্ছার গাঁদাল!' এবং এমন সোজাসুজি গালাগালি সুরু করলেন তিনি—আমি অত্যন্ত আঘাত পেলাম। কেন উনি এমন করলেন? আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম।

"এর অল্প কিছু দিন পরে পিসি ধরলেন। আমি ছিলাম পিতৃমাতৃহীন, পিসির কাছেই থাকতাম। পিসি এসে বললেন, 'তোর সম্পর্কে সবাই কি সব বলাবলি করছে—তুই নাকি লিখিস? তুই ও-সব বরং ছেড়ে দে; এখন তোর বিয়ে করা দরকার।' আমি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে লেখা কোনো দোষের ব্যাপার নয়, এমন কি কাউন্ট এবং রাজকুমাররাও লিখে থাকেন এবং এ এক পরিচ্ছন্ন মহান বৃত্তি। তিনি আমার কথায় কান দিলেন না এবং কাঁদতে সুরু করে দিলেন—বললেন, 'হায় ভগবান! কোন পাজী তোকে এ জিনিস শিখিয়েছে?'

"এবং পরের দিন, মালাসিন আমাকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে হেঁকে ডেকে বলে উঠল, 'সুপ্রভাত ছোট কাউণ্ট টলস্টয়!' সে আমাকে নিয়ে একটা ছড়া বেঁধেছিল। রাস্তায় আমাকে দেখতে পেলেই শহরের যতো ছোট ছোট ছেলে সেই ছড়া আউড়ে উঠত:

সব পাখিরা, ক্যানারিরা
দুঃখেই গান গায় ;
বলতে পারি, জোটে না তায়
এক পয়সাও হায়।

"চুলোয় যাক সব, নিজেকে বললাম—এই লেখা নিয়ে দেখছি দিব্যি ঝঞ্ঝাটে পড়লাম! শেষ পর্যন্ত রাস্তায় বের হতে আমার সাহস হত না—তারা এত আমাকে উত্যক্ত করত! বিশেষ করে ধর্মযাজক মশাই তো একেবারে আগুন এবং যে কোনো সময়ে আমাকে মেরে বসতে পারেন। 'আমি তিন-তিনটি বছর এতে লেগে আছি'—তিনি গর গর করে উঠতেন: 'তুই সর্বনেশে··· আর তুই কিনা' ···

"কোনো কোনো দিন রাত্রিতে আমি নদীর ধারে গিয়ে বসতাম এবং অবাক হয়ে ভাবতাম—কেন ওরা এসব করে, কিসের জন্যে? নদীর ধারে একটা বেশ নির্জন জায়গা ছিল—ছোট্ট একটা দ্বীপের মতো এবং গাছপালায় ছাওয়া। গুঁড়ি সুড়ি মেরে সেখানে গিয়ে হাজির হতাম এবং নদীর স্রোতধারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার মনে হতো, ওই কালো জলের রাশি শহরের মধ্যে দিয়ে পরিস্রুত হয়ে যেন আমার আত্মার ওপর দিয়ে বয়ে চলে যাচ্ছে এবং আমার আত্মার ওপর রেখে যাচ্ছে একটা ভুক্তাবশিষ্ট কটু, পংকিল আস্বাদ।

"আমার একটি মেয়ে বন্ধু ছিল—সূচীশিল্পের কাজ করত, অত্যন্ত সম্মানের মনোভাব নিয়েই তাঁকে আমার ভালবাসা জানাতাম; আমার বিশ্বাস—তা সাদরে গৃহীতও হয়েছিল। কিন্তু সে-ও যেন ক্রমে ঝগড়াটে হয়ে উঠল এবং অবিশ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে বসলো, 'একি সত্যি যে তুমি আমাদের সম্পর্কে এবং আমাদের শহর সম্পর্কে কিছু লিখেছ?'

'কে তোমাকে বললে?'

"প্রথমে সে বলতে চাইল না এবং শেষ পর্যন্ত সে স্বীকার করল এবং বলল: 'মালাসিন তোমার পাণ্ডুলিপি পেয়েছে। সকলকে সে পড়ে শোনায় এবং সব্বাই তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে বলে—তুমি কাউন্ট টলস্টয় হতে চলেছ। মালাসিনকে তোমার লেখাটা দিয়েছ কেন?'

"আমার পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠল। উঃ। মনে মনে ভাবলাম, এ ভাল কাজ হয়েছে—ওই গল্পে আবগারী কর্মচারী এবং ধর্মযাজকদের সম্পর্কে অনেক কথা ছিল এবং আমার মনে হয়—তারা বিশেষ করে বস্তুটা উপভোগ করবে না! এই জন্যই ধর্মযাজক এত! ··· বলা বাহুল্য, আমার সম্পদটি আমি

মালাসিনকে কখনো দিইনি; সে ওটা ডাক থেকে সোজা চুরি করেছে। আমার মনের তিক্ততা আরও বাড়িয়ে দিয়ে আমার প্রেমিকা আরও বললো:

'আমি তোমার সঙ্গে ঘোরা-ফেরা করি বলে আমার বন্ধুরা আমাকে ঠাট্টা করে। ··· আমি বুঝতে পারছি না আমি কি করব।'···

"সব কটা চুলোয় যাক!—আমি ভাবলাম। তবে মালাসিনের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। বললাম, 'দয়া করে আমার লেখাটি ফেরৎ দাও।'

"সে শান্তভাবে বললে, 'ওটা যখন ফেরতই তারা দিয়েছে তখন ওটা আর তুমি চাও কেন?' তার কাছ থেকে আমি ওটা আর আদায় করতে পারলাম না। ওকে আমি পছন্দ করতাম। বাস্তবিক পক্ষে এটা আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, দরকারী জিনিসগুলোর চেয়ে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে আমরা যেমন সযত্নে রক্ষা করি, তেমনি মন্দাভিলাষী লোকগুলো অন্যদের চেয়ে আমাদের বেশী পছন্দ মাফিক হয়ে থাকে। ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার চেয়ে গাড়ি-টানা ঘোড়া মানুষের প্রিয় হয় না—যদিও মানুষে ঘোড়-দৌড়ের বাজিতে বাঁচে না—বাঁচে কঠিন পরিশ্রমে।

"কিছুদিন পরেই এল বড়দিনের উৎসব। এক সখের পোশাক পরা নাচের অনুষ্ঠানে মালাসিন আমাকে নিমন্ত্রণ করল। আমাকে শয়তানের পোশাক পরতে হলো এবং ওরা আমার লোমের টুপিতে লাগিয়ে দিলে ছাগলের শিং এবং একটা মুখোস এঁটে দিলে আমার মুখে। তারপর, আমরা নাচ শুরু করে দিলাম, মত্ত রইলাম ভাঁড়ামি ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত ঘেমে উঠলাম এবং লক্ষ্য করলাম—সারা মুখে কেমন যন্ত্রণাদায়ক একটা জ্বালা। আমি বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত করলাম কিন্তু রাস্তায় তিনজন ভাঁড়ের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। তারা চেঁচিয়ে উঠল, 'শয়তান রে—পেড়ে ফেল ওকে!'

"আমি ছুটতে সুরু করলাম কিন্তু তারা ধরে ফেললে এবং মার-ধর সুরু করে দিলে—অবশ্য খুব সাংঘাতিক ভাবে নয়। এদিকে আমার মুখ তখন এমন জ্বালা করছে—প্রায় যন্ত্রণায় চিৎকার করার মত অবস্থা। কোনো রকমে বিছানা নিলাম এবং সকালে গুটিগুটি আয়নার সামনে গিয়ে দেখলাম—আমার সারা মুখ বেগুনে হয়ে উঠেছে, নাক ফুলে উঠেছে, ফোলা চোখের পাতার ভেতর দিয়ে প্রায় দৃষ্টি চলে না, জল পড়ছে চোখ বেয়ে। মনে মনে বললাম, ভাল—একটা ভাল চেহারাই তারা আমার বানিয়ে দিয়েছে। ওরা মুখোসের ভেতর দিকে কোনো এ্যাসিড মাখিয়ে দিয়েছিল এবং গরমে তা আমার মুখের চামড়া কুরে

আমি বুঝতে পারলাম না কি তুমি বলতে চাও, কারণ আমি শিক্ষিত নই। যেমন ধরো—তুমি একজন জন্তু-জানোয়ারের ডাক্তার ; আমিও আমার মতো ওদের সম্পর্কে কিছু জানি ; কিন্তু আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারি না এবং সব দোষ ওই পুঁথির। হঁ্যা—হঁ্যা।...”

আমি তার কথা শুনছিলাম এবং দেখছিলাম তার দোরঙ্গা লাল আর সাদা দাড়ি, তার মধ্যে তার বাঁদরের মতো থ্যাবড়া নাকটা যেন জড়িয়ে গেছে। ব্যাঙের মতো সবুজ দুটো চোখ চাতুর্যে ঝিলিক দিয়ে উঠছে—ঠেলে বেরিয়ে এসেছে প্যাঁচার চোখের মতো। দাড়ির ভেতর থেকে মুখটা দেখা যায় না। বোরজোফ যখন শুধু কথা বলে তখন মনে হবে ওর দাড়ির ভেতরে কি যেন নড়ে চড়ে উঠছে এবং দাড়ির চুলের ফাঁকে ফাঁকে সাদা দাঁতের সারি প্রায়ই ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

“আমার সামনেই তুমি দাঁড়িয়ে আছ এবং কথা বলছ একটা বিদেশী অথবা হুনের মত। পুলিস ইন্সপেক্টার অথবা যে কোনো কর্মচারী এমনিই করে। যদি সে খারাপ কথা বলে—তাহলে অবশ্য আমি বুঝতে পারি ; কিন্তু যখনই কেউ শিক্ষিতের মতো কথা বলতে সুরু করে—তখনই, আমাদের মাঝখানে একটা খানা তৈরী হয়ে যায়। এই আমি একদিকে—আর সে অন্যদিকে এবং আমরা কে কি বলছি যেন কেউই শুনতে পাই না। অথবা ধরো পাদ্রীদের কথা : গীর্জায় যখন সে চেঁচিয়ে মরে তখন, তুমি কি মনে কর, তার কথা কেউ শোনে ? গীর্জার ভেতরে সব ভারী সুন্দর, যেন স্বপ্ন কিন্তু কিছু বুঝতে পারো ?—আমি তো পারি না। শিক্ষকদের সম্পর্কেও ওই একই কথা : কাচ্চাবাচ্চাগুলোকে এক জায়গায় তারা জড়ো করে এবং বছরের পর বছর ধরে শেখায় কেবল আবোল তাবোল ! বড় হয়ে উঠে বাচ্চাগুলো সে-সব যে ভুলে যায়—তাই রক্ষা, নইলে চাষীরাও হয়তো পরস্পরকে বুঝতে পারত না। তাই আমি সব সময় বলি, সবচেয়ে বড় পাপ যে মানুষের ঘাড়ে এসে চাপছে—সে আসছে ঐ বই থেকে।”

ঠিক বিপরীত কথাটাই আমি তাকে বোঝাতে চাচ্ছিলাম—কিন্তু আমি একেবারে ব্যর্থ। অর্ধমুদিত চোখের পাতার আড়ালে ধূর্ত ছোট ছোট চোখ দুটোকে লুকিয়ে, নীরবে সে আমার কথা শুনেছে, চিবুকটা এমন ভাবে বের করে দিয়েছে যে দাড়িটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে চুলের একটা দলার মতো। তার মুখ জুড়ে দেখা দিয়েছে বোকা বোকা ভাব। কিন্তু সজোরে মাথা ঝাঁকিয়ে

অনুকম্পার সঙ্গেই যেন সে বলে উঠল : "তাইত ভায়া, আমরা কি করি ! আমি বুঝতে পারছি না ! ভাবের কথা দূরে থাক, তোমার কথাই বুঝতে পারছি না। শুনে দেখ—কি সুন্দর কথাগুলো, শোন একবার !—তুমি বললে 'বৈজ্ঞানিক'—আমি শব্দটা শুনলাম 'মাকড়সা' হবে বুঝি। এবং আমি ভাবতে সুরু করলাম—তুমি হচ্ছ সেই মাকড়সা, আমার চারদিকে জাল জড়িয়ে দিচ্ছ, যেন আমি একটা মাছি।

"তারপর তুমি আবার বললে—পড়তে পারার জন্য সকলেরই শিক্ষা দরকার, কিন্তু ওটা একদম বাজে কথা। প্রত্যেকের জন্যে এত বই পাবে কোথায় ? শুধু তাই নয়, যথেষ্ট খাদ্যও তখন থাকবে না। এ সম্বন্ধে কি ভাবছ তুমি ? হে ঈশ্বর, ওই শিক্ষা মানুষকে কোথায় নিয়ে যাবে !"

বলা বাহুল্য, আমি দেখছিলাম সে আমাকে বিদ্রূপ করছে। কিন্তু আমিও ছিলাম একরোখা এবং চেষ্টায় ছিলাম—'টিম খুড়োকে' হার মানাবোই। আমি যে তার বিদ্রূপকে ভাল ভাবেই নিয়েছি—চটে যাইনি, এর জন্য সে খুশিই হয়েছিল এবং স্বেচ্ছায় ও সহজভাবে সে কথা কইতে সুরু করলো। কিন্তু তার একদিনের কাহিনী শোনার পর আমি যেন ডাণ্ডার বাড়ি খেয়ে একটা বলের মতো দূরে ছিট্‌কে গেলাম।

সূর্যাস্তের পর সেদিন সন্ধ্যেবেলা সে তার কুঁড়ের সামনে ফটকের ধারে একটা বেঞ্চিতে বসে ছিল। পুকুরের ঝক্‌মকে জলে ব্যাঙগুলো ডাকছে, আমাদের মাথার ওপরে ভন্ ভন্ করছে মশা। একটা খড়ের আঁটি থেকে বোরজোফ ডগাগুলো টেনে টেনে বাছাই করে রাখছিল এবং একধরনের অলস দার্শনিকতায় সারা ক্ষণ বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছিল :

"ভাল কথা, এসো একটা সমঝোতায় আসা যাক ; আমরা দু'জনেই মেনে নিচ্ছি—আমাদের ওপর একজন ভালো লোক থাকুক। কিন্তু ভালো হ'তে হলে তাকে অবশ্যই কি রকম হতে হবে ? কথাটা এই ভাবে বলা যাক : অবশ্যই সে তার প্রতিবেশীর কোনো কিছু কেড়ে-কুড়ে নেবে না, গরীবের ওপর অবশ্যই উদার হবে এবং খুব পরিশ্রম করবে—তারপর সে হবে সব চেয়ে সেরা। এ সব নিয়মও সে অবশ্যই জানবে, যেমন : 'সবটা একেবারে গিলে বসো না—কুকুরের জন্যে একটু রেখ।' বা 'যা তোমার নয় তা ছুঁয়ো না' বা 'যা কাজে লাগে তাই কর।' 'আগে গরম পোশাক—পরে ঈশ্বর বিশ্বাস।'* এই গুলো জানা হ'লেই

* সবগুলিই রুশ প্রবচন

তার হয়ে গেল। এর জন্যে বেশী শিক্ষার দরকার নেই। আমাদের গোটা সাম্রাজ্য নির্ভর করে এমনি মানুষের ওপর—তিনিই তাতার এবং মোরডোভীয় সমস্ত উপজাতির প্রভু।

"সারা জগতের মানুষকে খাওয়াবার ভার তাঁর ওপর এবং সমস্ত ধরনের মানুষ ছুটে আসছে তাঁর কাছে ; হুন এবং ফরাসী এবং তুর্কী সবাই এসে তাঁকে জ্বালাতন করছে। তুমি জান, কতবার তারা তাঁর ওপরে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করেছে—মাথার চুল পর্যন্ত অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সোজা মস্কোর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেছে সর্বনেশেরা। আর তিনি বসে ছিলেন শান্ত ভাবে, অপেক্ষা করছিলেন। হ্যাঁ। কিন্তু যখন তারা সবাই এসে গেল—বারোটা জাত—বা আরও বেশী ছিল ?—তিনি উঠে দাঁড়ালেন। এবং দুম্ ক'রে একটা শব্দ! এবং ধুলোর মত সব যোদ্ধারা চারদিকে লুটিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের অবশিষ্ট আর কিছু নেই। তারা ছিল—কিন্তু তারা আর নেই। এবং যত দিন গেছে ততই তারা কমে এসেছে ক্রমে ক্রমে, আর আমরা বেড়ে উঠেছি একটু একটু ক'রে। এখন এই এত জনকে রাখবে কোথায়, তাই কেউ জানে না।

"কিন্তু তোমার মতে, আমার বোধ হচ্ছে—একটা ভালো লোক মানে একটা অপদার্থ এবং প্রায় আধ-বোকা। তার কাজ কি ? তার যোগ্য কোনো কিছুই কেউ খুঁজে পাবে না। কি ভাল সে করে ? গলা ফাটিয়ে সে চেঁচায়, জোর গলায় সে যা সব বলে সে সব বলার তার কোনো দরকার নেই—এবং তার জন্য তাকে জেলে পাঠানো হয়। তোমার ধারনা মতো—এই তো একটা ভালো মানুষের ছবি।

"এ ধরনের লোকদের আমার জানা হয়ে গেছে, হর-রকমের অনেক আবোল তাবোল বুকনিওয়ালা ও হাড়-বজ্জাতদের আমি জানি। এমন কি মাননীয় পুলিস ইন্সপেক্টারও অনেকবার আমাকে বলেছে, 'অনেক কিছু তুমি জান বোরজোফ, বুদ্ধি তোমার খুব পাকা!' এই কথাগুলোর জন্যে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু মনে মনে বলেছিলাম, 'লোকটা একটা আস্ত গাধা।' তাঁর বৌ সাত বছর পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী আর তিনি—একটা ভেড়ার ঠ্যাং নিয়ে ভালো খানা-পিনাওয়ালা একটা কুকুরের মত বসে থাকতেন তাঁর বিছানার পাশে। একই বছর ওঁরা মারা গেলেন। লোকে বলে—দুঃখে। ওনার সম্পর্কে লোকে বলত : 'লোকটি ভাল ছিল।' কিন্তু ওর একমাত্র যা ভালো ছিল সে হলো ওঁর ঘোড়াটা। তার ওপর একবার আমি অশুর চালিয়ে

ছিলাম। খাসী করেছিলাম। ভারী চমৎকার তেজী ঘোড়া—সব দিক দিয়ে পয়লা নম্বরের।

"জীবনে যতলোক দেখেছি তার মধ্যে সব চেয়ে মজার লোক ছিল আমাদের মনিব-গিন্নীর ছেলে। যাদের 'ভাল সন্ন্যাসিনী' বলে আমাদের জমিদার-গিন্নি ওলগা নিকোলায়েভনা দুবরোভিনা ছিলেন তাই। তিনি অদ্ভুত এক সন্ন্যাসিনী ছিলেন: তাঁর স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন এবং বাইরে কোথায় গিয়ে গা-ঢাকা দিলেন। খুব টিকোলো নাক, ভীষণ উদ্যমী মহিলা ছিলেন তিনি। চোখে চশমা আঁটা, চশমাটা কালো সুতোয় বাঁধা থাকতো কানের সঙ্গে। 'আমি ডাক্তার'—তিনি বলতেন। কিছু লোকের ওপর ডাক্তারী তিনি করেছিলেন—এও সত্যি। এক অগ্নিকাণ্ডে তাঁর একটি পা গেল ভেঙে এবং তাতেই মহিলা একটু শান্ত হলেন।

"তাঁর ছেলে মিটিয়া, আমার বন্ধু ছিল; যখন ছোট ছিলাম তখন একত্রে খেলাধুলো করেছি। যখন বড় হলাম তখন সে কোথায় চলে গেল লেখাপড়া করতে এবং বেশ কয়েক বছর তার আর দেখা পাইনি। তারপর হঠাৎ একদিন সে যেন বন-বাদার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল; সে ফিরে এল আবার। ইতি মধ্যে আমিও হয়ে উঠেছি অনেক ভেড়ার মালিক। একদিন বনের ধারে বসে একটা তামাক খাওয়ার পাইপ তৈরী করছিলাম, এমন সময় সে আমার কাছে ছুটে এল। 'আমাকে চিনতে পারছিস না?' সে জিজ্ঞেস করলে। সে বেশ লম্বা হয়েছে, একটু রোগা রোগা—এবং টাকও পড়েছে। তার মায়ের মত চোখে চশমা। হাতে তার একটা লাঠি—লাঠিতে একটা মসলিনের থলে বাঁধা, কাঁধের ফেট্টিতে ঝুলছে একটা টিনের বাক্স। সরু সরু দুটো পা—তাকে দেখাচ্ছিল একটা সঙের মত। সে মথ, প্রজাপতি, গুবরে পোকা ধরে বেড়াচ্ছে আর সংগ্রহ করছে ঘাসের নমুনা—যেন উঠতি যাদুকর। যখন ছোট্ট ছিলাম—সেদিনের সেই সব পুরানো কথা সে বলতে লাগল। 'তোর মনে পড়ে, তোর মনে পড়ে?'—এই রকম কেবলি সে বলে চলালো। একটা জিনিস আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম: খুব সার্থক ভাবে বোকা হওয়ার মতো লেখপড়া মিটিয়া বেশ শিখেছে।

"আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন তুমি কি করছ ডিমিট্রি প্যাভলোভিচ?'

"সে বললে, 'পোকামাকড় এবং তাদের জীবনধারার ওপর একটা বই লিখছি।'

" 'বটে—বটে ?' আমি বললাম, 'বেশ সুখের কাজ, সন্দেহ নেই।'

"আমি তাকে সতর্ক ভাবে লক্ষ্য করতে লাগলাম এবং অল্প দিনের মধ্যেই দেখতে পেলাম—লোকটা মাতালের মত উদার—টাকা-পয়সা উড়ানোয় মাত্রা-জ্ঞান নেই। গ্রামের লোকেরা তার কাছে সাহায্য চাইতে সুরু করল—একের পর এক। আমিও তা করেছি। তার কাছ থেকে একটা খড়ের টুপি বাগিয়ে নিলাম—ভারি সুন্দর টুপিটি ছিল। ওই টুপিটা থেকেই আমি খড় থেকে নানা আজেবাজে জিনিস তৈরী করতে শিখেছিলাম। অবশ্য বন্ধু ছিলাম বলে তার কাছ থেকে আমি টাকাকড়িও নিয়েছি। একদিন সে আমাকে একটা ছুরি দিলে, ভারি সুন্দর।

"তার মন ছিল ইঁদুরের মত, কারণ তার বাস্তব-বুদ্ধি না হারানো পর্যন্ত সে শুধু পড়েছে এবং শিখেছে। সে বলত: 'মশা থেকে জ্বর হয়; মশা থেকে সাবধান !' আমি অবশ্য হাসতাম না—যা সে বলত বিশ্বাস করার ভান করতাম। তাই তাকে জিজ্ঞাসা করতাম, 'সেটা কেমন ?' তারপর সে তার বিদ্যের কাটিম থেকে সূতো ছাড়তে সুরু করত। হা ভগবান! হাজার কথা বেরিয়ে আসত গড়গড় করে—তার মধ্যে সারবস্তু ওই পাখির ঠোঁটে যতটুকু ধরে। অথবা বলতে সুরু করত চাষীদের সম্বন্ধে: কি কষ্টের জীবন তাদের! ওই ধারায় যখন কথা বলত তখন এমন কিছু নেই যা তুমি তার কাছে চাইতে পারতে না: 'কষ্টের জীবনই যদি তুমি বলো—আমাকে একটু সাহায্য করতে পার না কেন ?'—এই বললে সে হয়তো তোমাকে একশ' রুবলই দিয়ে বসবে। মেয়েদের মতই হৃদয়টা ছিল তার কোমল। আমি তাকে লক্ষ্য করতাম আর মনে মনে ভাবতাম: 'আমার চেয়ে তুমিই দেখতে পাবে বেশী; কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, তুমি তোমার জীবনটাকে নিয়ে লণ্ডভণ্ড পাকিয়ে তুলছ। কী চাইছ তুমি ? ভালো জুতো পরছ, ভালো পোশাক করছ, ভাল খাচ্ছ, তোমার জমি দিচ্ছ বন্ধক, টাকাও আছে তোমার, আর তুমি চাও কী—বোকা, নচ্ছার সর্বনেশে কোথাকার ?' আমি রীতিমতো চটে যেতাম।

"ছোট ছোট পোকা মাকড় সে সংগ্রহ করে বেড়াত, পথ চলতে চলতে সব কিছুতে সে নাক গলাত এবং ওই খুদে পোকার সন্ধানে তাকে আমি বাদার সব চেয়ে খারাপ খারাপ জায়গায় দিতাম পাঠিয়ে। সেখানে ছোট ছোট টিলার এদিক ওদিকে বেশ গভীর গভীর গর্ত আছে—সব সময়ে সেদিকে নজর রেখে চলতে হয়। রাখাল ছোকরাদের নজর রাখার দোষে কখনো কোনো বাছুর

বা ভেড়া যদি বাদার ওই দিকে গিয়ে পড়তো তা হলে তার আশা ছেড়ে দিতে হত। মাটি তাকে একদম গিলে নিতো। বলা বাহুল্য, ডিমিট্রি প্যাভলোভিচও ওই রকম এক গর্তে দেখতে না দেখতে পড়ে গেল এবং আটকে গিয়ে চেঁচাতে লাগল।"

পুরানো কথা মনে করে বোরজোফ কপাল কুঁচকালো, দাড়ির ভেতরে আঙুল চালাতে চালাতে মৃদু কণ্ঠে বলতে লাগল :

"একদিন তো সে একেবারে গলা পর্যন্ত পুঁতে গেল। রাখাল ছোঁড়ারা তাকে টেনে তুললে এবং সে তার পোশাক আসাক শুকোবার জন্য ঝোপের ওপর সব ঝুলিয়ে দিলে। তারপর আমি আমার এক রাখাল ছোকরাকে বললাম, 'নিকোলকা, ছুটে যা—ওর প্যাণ্টটা লুকিয়ে ফ্যাল।' খেলার আনন্দে ছোকরা ছুট দিলে এবং হুকুম মাফিক্ কাজ সেরে ফিরে এল। তখন প্রায় সূর্যাস্ত হয় হয়। নিকোলকাকে আমি ভেড়ার পাল ঘরে নিয়ে যেতে বললাম। এদিকে মিটিয়াকে প্যাণ্ট ছাড়াই ঘরের দিকে ছুটতে হলো। সেদিন ছিল আবার কি একটা পরবের দিন—অল্প বয়সী মেয়ে এবং মহিলারা চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তারা অবিশ্যি ঠিক হাসে নি। কিন্তু আমার পক্ষে একটা বিশ্রী অন্তিম পর্ব ঘনিয়ে এল। নিকোলকা কথাটা আর চেপে রাখতে পারেনি এবং সকলকে বলে বেড়িয়েছে যে বুদ্ধিটা ছিল আমারই। মিটিয়াও খবরটা শুনলে এবং ফুঁসে ছুটে এল আমার কাছে—মুখে খই ফুটছে, যেন হাওয়া-কল। এত বকুনি সে বকতে লাগল যে তার মুখ লাল হয়ে উঠল, চোখের জলে গাল ভেসে গেল।

" 'তোর জন্যে আমি এই করেছি, সেই করেছি,' সে বললে, 'আর এই তুই তার পুরস্কার দিলি—এঁ্যা?'

"ওইখানে আমাদের বন্ধুত্বের শেষ ; সে আমার কথা শুনতেই চাইল না এবং এর কিছু দিন পরেই সে অসুখে পড়ে। বসন্তকালে শহরে সে মারা যায়। লোকে বলে ক্ষয়রোগ হয়েছিল।

"বেশ, দেখো—এই তো একটা 'ভালো লোকের' নমুনা কিন্তু ভাল তার মধ্যে কি ছিল? তাকে নিয়ে তুমি কি করবে? কোন দরকারে সে লাগবে? সে আঙুলে ফুটে যাওয়া একটা চোঁচের মত। ভদ্রলোকদের মধ্যে এরকম ঢের ঢের মানুষ আমি দেখেছি। সেই যে একটা পুরানো কথা আছে—তা মিথ্যা নয় : 'যে ভদ্রলোক শিকারী কুকুর নয়—সে একটা পশু।'* উঁহুঁ—সে একটা বাছুর।

* রুশ প্রবচন

"পিটার আলেকজান্দ্রোভ বলে আমাদের একজন শিক্ষক ছিল। সে নিজে পড়াশোনা করে এমন হলো যে ছেলে ছোকরাদেরও সে শেখাতে আরম্ভ করে দিলে : 'আমাদের যত দুঃখ সব ওই জার থেকে।' আমি জানি না জার তার কি ক্ষতি করেছিল। স্কুলের সব চেয়ে বয়সে বড় ছেলেটি—ফেদকা সেভিন—সে উচিত কাজটি করলে। পুলিসে খবর পাঠিয়ে দিলে। তার জন্যে ফেদকা পেল সাড়ে সাত রুবল এবং মাস্টারটিকে পুলিস এক রাত্তিরে জেলে টেনে নিয়ে গেল। এই হলো তার এবং তার শিক্ষার শেষ।

"তাই আবার বলি, শিক্ষিত লোকগুলো হলো মাথা-গরম আর বোকা। ওদের থেকে কোনো ভাল হতে পারে না, এক রত্তি না কিন্তু আবোল তাবোল বকে ঢের। ধরো তোমার কথাই : দিব্যি সুস্থ লোক একটা তুমি, লোকজনের সঙ্গে তোমার ব্যবহার সাদাসিধে, আমরা কি ধরনের মানুষ, মনে হয়, এ তুমি বোঝ। কিন্তু সেই একই কথা—তোমার মধ্যে বিপজ্জনক কিছু আছে এবং আমি তা ধরতে পারছি না। কী তুমি চাইছ? এই যে আমি, আমার তামাকের জন্যে একটা থলের দরকার, চমড়ার হলে ভাল হয়। বলতে বাধা নেই, যদি ওটা আমি তোমার কাছে চাই তা হলে এক্ষুনি তুমি গিয়ে ওটা কিনে এনে আমাকে দেবে। কিন্তু তার কারণ শুধু এই যে, টাকা তোমার কাছে সস্তা। তোমাদের শিক্ষিত লোকদের এত দয়ার কারণটা শুধু এই যে, টাকা তোমাদের সহজেই আসে। তুমি চাইছ যা—সেটা কী? আমি বাজী ধরে বলতে পারি, তুমি নিজেকে জান না। আর আমি? আমার কাছে সব পরিষ্কার, বাতির আলোর মত পরিষ্কার। এটা কতকটা এই রকম : আমি চলি সোজা বড রাস্তা ধরে, আর তুমি ঘুরছ গলি-ঘুঁজিতে।"

মেষ-পালক চোখ বন্ধ করলে, মাথাটা হেলিয়ে দিলে পেছন দিকে—বেরিয়ে পড়ল তার লোমশ কণ্ঠার হাড়। এবং তার দাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা অদ্ভুত হাঁপর টানার মতো শব্দ : সে হাসছিল। তারপর একটা আঙুল দিয়ে চোখটা ঘষে নিয়ে সে বলে চলল :

"এই যে কিছুদিন আগে তুমি বললে, পৃথিবী ঘুরছে—এ একেবারে ভুল কথা। এ কথা আমি আগেও শুনেছি। কিন্তু এ শুধু ঘুরছে এই জন্যে যে, অনেক পুঁথিপত্তর পড়ে তোমাদের মাথাটাও ঘুরছে। আর তোমরা চেঁচিয়ে মরছ, 'ওই-পৃথিবী ঘুরছে, ওই পৃথিবী ঘুরছে!' এ একটা ডাহা মিথ্যা বলি আমি। পৃথিবী যদি ঘুরত মানুষ তা সহ্য করতে পারত না।"

জয়-গৌরবে চোখ তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং সে আকাশের দিকে একবার তাকাল। চাঁদের চারদিক ঘিরে একটা লাল রেখা পড়েছে—পুকুরের চকচকে জলে তার ভাঙা-চোরা প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে রইল সে একদৃষ্টে—বললে :

"এই ধরো, তুমি জান না—আগামী কাল আবহাওয়াটা কেমন হবে, জান কি? আমি জানি : খুব নোংরা আবহাওয়া হবে। আমি কেমন করে জানলাম? আমি তোমাকে বলব না; তুমি এ সম্পর্কে কিছুই জান না।"

একটা সিগারেট প্যাকিয়ে, সগর্বে সে বললে :

"মেষ-পালকেরা সব সময় আবহাওয়ার গন্ধ পায়।"

সেদিনের সন্ধ্যা থেকে বোরজোফের ওপর আমি কেমন একটা বিরূপতা বোধ করতে সুরু করলাম। তার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা আর আমার ছিল না এবং প্রায় কয়েক মাস তার দেখাও আমি পেলাম না। তারপর হঠাৎ আমি শুনলাম—কার কাছ থেকে শুনলাম আমার মনে নেই, ওই মেষ-পালকের ছুটি পিতৃ-মাতৃহীন ভাইপো আছে—দুজনেই ওর খরচায় লেখাপড়া করছে, একজন পড়ছে কাজানের পশুচিকিৎসার বিদ্যালয়ে, আর একজন ভ্লাদিমিরের কলেজে। এক দোকানে বোরজোফের সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে যাওয়ায় এ সম্পর্কে কথাটা পাড়লাম।

"এই যে টিম খুড়ো, ওই ভাবে তুমি আমাকে সেদিন মিথ্যে কথা বললে কেন? শিক্ষায় ভাল কিছু হয়—এ তুমি স্বীকার করলে না অথচ ওদিকে দুটি ভাইপোকে তো শিক্ষিত করে তুলছ?"

তার ব্যাঙের মত চোখ দুটো আধবোজা করে এবং দাড়ি নেড়ে সে বলল :

"আ-চ্ছা ···, তা সব সময়ে তোমাকে আমি সত্যি কথা বলব কেন? সত্যি কথা বলার জন্যে প্রায় চড় খেতে হয়।"

পায়ে ভর দিয়ে দুলতে দুলতে যাদুকরের মতো সে হেসে উঠল। তারপর এক চোখ বন্ধ করে, হাসতে হাসতে খুব নীচু গলায় সে বলল :

"ভাইপোরা আমার নিজের রক্ত এবং আত্মীয়, আর তুমি হলে একটা অচেনা লোক, পথ চলতি ভিখিরীর মত। তাই যাতে আমার লাভের সম্ভাবনা—তেমনি করেছি বা বলেছি; যার সামান্যও বোধবুদ্ধি আছে সে ঠিক এমনিই করে। আমার নিজের লোক শিক্ষিত নিশ্চয়ই হবে—কিন্তু অচেনা অজানা লোকেরা নয়; বুঝলে? এই তো কথা।"

তার ভারী থাবাটা সে আমার কাঁধের ওপর রাখল এবং কিছুটা নম্রভাবে বললে : "ইচ্ছা না থাকলেও 'প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেকের ভাই'—এই রকম একটা কথা আছে। তাই, বুঝলে, শুধু আমার নিজের লোকদের সম্পর্কেই আমার মনোযোগ। তুমি কি মনে করো—তারা ভদ্র হয়ে উঠুক এ আমি দেখতে চাই না? আমরাও সম্ভ্রান্ত—আমরা সবাই, অবশ্যই ; শুধু এখন আমরা একেবারে সিঁড়ির তলায় আছি। এখন এসো—ভাগ্যবান তরুণ গাধা, একটু তামাক খাও।"

আমরা বসলাম এবং তামাক খেতে লাগলাম ; একটু অসন্তুষ্ট হয়েই বললাম, "খুব চালাকি করে আমাকে তুমি বোকা বানিয়েছিলে টিম খুড়ো! খুব চমৎকার অভিনেতা তুমি।"

কথাগুলো তার পছন্দ হলো না এবং জবাবে গর্ গর্ করে বললে, "আবার সেই বোকার মতো কথা। অদ্ভুত লোক তুমি, নিশ্চয়ই ওর ভাল একটা রুশ শব্দ আছে—'ভাঁড়।' তোমাদের শিক্ষিত লোকদের সব অভ্যাস গুলো এসেছে বাঁদরদের থেকে। ..."

১৫শ পরিচ্ছেদ ॥ ডোরা

স্বাস্থ্যনিবাসে তখন জনা আষ্টেক মানুষ ছিল যারা ক্ষয়রোগে ভুগছিল। যতো রকমের রোগী আছে তার মধ্যে ক্ষয়রোগীরা হলো সব চেয়ে অস্থিরচিত্ত ; গায়ের তাপ সামান্য একটু বাড়লেই হলো—ভয়ে, রাগে এবং হতাশায় তারা হয়ে উঠবে প্রায় দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য।

ক্ষয়রোগের জীবাণুগুলোর ব্যঙ্গ করার একটা ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায় : একই সময়ে যখন তারা একটা মানুষকে মেরে ফেলছে, তখনই আবার তার মধ্যে জাগিয়ে তুলছে জীবন-তৃষ্ণা। এটাকে যেন আড়াল করেই দেখা দেয় প্রবল প্রণয়-তৃষ্ণা—যা নাকি ক্ষয়রোগের স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়াও অবশ্য আরোগ্যের অতীত রোগীদের মধ্যে দেখা যায়—সুস্থ হয়ে ওঠার একটা অবিচলিত সমুন্নত প্রত্যাশা। বোধ করি ব্যাধি-বিজ্ঞানী স্ট্রোম্‌পেল্‌ই এই অবস্থাটাকে বলেছেন 'ক্ষয়রোগের মানস-প্রত্যাশা।'

আটটি ক্ষয়রোগী, আস্তানা ক্রিমিয়ার এক বোর্ডিং বাড়িতে। তাদের পরিচর্যা এবং দেখা-শুনো করে ডোরা নামে একটি মেয়ে। তার পূর্বপরিচয় অজ্ঞাত। কখনও সে বলে—এস্তোনীয়ার মেয়ে, কখনও বলে—কারেলিয়া

তার জন্মভূমি। তার কথার টানে অবশ্য মনে হয়—সে আসছে তাউরিদ থেকে। এই মুহূর্তে কথা বললে সে তাতারী উচ্চারণে, আবার অন্য সময়ে বললে আর্মেনীয় ঢঙে। বেশ দীর্ঘাঙ্গী সে এবং ভরাট চেহারা কিন্তু পদক্ষেপ লঘু, দ্রুত এবং তৎপর তার চলাফেরা। মুখের ভাব শান্ত ঘোড়ার মতো; তার লাল ঠোঁট দুটিতে লেগে আছে সদয় উজ্জ্বল হাসি এবং সেই হাসির রসে রসায়িত তার আশ্চর্য ফিকে বেগুনী রঙের বড় বড় দুটি চোখ। যখন সে চিন্তিত হয়ে পড়ে তখন তার অনুজ্জ্বল চোখ দুটো যেন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং তার দৃষ্টি ভারী হয়ে উঠে সীসার মতো। সে নিরক্ষর এবং বোকা, বিশেষ করে বোকামি তার ধরা পড়ে যখন সে চালাকি করতে যায়। অক্ষম রোগীরা তাই একটু রসিকতা ক'রে তাকে ডাকে 'ডুরা'* বলে; যেন নাম নিয়ে একটু খেলা করা। কিন্তু মেয়েটি এতে রাগ করে না—বরং হাসতেই থাকে। ছেলেদের প্রতি মায়ের যতটা সহনশীলতা—অক্ষম রোগীদের প্রতি তারও সেই রকম। যখন পুরুষ ক্ষয়রোগীরা তার দিকে তাদের ভেজা ভেজা বিবর্ণ হাতের থাবা বাড়িয়ে দেয়, সে অত্যন্ত শান্তভাবে তার চওড়া লাল পাঞ্জা দিয়ে মুমূর্ষু হতভাগ্যদের করুণ ঘর্মাক্ত হাতগুলো সরিয়ে দিয়ে বলে, "থাবা বাড়িও না—তোমার পক্ষে ও সব ভাল নয়।"

জেদের সঙ্গে অনেকেই তার কাছে ভালবাসা জানিয়েছে। দোকানদার কন্‌ট্রাকটার এবং একবার এক বিপত্নীক শক্তসমর্থ জেলে। তার উগ্র সৌন্দর্য, তাঁর দৈহিক ক্ষমতা, তার অশ্রান্ত শক্তি, তার সহজ সরল প্রকৃতি তাদের আকর্ষণ করেছে। এই শান্ত বিনম্র প্রাণীটিকে প্রত্যেকেই জীবন-সঙ্গিনী রূপে জয় করে নিতে চেয়েছে কিন্তু তাদের প্রতি তার ব্যবহারটা যেন স্বাধীন ও বিত্তবান কোনো লোকের মত; কখন এবং কি ভাবে সে তার ধনসম্পদকে কাজে লাগাবে—তা ভালো করেই যেন তার জানা আছে। তার সেই এক দুর্বোধ্য কিন্তু প্রশান্ত হাসি দিয়ে যেমন সে বিয়ের সব প্রস্তাব খারিজ করেছে তেমনি শুনে গেছে অক্ষম রোগীদের অশেষ খামখেয়ালী সব কথা এবং দু-হাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে তাদের নিষিদ্ধ সব সোহাগ।

গরমে সে ভয়ানক কষ্ট পায়—এমন কি যখন হাওয়া বইতে থাকে উত্তর থেকে অথবা পাহাড়ের উপরে এই ছোট বাড়িটাকে গলে পড়া মেঘের মত ঘন কুয়াশা আচ্ছন্ন করে দেয়—তখনও। অক্ষম রোগীরা হয়তো তখন মোটা কম্বলে

---

* ডুরা অর্থাৎ নির্বোধ।

এবং গরম কোটে সর্বাঙ্গ ঢেকে আবহাওয়া খারাপ হওয়ার জন্য অভিযোগ করতে থাকে। রাত্রে সকলকে ঘুম পাড়িয়ে ডোরা মাথায় জড়াবে একটা কালো রুমাল—এক কোণে তার লাল গোলাপের নক্সা। বেরিয়ে আসবে সে বারান্দায়। সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে, আকাশের দিকে চোখ তুলে আমার জানালার নীচে—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে আর প্রার্থনা করবে:

"ওগো ঈশ্বর খৃষ্ট। ঈশ্বরের বিনম্র অনুচর হে সেন্ট নিকোলাস।..."

কবিতার দিকে কোনো ঝোঁক আমি ডোরার মধ্যে লক্ষ্য করিনি। ফুল-টুলের সে তোয়াক্কা করে না—তার মতে, যতো ধুলো এবং আবর্জনায় ও সব ঘর ভরে দেয়। এক রাত্রে, পেটের ক্ষয়রোগে মরণাপন্ন এক পাদ্রীর স্ত্রী যখন আকাশ এবং তারার সৌন্দর্যচ্ছটায় ভাবে গদ্‌গদ্‌ হয়ে উঠেছিলেন তখন ডোরা অত্যন্ত গদ্যময় ভঙ্গীতে তার সব উত্তেজনা দপ্‌ করে নিভিয়ে দিয়ে বলে উঠেছিল, "আকাশ একটা অমলেটের মতো।..."

একদিন এসে হাজির হলো নবম রোগী। অত্যন্ত কষ্টসৃষ্টে, কোনো রকমে হাঁপাতে হাঁপাতে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে সে বারান্দায় এল এবং সিঁড়ির থামটা ধরে ডোরাকে বললে: "দেখ—কেমন চমৎকার লোক একটা আমি—এ্যাঁ?"

কথা কটা বললে সে বিষাদে আনন্দে মিশিয়ে। হাসতে হাসতে তাকাল সে দীর্ঘকায় এই মেয়েটির দিকে আর তার পরিপূর্ণ সুগোল বক্ষদেশের দিকে।

"বাঃ কি সুস্থ মানুষ একটা তুমি!" হাঁ করে দ্রুত খানিকটা বাতাস নিয়ে ঘড় ঘড়ে গলায় সে বললে, "আবার সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করবে তুমি আমাকে—তাই না?"

"নিশ্চয়ই।" আর্মেনীয় উচ্চারণের ভঙ্গীতে ডোরা জবাব দিল।

মুখটা তার প্যাঁচার মত, বেড়ালের মতো গোল গোল দুটো চোখ, নাকের ডগাটা বেঁকে ঢুকে গেছে ভেতর দিকে, ছোট, কালো গোঁফ একটুকু—মুখটা নিষ্ঠুর এবং বিদ্রূপে ভরা।

সেই দিন থেকে ডোরা যেন যাদু মন্ত্রে বদলে গেল—এ আমাদের ভারী অস্বস্তি। সে আমাদের ইচ্ছা অভিলাষ অগ্রাহ্য করতে সুরু করল, আমাদের ঘর দিয়ে চলে যায় দ্রুত, সাফ করে অবহেলা ভরে, আমাদের অভিযোগ অনুযোগে রাগ করে উত্তর দেয়,—এদিকে তার ঘোড়ার মতো চোখে কেমন একটা নেশার আমেজ ঝকমক করে। সহসা সে যেন কালা এবং অন্ধ হয়ে গেল। প্রায়ই তার সব চিন্তা পড়ে থাকে বারান্দার ওই দিকে—যেখানে

প্যাঁচার মত দেখতে সেই খুদে ছাত্র ফিলিপোফ শুয়ে শুয়ে কাশছে এবং নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য হাঁপাচ্ছে। দিনের মধ্যে একটু সময় পেলেই সে ছুটে যায় তার কাছে, সূর্যাস্তের পর গা ঢাকা দেয় তার ঘরে গিয়ে এবং কোনো প্রলোভনেই সেখান থেকে তাকে আর বার করা যাবে না।

কিন্তু ফিলিপোফ এগিয়ে চলেছে মরণের দিকে। কেমন একটা অস্বাভাবিক ভাবে মরছে সে—হাসি আর বিদ্রূপের মাঝখানে। মিলনমধুর কোনো গানের একটা সুরকে শিস দিচ্ছে সব সময়ে—এই শক্তিটকু খরচ করার ফলে আসছে কাশির দমকের পর দমক। কেমন একটা কৃত্রিমতার ভান আছে তার; কিছুটা বেপরোয়া—নেতিবাদী। খুব চাতুর্যের সঙ্গে পরা তার এই মুখোস।

"এই সব অসম্ভব যুক্তিহীন ব্যাপারগুলো সম্পর্কে তুমি কি মনে করো বলো তো ভায়া?" তার বেরাল চোখের একটা খোঁচা মেরে সে আমাকে জিজ্ঞেস করত: "এগুলো তুমি পছন্দ করো? এই দিন, রাত্রি, জন্ম, ভালবাসা, জ্ঞান, মৃত্যু—এ্যাঁ? ভারী মজার—তাই না? বিশেষ করে ছাব্বিশ বছরের একটা মানুষের কাছে—মানে, আমি নিজের কথাই বলছি। ··· ডোরা!"

তারপর আমি শুনতে পেতাম চায়চের ঝনঝন শব্দ অথবা আসবাবপত্র ঠেলাঠেলির শব্দ এবং দেখা দিত এসে ডোরা, বড় বড় চোখ দুটো মেলে ফিলিপোফের আদেশের অপেক্ষা করত নিঃশব্দে।

"অয়ি শুভে, হস্তিনী বুড়ী, কিছু আঙুর এনে দাও আমাকে, চট্‌পট্।" ওকে হুকুম দিয়ে, আমার দিকে ফিরে মন্তব্য করত, "মেয়েটা বড় অবোধ এবং বোকা।"

অন্য সব রোগীদের সে ঘৃণা করত এবং তাদের ছোট-খাটো পাগলামীকে নির্দয়ভাবে বিদ্রূপ করত। আবার তাকেও কেউ পছন্দ করত না। আর আমার ব্যাপারে, সে এবং আমি দু-জনে দিব্যি বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম, কারণ সে সাহিত্য ভালবাসত এবং এইটাই আমাদের দু-জনকে খুব অন্তরঙ্গ করে তুলেছিল।

"মানুষের সমস্ত আবিষ্কারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো তার সাহিত্য," নীল ঠোঁটের ওপরে জিভ বুলিয়ে সে বলত।—"এবং যতটা তা জীবন থেকে দূরে থাকে ততই ভাল।"

আমার বোধ হত—ক্ষয়রোগের চেয়ে অন্তরের একটা প্রচণ্ড আঘাত তাকে মেরে ফেলছে বেশী।

এই বোর্ডিং বাড়িতে ঢোকার উনসোত্তর দিনের মাথায় সে মারা গেল। মরবার সময় তার মৃত্যু-যন্ত্রণার প্রলাপের মধ্যে বিড় বিড় করে বলেছে, "ফিমা, সারা জীবন ধরে ··· তোমাকে ভালবাসতাম ··· একা ··· চিরদিন, ফিমা, প্রিয়তমা।"···

আমি তার পায়ের দিকে বিছানায় বসেছিলাম এবং ডোরা দাঁড়িয়েছিল ফিলিপোফের পাশে, ওর খরখরে চুলের ওপর তার বিরাট থাবাটা বুলোতে বুলোতে সে ফোঁপাচ্ছিল।

তার বগলের তলায় একটা কাগজের মোড়ক দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছিল।

"ও কী বলছে?" চিন্তিত ভাবে এবং ঔৎসুক্যের সঙ্গে খানিকটা এগিয়ে এসে ডোরা জিজ্ঞেস করল, "ফিমা কে?"

"আপাতত তো বোঝা যাচ্ছে একটি মেয়ে—একটি স্ত্রীলোক, যাকে ও ভালবাসত এবং এখনও বাসে।"

"ও? ওই ফিমাকে!" সবিস্ময়ে ডোরা উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করলে। "না—না, আমাকেই ও ভালোবাসে। এখানে আসার পর থেকেই ও আমাকে ভালবাসতো।"···

কিন্তু ছাত্রটির প্রলাপোক্তি আবার কান পেতে শুনে সে তার বিবর্ণ চোখ তুলে তাকাল, অ্যাপ্রনে তার অশ্রুশিক্ত মুখটা মুছে ফেললে এবং আমার হাঁটুর ওপরে কাগজের মোড়কটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠল, "অন্ত্যেষ্টির কাপড়-চোপড়, মোজা, সার্ট, চটি।" এবং নিঃশব্দে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মিনিট কুড়ি পরে ফিলিপোফের প্রলাপ থেমে গেল। সাদা দেয়ালের ওপর জানালার কালো চৌকাঠটার দিকে সে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। স্পষ্টত যেন কিছু বলতে চাইল কিন্তু কথা তার বন্ধ হয়ে গেল। তারপর ভেতরে বাইরে একেবারে নিঃশেষিত প্রায়, তার ছোট্ট শরীরটা আস্তে আস্তে সোজা হয়ে অনন্ত শান্তির মধ্যে স্থির হয়ে গেল।

ডোরাকে খুঁজতে গেলাম। বারান্দায় সে দাঁড়িয়েছিল; দূরে আকাশ আর সমুদ্র যেখানে অস্পষ্ট দুটি কৃষ্ণবর্ণের মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে সেই দিকে সে তাকিয়েছিল। তার ভারী মুখটা সে আমার দিকে ফেরাল এবং আমি দেখে বিস্মিত হলাম—কি কঠিন সে মুখ।

"সে মারা গেছে। যাও তার ব্যবস্থা করো ডোরা।"

"আমি পারবো না।"

পা দিয়ে থুতু মোছার মত ডোরা মেঝের ওপর পা ঘষতে লাগল।

"আমি পারবো না।" সে আবার বললে। "ওই রকম একটা লোকের সঙ্গে কোন ব্যাপারেই আর জড়িয়ে থাকতে চাই না। তেবে দেখ—কি রকম মানুষ! সে বলত—সে আমাকেই ভালোবাসে—অথচ সব সময়ে ···"

"তা বটে, কিন্তু তুমি কি দেখনি—সে তখন মারা যাচ্ছিল ?"

"বেশ তো, তাতে কি ? আমি দেখেছি বৈকি, আমি অন্ধ নই। আমার শেষ পয়সাটি খরচ করে, এমন কি আমি তার অন্ত্যেষ্টির কাপড়-চোপড় পর্যন্ত কিনে ছিলাম। যে মুহূর্তে সে এসেছিল—তখনই আমি দেখেছিলাম এবং মনে মনে বলেছিলাম : বেচারী।··· মরতেই যখন বসেছে! মরে তো সকলেই। কিন্তু মিথ্যা খেলা কেন ? 'আমি কখনো কোনো মেয়েকে ভালোবাসিনি—' সে বলত। এখন এই নাও—এই একটি মেয়ে নাও।··· যতটা মরতে চাও মরো কিন্তু মিথ্যা খেলা ক'রো না।"

গলা নামিয়ে সে কথা বলছিল এবং বোধ হচ্ছিল—অন্য কিছু যেন ভাবছে। তারপর হঠাৎ সে ফুঁপিয়ে উঠল—এমন যন্ত্রণাদায়ক সে চাপা কান্না, যেন কান্নায় কান্নায় ভরা গরম পানীয়ের পাত্র সে গলায় ঢেলে দিয়েছে এবং নির্মম ভাবে পুড়িয়ে ফেলেছে নিজের ভেতরটা।

"এসো, ডোরা।"···

"যাও—তুমি তার সাজগোছ করে দাও, এত যদি তোমার দয়াল হৃদয় হয়! আমি ··· না, না। আমি পারবো না। তার কাছে আমি কি ছিলাম—সুখে সময় কাটাবার একটা উপায় মাত্র ?"

"শেষ সজ্জা করতে আমি জানি না।"

"আমার অতো কি ? আমি তার কাছে অচেনা—তাই না ?"

"যা-ই হোক—সে মারা গেছে!"

"বেশ তো, তাতে কি হলো ? আমাকে বোঝাবার চেষ্টা ক'রো না। ওই ধরনের লোকের দিকে আমি আর তাকাতেও চাইনে।··· মিথ্যা খেলা করা উচিত নয়।"···

শেষ পর্যন্ত সে শেষ-সজ্জাও করতে চাইল না—যেতেও চাইলে না, বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল একা।

আমি যখন অন্তিম সজ্জায় ছাত্র ফিলিপোফকে সাজাচ্ছি—এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম একটা চাপা বুকভাঙা কান্না। আমি লাফিয়ে বারান্দায় এলাম।

মানুষকে দেওয়া হয়েছে কান্না—কখনো সে এক অসাধারণ, উচ্ছ্বসিত, তপ্ত অশ্রুপ্রবাহের কান্না তাকে কাঁদতে হয়; অশ্রু সজল সে-ই কান্না ডোরা কাঁদছিল। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে, রেলিংয়ে মাথা ঠুকে, ফুঁপিয়ে এবং ককিয়ে ককিয়ে জোরে জোরে সে বলছিল:

"অত্যাচারী প্রিয় আমার, আমার ছোট্ট দুষ্টু... আমার প্রিয়তম, আমার অবিস্মরণীয় শিশু।"...

১৬শ পরিচ্ছেদ ॥ মানুষ যখন একলা থাকে

ঘিয়ে রঙের মোজা পরা, অল্প বয়সী মেয়ের মতো অপরিণত দেহ, একটি ছোটখাটো সুন্দরী মহিলাকে আমি আজ লক্ষ্য করছিলাম। ত্রোয়িৎস্কি ব্রিজের ওপরে, ধূসর রঙের দস্তানা পরা হাত দিয়ে এমন ভাবে একটা থাম ধরে উনি দাঁড়িয়েছিলেন যেন নেভার জলে লাফ দিয়ে পড়বার উদ্যোগ করছেন। দেখলাম তিনি তাঁর ছোট্ট ছুঁচালো গোলাপী জিবটা বের করে চাঁদকে দেখাচ্ছেন।

চাঁদের বুড়ো মানুষটা, আকাশের সেই ধূর্ত শেয়াল, নোংরা ধোঁয়ার মেঘের আড়ালে আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে এগিয়ে চলেছে তখন। আকারে সে বেশ বড়সড় এবং গাল তার গাঢ় রক্তিম—যেন পানের মাত্রাটা একটু বেশীই হয়ে গেছে। যেন গায়ের ঝাল মেটাবার জন্যেই তরুণীটি তাকে সত্যি সত্যি ভ্যাংচাচ্ছিল—অন্তত: ব্যাপারটা দেখে আমার তাই মনে হয়েছিল।

তাঁকে দেখে এমনি অভিনব অদ্ভুত কতকগুলো ব্যাপার আমার মনে পড়ল —যা দীর্ঘদিন আমার মনে ধাঁধা লাগিয়ে এসেছে। মানুষ যখন একা থাকে, সে কি রকম আচরণ করে—এই ব্যাপারে যখনই আমি লক্ষ্য করেছি, তখনি আমাকে সব সময়ে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয়েছে যে, সে 'পাগল'—এ ছাড়া প্রকাশের আর কোনো শব্দ আমি পাইনি।

প্রথমে এ ব্যাপারটা চোখে পড়েছিল যখন আমি বালক মাত্র: রোনডেল নামে সার্কাসের এক ভাঁড়, জাতে ইংরেজ—এগিয়ে যাচ্ছিল সার্কাসের প্রবেশ পথের গলি দিয়ে—জায়গাটা তখন ছায়া-ছায়া এবং জনমানব শূন্য। হঠাৎ একটা আয়না পড়ল সামনে। রোনডেল মাথার উঁচু মতো টুপিটা খুললো তার সামনে দাঁড়িয়ে এবং নিজের প্রতিবিম্বকে মাথা নুইয়ে সসম্মানে অভিবাদন জানালো। সে ছাড়া ওখানে আর কেউ ছিল না। আমি তার মাথার ওপরে একটা জলের ট্যাংকের ওপর বসেছিলাম, আমাকে সে দেখতেও পায়নি।

তার সশ্রদ্ধ অভিবাদনের সময় আমি শুধু সেই মুহূর্তে মুখ বাড়িয়ে দেখে ফেলেছিলাম। ভাঁড়ের এই ব্যাপারটি আমাকে কেমন একটা অস্পষ্ট এবং অস্বস্তিকর ভাবনার মধ্যে ডুবিয়ে দিল। সার্কাসের ভাঁড় সে, অধিকন্তু একজন ইংরেজ, তার বৃত্তি অথবা শিল্পকৃতি হলো উৎকট ভাঁড়ামি।

তারপর দেখেছিলাম আমার এক প্রতিবেশীকে—এ. শেখভ তার নাম। তার বাগানে বসে বসে টুপিতে সূর্যরশ্মি একটা ধরে, টুপি এবং রশ্মি—দুই-ই এক সঙ্গে মাথায় চাপাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল বারবার। আমি লক্ষ্য করছিলাম—এই ব্যর্থতা রশ্মি-শিকারীকে বিরক্ত করে তুলছিল! মুখ তার লাল হয়ে উঠছে ক্রমশ এবং শেষ পর্যন্ত টুপিটা ঠুকে দিলে হাঁটুর ওপরে। তারপর দ্রুত টুপিটা মাথায় দিয়ে অত্যন্ত অধীর ভাবে পাশের কুকুরটাকে ঠেলে দিল দূরে। আধ বোজা চোখে আকাশের দিকে মিটমিট করে তাকিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। বারান্দায় আমাকে দেখতে পেয়ে হাসল এবং বললে :

"সুপ্রভাত ! বেলমন্টের কবিতাটা পড়েছ—'সূর্যে ঘাসের গন্ধ' ? বোকামি—তাই না ? রাশিয়ায় ওর গন্ধ কাজানের সাবানের মতো আর এখানে—তাতারী ঘামের।"

স্বয়ং শেখভও* তাঁর টনটনে আক্কেল নিয়েই একটা ছোট ওষুধের শিশির মুখের মধ্যে একটা মোটা লাল পেনসিল ঢোকাবার চেষ্টা করেছেন—ফলে পদার্থ বিজ্ঞানের বিশেষ সত্যকেও যেমন ভেঙেছেন—তেমনি ভেঙেছেন শিশিটাও। বিজ্ঞানীর অটল এক ধরনের একরোখামি নিয়ে একটা যেন পরীক্ষার গোঁ ধরেছিলেন তিনি।

লিও টলস্টয়ও একবার একটা গিরগিটিকে ফিস ফিস করে বলেছিলেন :
"তুমি কি সুখী—এ্যাঁ ?"

দুলবার যাওয়ার পথের ধারে ঝোপঝাড়ের ভেতরে একটা পাথরের ওপরে বসে গিরগিটিটা রোদ পোয়াচ্ছিল। আর তিনি চামড়ার কোমর-বন্ধনীতে হাত ঢুকিয়ে তাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। তারপর সতর্কভাবে চারিদিকটা একবার দেখে নিয়ে সেই মহৎ মানুষটি গিরগিটিটাকে মনের কথা খুলে বলেছিলেন :

"আর আমি !—আমি সুখী নই !"

রসায়নবিদ অধ্যাপক তিখভিনিস্কি আমার খাওয়ার ঘরে বসে আমার চায়ের

* সম্ভবত প্রখ্যাত লেখক ইনি।

টেতে নিজের ছায়াকে দেখে বলেছিলেন: আচ্ছা—পুরানো বন্ধু আমার, বলো তো—জীবনটা কেমন ?"

ছায়া কোনো উত্তর দিল না ; তাই তিখভিনিস্কি গভীর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন এবং খুব সাবধানে ছায়াটাকে হাত দিয়ে মুছে ফেলতে চাইলেন। ভুরু গেল কুঁচকে এবং নাকটা কুঁকড়ে হয়ে গেল হস্তীভ্রূণের শুঁড়ের মতো।

এন. এস. লেসকফের কথা শুনেছিলাম আমি—কে যেন দেখেছিল: লেসকফ চেয়ারে বসে, কিছুটা তুলো শূন্যে তুলে ছেড়ে দিচ্ছেন এবং টেবিলে রাখা চিনে-মাটির একটা বাটিতে এসে সেটা পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রত্যাশায় ঝুঁকে পড়ে কান পেতে শোনবার চেষ্টা করছেন—চিনে-মাটির বাটিতে তুলোটা পড়বার সময় কতটা শব্দ হয়।

পাদ্রী এফ. ভ্লাদিমিরস্কি একবার সামনে এক জোড়া জুতো রেখে খুব মর্মস্পর্শী কণ্ঠে বলে উঠলেন: "এবার তবে—যাও !" তারপর বললেন, "আহা পারলে না ?" গম্ভীর এবং সংশয়াতীত কণ্ঠে তারপর বললেন ; "দেখলে তো ! আমাকে ছাড়া তুমি কোথাও যেতে পার না !"

সেই মুহূর্তে, আমি ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলাম, "কি করছেন ফাদার ?"

মনোযোগ দিয়ে পাদ্রীসাহেব আমার দিকে তাকালেন এবং ব্যাখ্যা করে বললেন: "এই জুতোটার গোড়ালিটা একেবারে খয়ে গেছে। আজকাল এমন সব বাজে জুতো তৈরী করে !"

আমি প্রায়ই লক্ষ্য করে দেখেছি—মানুষ যখন একা থাকে তখন তারা কেমন করে হাসে এবং কাঁদে। একজন লেখক, সম্পূর্ণ ধীর স্থির একজন মানুষ—মদের নেশায় যে কখনো আত্মহারা হয়নি, একলা থাকলেই সে কাঁদতো। শিস দিয়ে গাইতো পুরানো সুরের একটা গান: "যখন আমি একলা এলাম পথে !" মেয়েদের মতই শিস সে ভাল দিতে পারত না এবং ঠোঁট তার কেঁপে কেঁপে উঠত: ধীরে ধীরে চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ত জলের ফোঁটা—হারিয়ে যেত কালো গোঁফ দাড়ির মধ্যে। একবার এক হোটেলের ঘরে সে চিৎকার করে উঠল, জানালার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে, দুহাত ছড়িয়ে দিয়ে সে যেন সাঁতার কাটার ভঙ্গী করতে লাগল ; ব্যাপারটা ব্যায়ামের জন্য মোটেই নয়—কারণ হাত নাড়ার ভঙ্গী ছিল খুব আস্তে আস্তে এবং না ছিল তাতে জোর না ছিল ছন্দ।

অবশ্য এটা এমন কিছু অদ্ভুত নয়: হাসি এবং কান্না সুস্থ ও স্বাভাবিক মনেরই একটা অভিব্যক্তি। ওতে কারুর ধাঁধা লাগে না। এমন কি প্রান্তরের মধ্যে বা জঙ্গলে বা সমতলে অথবা সমুদ্রে মানুষের নিঃসঙ্গ নৈশ-প্রার্থনাতেও ধাঁধা লাগে না।

আমার নিরাগিভোরের প্রতিবেশী ছিল ভরোনজ জেলার একজন জমি-জমার মালিক। একদিন ভুলে, অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায়, কিন্তু বেশ ধীর স্থির মনেই আমার ঘরে এসে ঢুকে পড়লেন। আলো নিভিয়ে দিয়ে আমি তখন চুপচাপ বিছানায় শুয়ে ছিলাম। জ্যোৎস্নার আলোয় ঘর আমার ভরে গেছে। মশারীর জালির ভেতর থেকে আমি দেখতে পেলাম—ভদ্রলোকের শুকনো মুখে একটা বিচিত্র হাসি। নিজের সঙ্গেই অস্ফুট কণ্ঠে কথা বলতে সুরু করলেন:

"ওখানে কে?"

"আমি।"

"এটা তোমার ঘর নয়।"

"ওহো, আমাকে ক্ষমা করো!"

"দয়া করে ···"

ভদ্রলোক থেমে গেলেন, ঘরের চার দিকটা দেখে নিলেন, আয়নায় প্রতিফলিত নিজের গোঁফ-দাড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন সপ্রশংস দৃষ্টিতে এবং খুব মৃদুকণ্ঠে গান ধরলেন:

"আমি এসে পড়েছি ভুল জায়গায়—জায়গায় ···
কেমন করে হলো এটা, এটা, এটা? ···"

এর পরে, ঘর ছেড়ে যাওয়ার পরিবর্তে ভদ্রলোক একটা বই টেনে নিলেন এবং টেবিলের ওপর সেটা রাখলেন উল্টো করে। তারপর বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে কারুকে যেন বকছেন এমন ভাবে জোরে জোরে বলে উঠলেন:

"দিনের মতো আলো এখন—আর দিনের বেলায় ছিল অন্ধকার আর ভয়ংকর। দিব্যি ব্যবস্থা—এঁ্যা?"

তারপর চেপে চেপে পা ফেলে, দুটো হাত ছড়িয়ে দিয়ে যেন ভারসাম্য রক্ষা করে সন্তর্পণে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একটা বাচ্চা যখন বইয়ের পাতায় আঙুল ঘষে ঘষে কোনো ছবি তোলবার চেষ্টা করে তখন ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হয় না; কিন্তু একজন বিজ্ঞানী—অধ্যাপক, এই রকম একটা কাণ্ড করছেন এবং ধরা পড়ার ভয়ে

পেছন ফিরে ফিরে দেখছেন আর উৎকর্ণ হয়ে কিছু শুনছেন, এ দেখলে বিস্মিতই হতে হয়।

এই অধ্যাপকেরই এমন একটা সুস্পষ্ট বিশ্বাস হয়েছিল যে ছাপা ছবিটা কাগজের ওপর থেকে তুলে নেওয়া এবং তাঁর ওয়েস্ট কোটের পকেটে লুকিয়ে ফেলা সম্ভব। দু-একবার তিনি ভাবলেন—তিনি সফল হয়েছেন, পৃষ্ঠা থেকে কিছু একটা তিনি তুলে নিলেন এবং দু-আঙুল দিয়ে যেমন টাকা পয়সা ধরে তেমনি ভঙ্গীতে সেটাকে তুলে নিয়ে পকেটে চালান করে দিলেন ; কিন্তু তারপর আঙুলের দিকে তাকিয়ে তিনি কপাল কুঁচকোলেন। ছবিটা আলোর দিকে তুলে ধরলেন এবং আবার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় ছাপা ছবিটা ঘষে ঘষে তুলে ফেলতে চেষ্টা করলেন। শেষ পর্যন্ত এতে কোনো ফল হলো না দেখে বইটা এক পাশে ঠেলে দিলেন এবং রাগে গট্ গট্ করে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি গিয়ে বইটা সযত্নে পরীক্ষা করে দেখলাম। জার্মান ভাষায় লেখা ওটা একটা যন্ত্র-শিল্পের বই—নানা বৈদ্যুতিক যন্ত্র এবং তার নানা অংশের ছবি দিয়ে বইটা ছাপা। ওতে এমন একটা ছবিও ছিল না যা আঠা দিয়ে সাঁটা এবং এ-ও স্পষ্ট প্রতীয়মান যে ছাপা কোনো কিছু ওই ভাবে তুলে নিয়ে পকেটে ভরা যায় না। অধ্যাপকও হয়তো এটা জানতেন—যদিও তিনি যন্ত্রশিল্পী ছিলেন না, ছিলেন সাধারণ মানব-বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

মেয়েরাও, যখন একা একা তাস নিয়ে পেসেন্স খেলেন অথবা সাজসজ্জা করতে ব্যস্ত থাকেন তখন প্রায়ই তাঁরা নিজের সঙ্গে কথা বলেন। একবার এক সুশিক্ষিতা মহিলাকে আমি পুরো পাঁচটি মিনিট ধরে লক্ষ্য করেছিলাম—নির্জনে মেঠাই খাচ্ছেন এবং প্রত্যেকটি মেঠাইকে ছোট একটা চিমটে দিয়ে শূন্যে তুলে ধরে তার সঙ্গে কথা বলছেন : "আঃ—তোকে খাব!" সেটিকে খেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "এবার কাকে?"

"বেশ, খাইনি আমি?"

তারপর আবার : "আমি তোকে খাব!"

"খেলুম না আমি?"

জানালার কাছে একটা আরাম কেদারায় তখন বসেছিলেন তিনি, গ্রীষ্মের সন্ধ্যা—প্রায় পাঁচটা হবে। বিরাট শহরের নানা শব্দ রাস্তা থেকে পাকিয়ে উঠে ঘর ভরে দিয়েছে। মহিলার মুখে গুরু গাম্ভীর্য আর তাঁর খয়েরী চোখ কোলের ওপরে রাখা মেঠাইয়ের বাক্সের দিকে দৃঢ়নিবদ্ধ।...

একবার এক থিয়েটারের এক ফালি সরু এক বারান্দায় এক সুন্দরী মহিলাকে দেখেছিলাম, মাথা ভরা কালো চুল। আসতে তাঁর দেরি হয়ে গিয়েছিল। একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মাথার চুল ঠিক-ঠাক করে নিচ্ছিলেন এবং কাকে যেন কঠিন ও উঁচু গলাতেই বলছিলেন :

"এবং তবু—একজনকে মরতেই হয়েছে ?"

বারান্দায় আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না—থিয়েটারে আসতে আমারও দেরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি আমাকে দেখেন নি। এবং দেখে থাকলেও, আশা করি ওই রকম একটা অনুচিত প্রশ্ন তিনি আমাকে করার কথা চিন্তাও করেননি।

মানুষ যখন একলা থাকে তখন অনেকের মধ্যেই এমনি ধরনের বিচিত্র অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়। এই আর একটি দৃষ্টান্ত :

আলেকজাণ্ডার ব্লক * এক সাধারণ পাঠাগারের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কি একটা বইয়ের পাশে পেন্সিল দিয়ে কি যেন লিখছিলেন। হঠাৎ সিঁড়ির থামের গা ঘেঁষে সরে দাঁড়িয়ে কাকে যেন সসম্মানে যাওয়ার পথ করে দিলেন। আমি তাঁকে প্রায় কাছ থেকেই লক্ষ্য করছিলাম কিন্তু তাঁর পাশ দিয়ে কারুকেই যেতে দেখলাম না। .. আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম ওপরে—সিঁড়িতে নামবার মুখে। ব্লকের মুখে লেগেছিল একটু হাসি-হাসি ভাব। তাঁর পাশ দিয়ে চলে যাওয়া কল্পিত মানুষটিকে তাঁর দৃষ্টি যেন অনুসরণ করছিল—তার পর হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে গেল আমার সঙ্গে। বোধ করি হঠাৎ অবাক হয়ে—হাত থেকে তাঁর পড়ে গেল পেন্সিলটা, ঝুঁকে পড়লেন সেটা কুড়োবার জন্যে এবং জিজ্ঞেস করলেন :

"আমি কি দেরি করে ফেলেছি ?"

১৭শ পরিচ্ছেদ ॥ লিও টলস্টয় প্রসঙ্গে

নাবাল মতো এক রাস্তায় তিনি আমার নাগাল ধরে ফেললেন। সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল। একটা শান্ত ছোট তাতারী ঘোড়ায় চড়ে তিনি যাচ্ছিলেন লিভাদিয়ার দিকে। এক মাথা সাদা ঝাঁকড়া চুল, হালকা সাদা রঙের ব্যাঙের ছাতির মত একটা পশমের টুপি মাথায়—সেই নাবাল রাস্তায় তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন ভূগর্ভের অধিপতি তিনি।

* রাশিয়ার বিখ্যাত কবি

ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে তিনি আমায় ডাকলেন এবং আমি তাঁর ঘোড়ার পাশে পাশে চলতে লাগলাম। নানা কথার মধ্যে আমি তাঁকে জানালাম যে ভি. জি. কোরোলেংকোর কাছ থেকে আমি সম্প্রতি একটা চিঠি পেয়েছি। টলস্টয় ক্রোধে দাড়ি-নাড়া দিলেন।

"সে কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি জানি না।"

"তার মানে—তার সম্বন্ধে আসল কথাটাই তুমি জান না। সে আস্তিক—ঈশ্বরবিশ্বাসী, নাস্তিকদের সামনে এ কথা স্বীকার করতে সে ভয় পায়।"

আধ-বোজা চোখের পাতার তলা দিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন তিনি গর্ গর্ করে—বিরক্তি ভরা কণ্ঠে। পরিষ্কার মনে হচ্ছিল—আমার সঙ্গে কথা বলার মেজাজ তাঁর নেই। কিন্তু যখন বিদায় নিতে চাইলাম তিনি আমাকে যেতে দিলেন না।

"তুমি চলেছ কোথায়?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন। "আমি কি খুব জোর কদমে যাচ্ছি?"

এবং আবার তিনি গর্ গর্ করতে সুরু করলেন:

"তোমার আন্দ্রেইফও নাস্তিকদের ভয় পায় কিন্তু সে-ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করে—এবং ঈশ্বরও তাকে তাঁর সম্বন্ধে শংকিত করে রেখেছে।"

আমরা যখন গ্র্যাণ্ড ডিউক এ. এম. রোমানফের জমিদারীর সীমান্তে এসে পড়েছি তখন দেখি—রোমানফ বংশের তিন বংশধর রাস্তার ওপর খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কথা বলছে। একজন ছিলেন আই-তোদোরের মালিক, অন্যজন জর্জ এবং তৃতীয়টি আমার মনে হয় দুলবার্তের পিয়তর নিকোলায়েভিচ—সকলেই ওঁরা প্রভুত্বপরায়ণ মানুষ। রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিল একটা এক্কা এবং এক পাশে দাঁড়িয়েছিল একটা জিন দেওয়া ঘোড়া। ও দুটোর মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারলেন না লিও নিকোলায়েভিচ (টলস্টয়)। কঠিন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন রোমানফ বংশধরদের দিকে—কিন্তু তার আগেই তারা পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত জিন দেওয়া ঘোড়াটা হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে লাফিয়ে উঠল এবং একপাশে সরে গেল। টলস্টয়ের ঘোড়ার যাওয়ার পথ হয়ে গেল।

মিনিট কয়েক নিঃশব্দে চলে আসার পর তিনি উত্তেজিত গলায় বলে উঠলেন: "ওরা আমায় চিনতে পেরেছিল—ওই নির্বোধগুলো।" কয়েক

মুহূর্ত পরে আবার বললেন: "শুধু ঘোড়াটা বুঝতে পেরেছিল যে টলস্টয়ের জন্যে রাস্তা ছেড়ে দিতেই হবে।"

* * *

"আগে চিন্তা কর নিজের সম্পর্কে—এবং পরে অন্যদের সম্পর্কে অজস্র চিন্তার অবকাশ তুমি পাবে।"

* * *

"আমরা যখন বলি—'জানি', তখন তার দ্বারা আমরা কি বোঝাতে চাই? আমি জানি, অবশ্যই, যে আমি টলস্টয়, লেখক, আমার স্ত্রী আছে, আমার পাকা চুল, একটা বিশ্রী মুখ এবং দাড়ি—এ সব লেখা আছে আমার পাসপোর্ট—ছাড়পত্রে। কিন্তু আমার আত্মা সম্বন্ধে পাসপোর্টে একটা কথাও লেখা নেই, এবং আত্মার সম্পর্কে আমি জানি এই: সে ঈশ্বরের সামীপ্য চায়।

"কিন্তু ঈশ্বর কি? ঈশ্বর সে-ই—আমার আত্মা যার একটা পরমাণু মাত্র। এইটেই সব। কিন্তু যে চিন্তা করতে শিখেছে—এ কথা বিশ্বাস করা তার পক্ষে কঠিন; তবু শুধু মাত্র বিশ্বাস দিয়েই একজন ঈশ্বর নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। তাই টারটুলিয়ান লিখেছিলেন: 'চিন্তা পাপ।'"

* * *

মত প্রচারের একঘেয়েমী সত্ত্বেও এই কিম্বদন্তীর মতো মানুষটির মধ্যে কি অশেষ বৈচিত্র্যেরই না সন্ধান পাওয়া যেত! আজ পার্কে যখন তিনি 'হাসপ্রে'র মোল্লার সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন তাঁর আচরণে মনে হচ্ছিল—তিনি এক বিশ্বাস-প্রবণ, সরল মনের সামান্য কৃষক—শেষ দিনগুলির চিন্তার সময় যার ঘনিয়ে এসেছে। লম্বা চওড়া ওই স্থূলকায় তাতার মোল্লার পাশে তাঁকে দেখাচ্ছিল আকারে বড় ছোট্ট মানুষটি এবং যেন কুঁকড়ে যাওয়া। আত্মার অভ্যন্তরে কি একটা নিহিত আছে—সে সম্পর্কে সদ্য একটা চেতনার উন্মেষ হয়েছে যেন এই ছোটখাটো বুড়ো মানুষটির মধ্যে—এবং সে জাগরণ কোন্ প্রশ্ন তাঁর সামনে তুলে ধরবে, তার জন্যে যেন তিনি সন্ত্রস্ত।

তাঁর অন্তর্ভেদী ছোট ছোট চোখ দুটিতে দেখা গেল সপ্রতিভ দৃষ্টি; দুঃসহ মর্মভেদী আগুনের যে জ্বালা তাতে থাকে—তা যেন নিভে গেল, তিনি তাঁর মোটা মোটা লোমশ ভুরু দুটি সবিস্ময়ে তুলে ধরলেন। তাঁর সর্বদ্রষ্টা চোখ দুটি যেন আটকে গেল মোল্লার স্থূল মুখের ওপরে—চোখের তারা থেকে হারিয়ে গেল মানুষকে বিচলিত করার সেই তীক্ষ্ণতা।

মোল্লার কাছে তিনি ছেলেমানুষি সব প্রশ্ন তুললেন জীবনের অর্থ সম্বন্ধে, আত্মা এবং ঈশ্বর সম্পর্কে—অবিশ্বাস্য তৎপরতায় প্রমাণিক উদ্ধৃতি সব দিতে লাগলেন বাইবেল এবং কোরানের ধর্মোপদেষ্টাদের শ্লোক থেকে। বিলকুল একটা অভিনয় করছিলেন অপূর্ব নৈপুণ্যে—মস্ত বড় একজন শিল্পী এবং ঋষিকল্প লোকের পক্ষেই যা সম্ভব।

আবার এই কিছুদিন আগে যখন তিনি তানেইভেফ এবং সুলারের সঙ্গে সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করছিলেন তখন শিশুর মত উল্লাসে তিনি উছলে উঠছিলেন। তিনি যে নিজের হৃদয়োচ্ছ্বাসেরই প্রশংসা করছিলেন এটা একজনের চোখে সহজেই ধরা পড়ে: অর্থাৎ আরও সংক্ষেপে বলতে গেলে—এ তাঁর সবল হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তি।

সঙ্গীত সম্পর্কে সপেনহাওয়ার যে-কোনো লোক অপেক্ষা জ্ঞানগর্ভ এবং গভীর সমালোচনা করেছেন—এই ছিল তাঁর মত। এক ফাঁকে আমাদের বলে নিলেন 'ফেত্' সম্পর্কে এক হাসির গল্প। সঙ্গীতের সুর সম্পর্কে বললেন—ও হলো 'আত্মার মৌন প্রার্থনা।'

"মৌন কেন?" সুলার জিজ্ঞেস করলেন।

"কারণ এ কোনো কথা ব্যবহার করে না। চিন্তার চেয়ে ধ্বনির মধ্যেই আত্মার প্রাধান্য বেশী। চিন্তা হলো একটা মনিব্যাগের মতো—ওর মধ্যে থাকে পয়সা-কড়ি, তুচ্ছ জিনিস, আর ধ্বনি থাকে নিষ্কলঙ্ক—আগাগোড়া পবিত্র।"

সুস্পষ্ট আনন্দে এবং সুন্দর, সহজ কথায় তিনি তাঁর ভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন, সবচেয়ে চমৎকার এবং সর্বাপেক্ষা কমনীয় যা তিনি চিন্তা করতে পারেন—সেই ভাবেই বলে যাচ্ছিলেন—যা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। অপ্রত্যাশিত ভাবে দাড়ির ফাঁকে একটু হেসে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে, সস্নেহে বিড় বিড় করে বললেন:

"সমস্ত সুরকারই নির্বোধ মানুষ এবং যতো প্রতিভাবান হবে ততই সে অন্তঃসারশূন্য। এটাই আশ্চর্য যে তাদের মন এতটা নির্মল।..."

*   *   *

একবার শেখভকে তিনি টেলিফোনে বলেছিলেন:

"আজকের দিনটা আমার কাছে এত শুভ দিন; আমার আত্মা আজ আনন্দে এমন পরিপূর্ণ যে, আমি চাই—তুমিও আজ আনন্দিত হও। বিশেষ করে তুমি। ভারি চমৎকার মানুষ তুমি—ভারি চমৎকার।"

*   *   *

যে জিনিসকে টলস্টয় কোনো কাজে লাগাতে পারবেন না—এমন কোনো ব্যাপার যদি কেউ তাঁকে বলে তো তিনি তা শোনেন ঔদাসীন্যে এবং সন্দেহে। বাস্তবিক পক্ষে তিনি জিজ্ঞাসা করেন না—করেন শুধু অনুসন্ধান। দুর্লভ বস্তুর সংগ্রাহকের মতো, তাঁর সংগৃহীত বস্তুগুলির সঙ্গে মিলিয়ে রাখা যায় এমন জিনিসই তিনি শুধু সংগ্রহ করে রাখেন !

* * *

একদিন তিনি তাঁর ডাকের চিঠিপত্র বাছাই করতে করতে বলেছিলেন :

"খুব হৈ চৈ করে আমাকে নিয়ে ওরা,—আমার সব লেখা-টেখা ইত্যাদি নিয়ে। কিন্তু শেষকালে, আমি মরে গেলে, দু-এক বছরের মধ্যেই লোকে বলবে : 'টলস্টয় ? ও, সেই কাউন্ট যে বুট জুতো তৈরীর চেষ্টা করেছিল ; এবং তারপর অদ্ভুত কি একটা যেন তার হয়েছিল। সেই লোকটার কথা বলছ তো ?' "

* * *

অপ্রত্যাশিত কোনো কিছু একটা আবিষ্কারের পর তাকে চেপে রাখার একটা চতুর পরিতুষ্টির হাসি তাঁর মুখে চোখে বেশ কয়েকবার আমি লক্ষ্য করেছি। তিনি চেপে রাখেন বটে, আবার ভুলেও যান। কোথায় গেল সেটা ?—গোপন যন্ত্রণায় অবিরাম তোলপাড় ক'রে তিনি দীর্ঘ দিনের পর দিন কাটিয়ে দেন : "যেটার আমার এত দরকার—কোথায় ·· কোথায় গেল সেটা ?" তিনি ভয় পান পাছে তাঁর চারদিকের লোকজন তাঁর যন্ত্রণার কথা জানতে পারে, পাছে তাঁর ক্ষতি জানতে পেরে তাকে বিব্রত করে অথবা কোনো ভাবে আঘাত করে। তারপর হঠাৎ তাঁর হয়তো মনে পড়ে যায়—এবং খুঁজেও পান। সাফল্যে তখন আনন্দিত এবং অন্যের কাছে মনের দরজা খুলে দিতে তখন তিনি আর ভয় পান না। চতুর দৃষ্টিতে তখন তাকান চারপাশের মানুষজনের দিকে—যেন বলতে চান : "এখন তোমরা আমাকে আর আঘাত করতে পারবে না !"

কিন্তু কি তিনি খুঁজে পেলেন এবং কোথায় বা পেলেন—তা গোপনই থেকে গেল।

তাঁকে নিয়ে ভাবতে বসলে কেউ কখনো ক্লান্ত হবে না ঠিক, কিন্তু তাঁর সঙ্গে ঘন ঘন দেখা হওয়া অত্যন্ত ক্লান্তিকর। ব্যক্তিগত ভাবে, আমি তো তাঁর সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা অসম্ভব বলে মনে করি, এক ঘরে তো দূরের কথা।

তাঁর চারদিকটা যেন মরুভূমি হয়ে ওঠে—সেখানে সব কিছু যেন ঝলসে যায় সূর্যের আলোতে এবং স্বয়ং সূর্যও যেন একটা অন্ধকার, অনন্ত রাত্রির ভীতি জাগিয়ে ধূমায়িত হয়ে উঠে।

১৮-শ পরিচ্ছেদ ॥ কবি আলেকজাণ্ডার ব্লক

কখনো কখনো আমার মনে হয়—রুশীয় মন নিজেকে নিয়েই ভয়ে অসুস্থ ; সমস্ত রকম বিচার-বুদ্ধির বাইরে থাকার প্রচেষ্টায় সে বিচার-বুদ্ধির ওপরেই রুষ্ট এবং তাকে যেন ভয় পায়।

সেই বিজ্ঞ এবং কৌশলী সাপ ভি. ভি. রোজানফ তাঁর 'অবসর নেওয়ার কালে' লেখাটাতে তিক্ত অনুশোচনায় বলেছেন—"হায়, এ আমার কী করুণ অভিজ্ঞতা, কেন আমি সব কিছু জানতে চেয়েছিলাম ? আশা করেছিলাম শান্তিতে মরব কিন্তু এখন তা আর পারব না।"

লিও টলস্টয়ের ১৮৫১ সাল থেকে লেখা 'আমার যৌবনের রোজনামচা'য় ঘটেছে এই কঠোর ঘোষণা: "সচেতনতা হলো সবচেয়ে বড় নৈতিক পাপ—যা মানুষকে গ্রাস করে !"

ওই একই কথা ডস্টয়েভস্কিও বলেছেন : "... অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে সচেতন হওয়া একটা ত্রুটি, সত্যিকারের পুরোপুরি একটা ত্রুটি ; অত্যন্ত সচেতনতা—এমন কি বলি, সব রকমের সচেতনতাই—একটা ত্রুটি। এই রকমই আমি মনে করি।"

বাস্তববাদী এ. এফ. পিসেমস্কি মনের আবেগে মেলিনকফ-পেচেরেস্কিকে লেখা তাঁর এক চিঠিতে লিখেছেন—"সর্বনাশ হোক চিন্তার স্বভাবের—আত্মার এই চুলকোনির।"

এল. আন্দ্রিভ মন্তব্য করেছেন, "বিচার-বুদ্ধির ভেতরেই গোয়েন্দার মত, উত্তেজনা ছড়ানো দালালের মত একটা কিছু আছে" এবং তিনি এই রকম একটা আন্দাজ করেছেন : "খুব সম্ভবত বিচার-বুদ্ধি হলো সেই বুড়ি ডাইনী—ছদ্মবেশী বিবেক।"

রুশ লেখকদের মধ্যে থেকে এই রকম অল্প কথার সূত্র যে কেউ অনেক সংগ্রহ করতে পারবে এবং সেগুলো বিচার-বুদ্ধির ক্ষমতার ওপর অনাস্থারই প্রমাণ উপস্থিত করে। এ একটা দেশের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—যেখানে জীবন গড়ে উঠেছে এমন সব নিয়মের ওপরে যাতে রয়েছে যুক্তি-বোধের

অভাব। যে কোনো দেশ অপেক্ষা এটা এখানে বেশী। এমন কি পি. এফ. নিকোলায়েফের মতো লেখক, যিনি নাকি 'এ্যাকটিভ প্রোগ্রেস'—'ক্রিয়াশীল উন্নতি'র মতো রচনার যিনি রচয়িতা, যে লোকের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে এই ধরনের চিন্তা আসাই উচিত নয়, তাঁরও ওই রকম অদ্ভুত উক্তি চোখে পড়ে। তিনি ১৯০৬ সালে লিখেছিলেন: "জ্ঞান বাড়ায় প্রয়োজন-বোধ, প্রয়োজন-বোধ জন্ম দেয় অসন্তোষের এবং অসন্তুষ্ট একটা মানুষ বড় হতভাগ্য ও অসুখী—তাই সামাজিক ভাবে তা মূল্যবান এবং ব্যক্তিগতভাবে তা আকর্ষনীয়।" এ সব উক্তি সম্পূর্ণ বুদ্ধির অগম্য এবং কিছুটা যেন বৌদ্ধ-চিন্তাধারার মতো।

মনটেইনও কাঁদুনি গেয়েছেন: "বৃথা জ্ঞানের দ্বারা আমরা কেন নিজেদের অস্ত্রসজ্জিত করি? তার চেয়ে অজ্ঞতা এবং সরলতা কি মধুর এবং মোলায়েম পছন্দ-সই মাথার বালিস!' ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন—সমস্ত ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকেই আদি কালের মানুষ দীর্ঘজীবন লাভ করতে পেরেছিল। এখানে এই সত্য কথাটা তিনি উপেক্ষা করে গেছেন যে—সব কিছুই তাদের মধ্যে বীজাকারে বর্তমান ছিল। ভোগবাদী মনটেইন ছিলেন ধর্মযুদ্ধ-যুগের মানুষ। পরিপূর্ণ ছিলেন উজ্জ্বল আনন্দময় জ্ঞানে এবং তিনি ক্যাথলিক আচার-ভ্রষ্টদের ওপর অত্যাচার অপেক্ষা নরমাংস ভোজনকে কম বীভৎস বলে মনে করতেন। তিনশ' বছর পরে লিও টলস্টয় তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন: 'মনটেইন বিশেষত্বহীন এবং অশিষ্ট।'

রূপে এবং প্রকৃতিতে টলস্টয়ের মন ছিল ধর্মভাবাপন্ন। সনাতনী ধর্মবিলাস তাঁকে আকর্ষণ করেছিল বলে আমি মনে করি না। এবং চিন্তার প্রক্রিয়ার মধ্যেই যে আনন্দ নিঃসন্দেহে অন্যান্য দার্শনিকের ক্ষেত্রে দেখা যায়—সে জাতের আনন্দও তাঁর ঘটেনি। সপেনহাওয়ারের দৃষ্টান্ত ধরা যাক। তাঁর নিজের চিন্তার বিকাশ তিনি সমস্ত কমনীয়তা দিয়ে প্রত্যাশা করতেন। আমার মতে, টলস্টয় সমস্ত বিচারণাকে এক রকম অভিশপ্ত কর্তব্য বলে মনে করতেন এবং আমি মনে করি, তিনি সন্দেহে বিদ্ধ ধর্মোন্মাদের হতাশায় পূর্ণ টারটুলিয়ানের সেই কথাগুলি সব সময়ে স্মরণে রাখতেন: 'চিন্তা পাপ।'

মনের দ্বারা উত্তেজিত ভয়ের উৎস গুলো এবং সে সম্পর্কে ঘৃণা—বোধ হয় বাইবেলেই* সমস্ত সনাতন ধর্ম-বিশ্বাসীদের জন্য সমাধিস্থ হয়ে আছে:

"আজাজেল ছুরি এবং তলোয়ার তৈরী করতে শিখিয়েছিলেন

* উদ্ধৃতিটি ঠিক বাইবেলের নয়, এটি 'বুক অফ এনোক'—১ম খণ্ড, ৮ম অধ্যায় ভুক্ত

মানুষকে ··· বিভিন্ন শিল্পে তাদের দিয়েছিলেন দীক্ষা ··· ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন চাঁদ এবং তারকাদের গতিপথ। তারপর পৃথিবীতে নেমে এল ভীষণ এক দেবত্বহীন কাল ও ভ্রষ্টাচার এবং মানুষের যাত্রাপথ হয়ে গেল আবর্তিত।

* * * * *

এ সমস্তই আমি স্মরণ করছি—গতকাল আলেকজাণ্ডার ব্লকের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত এক আলোচনার পর। তাঁর সঙ্গে 'ইউনিভার্সাল লিটারেচারে'র অফিস থেকে বেরুলাম এবং তিনি তাঁর বই 'দি ডিক্লাইন অফ হিউম্যানিজম' সম্বন্ধে আমার মতামত জিজ্ঞেস করলেন। দিন কয়েক আগে একটা ছোট প্রবন্ধে এই বিষয় নিয়েই তিনি এক বক্তৃতায় আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটা আমার কাছে মনে হয়েছিল খানিকটা অসম্পূর্ণ কিন্তু পুরোপুরি শোকাবহ এক পরিণামের পূর্ব সূচনা। ব্লক ওটা যখন পড়ছিলেন তখন আমার মনে হচ্ছিল, তিনি যেন রূপকথার সেই বালক, হারিয়ে গেছেন জঙ্গলে: অন্ধকারের ভেতর থেকে দৈত্যের প্রত্যাসন্ন আগমন তিনি বুঝতে পেরেছেন এবং দৈত্য ভয় পেয়ে পালাবে—এই আশায় বিড় বিড় করে উচ্চারণ করছেন অসংলগ্ন ভূত ছাড়ানো মন্ত্র। আঙুলগুলো তাঁর কাঁপছিল যখন পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো তিনি ওল্টাচ্ছিলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম না—মানবতার অধঃপতনে তাঁর বেদনা—না আনন্দ। তাঁর প্রতিভা কবিতায় যেমন—গদ্যে তেমন নমনীয় নয় কিন্তু নিঃসন্দেহে তিনি গভীর চিন্তা এবং বিধ্বংসী মানসিকতার মানুষ—এক কথায় তিনি 'অবক্ষয়' কালের মানুষ'। আমার মনে হয়েছিল, কিসের উপর তাঁর বিশ্বাস এ সম্পর্কে ব্লক সম্পূর্ণ পরিষ্কার নন। কথাগুলো পাথরের গায়ে শেওলার মতো, চিন্তার গভীরে তা যেতে পারেনি। এইটিই তাঁর নিজের এবং তাঁর কথিত মানবতার ধ্বংসের কারণ। তাঁর কিছু কিছু বক্তব্য সম্পর্কে মনে হয়েছে—তা যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ভেবে দেখা হয়নি। দৃষ্টান্ত হিসেবে যেমন—

"জনসাধারণকে সভ্য করে তোলার চেষ্টা অসম্ভব এবং অপ্রয়োজনীয়।"··· "আবিষ্কারের স্থান নেয় যান্ত্রিক উদ্ভাবন।"

একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দী উপরোক্ত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে খুবই ঐশ্বর্যপূর্ণ—তার মোদ্দা কারণ হলো বিজ্ঞানের অসংখ্য এবং বিরাট বিরাট আবিষ্কারের কালকে সে-সব আঁকড়ে ধরে আছে। তারপর, রাশিয়ার জনসাধারণকে

সভ্য করে তোলার ব্যাপারটাকে অসম্ভব ও অপ্রয়োজনীয় বলে যে তিনি মন্তব্য করেছেন, স্পষ্টতই ওটা 'সিথীয়' মনোভাব—আদিম বর্বর মনোভাব। এটা মেনে নেওয়া মানে, রুশ জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্র-বোধ সম্পর্কে গঠন মূলক মনোভাবের যে ত্রুটি আছে—তাকে মেনে নেওয়া। কিন্তু ব্লক এই রকম মনোভাবাপন্ন হবেন কেন ?

এ সব কথা আমি তাঁকে যতটা সম্ভব সুকৌশলে এবং নম্রভাবেই বললাম। তাঁর সঙ্গে কথা বলা বড় কষ্টকর। তাঁর সম্পর্কে আমার এই রকম একটা ধারনা হয়েছে যে, তাঁর জগতটা যাদের কাছে অপ্রাকৃত এবং দুর্বোধ্য বলে মনে হয় তাদের তিনি উপেক্ষা করেন এবং বলা বাহুল্য, তাঁর জগত সম্পর্কে আমার ধারনাও পূর্বোক্তরূপ। সম্প্রতি সপ্তাহে দু'দিন করে 'ইউনিভার্সাল লিটারেচার'-এর সম্পাদক সভায় তাঁর পাশেই আমাকে বসতে হয়েছে এবং রুশ ভাষার মেজাজের দিক থেকে আমাদের অনুবাদের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আমার তর্কবিতর্কও হয়েছে। এই ধরনের কাজ জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে না। ম্যানেজিং কমিটির প্রায় সকলের মতোই, কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কিছুটা উদাসীন এবং নিয়মতান্ত্রিক। তিনি জানালেন, "সামাজিক অস্তিত্বের সমস্যা সমাধান করার স্বভাব, যেটা নাকি বুদ্ধিজীবীদের বড় প্রিয়"—আমি তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছি দেখে তিনি খুশি।

তিনি বললেন, "আমি সব সময়ে অনুভব করেছি যে এটা তোমার সত্যিকারের স্বরূপ নয়। তোমার লেখা 'ছোট্ট শহর ওকুরা'য় যে কেউ দেখতে পাবে—কতগুলো 'ছেলেমানুষি প্রশ্ন' তোমাকে উত্যক্ত করে তুলেছে—কিন্তু অত্যন্ত গভীর এবং সবচেয়ে ভয়ংকর সেই গুলোই।"

উনি ভুল করেছেন, কিন্তু আমি কোন প্রতিবাদ করলাম না, তিনি যা ভাবছেন তাই তাঁকে ভাবতে দিলাম।

"এই সমস্ত বিষয়ের ওপরে তুমি লেখ না কেন?" তিনি বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

আমি তাঁকে বললাম—এই যে সব প্রশ্ন: জীবনের উদ্দেশ্য, মৃত্যু, ভালোবাসা—এগুলো সব পুরোপুরি নিজেরই ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমার নিজের সঙ্গেই শুধু এর সম্পর্ক। ওগুলো রাস্তায় টেনে বার করতে আমি চাই না। যদি অনিচ্ছায় কখনো করেই ফেলি—তা সব সময়েই হয়ে যায় শিল্পকলাহীন এবং নৈপুণ্যহীন।" নিজের সম্পর্কে কিছু বলা বড় সূক্ষ্ম শিল্প—ও গুণ আমার নেই।"

আমরা 'সামার গার্ডেন্স'-এ ঢুকে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। আমার বোধ হলো—কেমন যেন একটা খ্যাপামীর আলোয় ব্লকের চোখ জ্বলছে। তার সেই দ্যুতিতে, তাঁর ঠাণ্ডা যন্ত্রণাকাতর মুখে আমি দেখতে পেলাম কথা বলার—প্রশ্ন করার ক্ষুধিত আকাঙ্ক্ষায় তিনি ব্যগ্র। পাথুরে রাস্তার ওপরে এসে পড়া সূর্যরশ্মিটাকে পায়ের জুতো দিয়ে ঘষতে ঘষতে ভৎ'সনার সুরে তিনি বললেন :

"তুমি তোমার সত্যিকারের স্বরূপটিকে লুকাচ্ছ। চিন্তার দীপ্তি দিয়ে, সত্য দিয়ে তুমি তোমার আসল ভাবটিকে ঢাকতে চাও। এ রকম তুমি কর কেন ?"

এবং আমার উত্তর দেওয়ার আগেই তিনি রুশ বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে বহু ব্যবহৃত সেই সব নিন্দাবাদের কথা বলতে আরম্ভ করে দিলেন—বিপ্লবের পরে যে-সব কথা উল্লেখ করার আর কোনো প্রয়োজন দেখি না।

আমি তাঁকে বললাম—বুদ্ধিজীবীদের আত্মবিরূপ এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্মদাতা বুদ্ধিজীবীরাই। কৃষকদের মধ্যে এ দৃষ্টিভঙ্গী জন্মাতে পাবে না—তারা মুখ চেয়ে থাকে তাদের জানা শিক্ষিত মানুষের প্রতিনিধি জেলার কোনো ত্যাগপরায়ণ ডাক্তার অথবা গ্রাম্য স্কুলের কিছুটা উন্নত কোনো শিক্ষকের দিকে। ওটা শ্রমিকদের মধ্যেও জন্মায় নি—ববং তাদের রাজনৈতিক শিক্ষাদীক্ষার জন্য ওই বুদ্ধিজীবীদের কাছেই তারা ঋণী। আত্মবিরূপ এই দৃষ্টিভঙ্গী ভুল এবং অস্বাস্থ্যকর, তাছাড়া এটা বুদ্ধিজীবীর আত্মসম্মানকে নষ্ট করে, তার নিজের সংস্কৃতিগত ঐতিহাসিক কাজকর্মের ওপর যে শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রম থাকা স্বাভাবিক, তাকে ধ্বংস করে দেয়। গাড়ি-টানা ঘোড়ার অভিনয়ে এ চিরকাল ইতিহাসকে টেনে এসেছে—এবং চিরকাল টানবে। অক্লান্ত এর কর্মধারায় সর্বহারাকে উন্নীত করেছে বিপ্লবের শিখরে, ব্যাপ্তি এবং গভীরত্বে তুলনাহীন সব সমস্যা-গুলোকে এই মুহূর্তে সমাধান করার জন্য আমাদের সামনে উপস্থিতও করেছে।

আমার মনে হয় না, তিনি আমার কথা শুনছিলেন—কারণ তিনি অপ্রসন্ন-ভাবে তাকিয়ে ছিলেন পায়ের তলার মাটির দিকে। যেমনি আমার বলা শেষ হলো অমনি তিনি বলতে লাগলেন বুদ্ধিজীবীদের দ্বিধার কথা—কি ভাবে তারা বলশেভিক নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের সেই দ্বিধা প্রকাশ করছে। অন্যান্য বক্তব্যের মধ্যে তিনি অবশ্য একটা সঠিক মন্তব্য করলেন :

"অন্ধকারের ভেতর থেকে ধ্বংসের শক্তিকে আহ্বান করে এনে বুদ্ধিজীবী-দের এই কথাটা বলা ঠিক সদাশয়তার পরিচয় নয় যে, ওসব আমাদের দ্বারা হয়নি—হয়েছে অন্য সব লোকেদের দ্বারা। বলশেভিজ্‌ম্‌ বুদ্ধিবীজীদের

কাজের অনিবার্য পরিণতি—এবং তা হয়েছে নানা প্রচার মঞ্চ থেকে, সম্পাদকের অফিস থেকে, তাদের গোপন শিক্ষার কেন্দ্র থেকে।"

এই সময়ে একটি সুন্দর মতো তরুণী ওইখান দিয়ে যাচ্ছিল—প্রীতিপূর্ণ ভাবে সে মাথা নুইয়ে ব্লককে সম্ভাষণ জানাল; তিনি সাড়া দিলেন নীরস ভাবে—প্রায় অবজ্ঞা ভরে এবং কেমন একটা অপ্রতিভ হাসি হেসে মেয়েটি চলে গেল। দ্বিধান্বিত তার ছোট পদক্ষেপগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ব্লক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন :

"নিত্যতা বা তার সম্ভাবনা সম্পর্কে তোমার মতামত কি ?"

কেমন একটা জেদ নিয়ে তিনি আমায় কথাটা জিজ্ঞেস করলেন এবং তাঁর অসংকোচ দৃষ্টি আমার মুখের ওপর স্থির হয়ে রইল। উত্তরে আমি বললাম, "ল্যামিন্নাইস বোধ হয় ঠিক বলেছিলেন; বিশ্বলোকে বস্তুর পরিমাণ সীমাবদ্ধ—একথা যদি মেনে নিই, তা হলে ধরে নিতে পারি যে, এর নানা সংযোগ, নানা সংমিশ্রণ সীমাহীন বৈচিত্র্যে সীমাহীন কালে বার বার ঘটবে। এই ভাবে দেখলে এমনও সম্ভব যে, লক্ষ লক্ষ বছর পরে, কোনো কুয়াশা ঢাকা মধ্যাহ্নে এই পেত্রোগাদে, ব্লক এবং গোর্কি 'সামার গার্ডেনস'-এর এক বেঞ্চিতে আবার বসে বসে নিত্যতা সম্পর্কে আলোচনা করছে।"

"তুমি আমার প্রশ্নের মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছ না— তাই না ?" তিনি বললেন।

তাঁর জেদ আমাকে বিস্মিত এবং বিরক্ত করে তুললো। যদিও আমার বোধ হচ্ছিল—কেবল মাত্র কৌতূহলেই তিনি কথাগুলো জিজ্ঞেস করছিলেন না, বরং কোনো একটা গুরুভার চিন্তা যা তাঁকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল তাকে তিনি চুরমার করে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার বাসনায় এ সব জিজ্ঞেস করছিলেন।

বললাম, "ওই প্রশ্নে অন্য সব মতের চেয়ে ল্যামিন্নাইসের দৃষ্টিভঙ্গীকে কম বিশ্বাসজনক বলে ভাববার আমি কোনো কারণ দেখি না।"

"কিন্তু তুমি ব্যক্তিগত ভাবে এ সম্পর্কে কি মনে কর ?" তিনি অধীর হয়ে পা ঠুকলেন। অথচ সেদিনের আগে পর্যন্ত তাঁকে আমার মনে হতো অত্যন্ত সংযত, তাই কথাবার্তা বেশী বলতে চান না।

"ব্যক্তিগত ভাবে, মানুষকে আমি একটা যন্ত্র বলে ভাবতে পছন্দ করি—যে তার ভেতরের তথাকথিত প্রাণহীন 'জড় বস্তু'-গুলোকে মানসিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে—এবং সুদূর ভবিষ্যতেও করবে এবং গোটা পৃথিবীকে একটা বিশুদ্ধ মানসিকতায় পরিবর্তিত করে দেবে।"

"আমি বুঝতে পারলাম না—এ বোধ করি প্যান-সাইকিজ্‌ম—নিখিল মানসিকতা, তাই না?"

"না। কারণ, তখন চিন্তা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। বিশুদ্ধ চিন্তায় পরিবর্তিত হয়ে অন্য সব কিছু অন্তর্হিত হয়ে যাবে। শুধু টিকে থাকবে চিন্তা—তার প্রথম স্ফুরণ থেকে তার শেষ মুহূর্তের বিস্ফোরণ পর্যন্ত মানব জাতির সমগ্র মানসলোককে মূর্ত করে তুলবে সে।"

"আমি বুঝতে পারলাম না," মাথা নাড়তে নাড়তে ব্লক আবার বললেন।

আমি বললাম, "পৃথিবীকে এইভাবে কল্পনা করুন—যেখানে একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় বস্তুর বিমুক্তিকরণ চলছে। বস্তু সেখানে ভেঙে-চুরে গলে, প্রতিনিয়ত নানা জাতের শক্তির জন্ম দিচ্ছে—যেমন, আলো, বিদ্যুৎ, তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ, হেরজিয়ান তরঙ্গ ইত্যাদি। তেজস্ক্রিয়তার সমস্ত লক্ষণও অবশ্য এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। চিন্তা হলো মস্তিষ্কের পরমাণুর বিমুক্তিকরণ-জাত পরিণাম; মস্তিষ্ক গঠিত হয়েছে 'মৃত' অজৈব বস্তুর উপাদানে। মানুষের মস্তিষ্ক নামক পদার্থে এই বস্তু নিরবচ্ছিন্ন ভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে মানসিক বস্তুতে। আমি নিজে বিশ্বাস করি, কোনো এক ভবিষ্যৎকালে মানুষের দ্বারা শোষিত সমস্ত বস্তু রূপান্তরিত হবে তার মস্তিষ্কের দ্বারা একক এক শক্তিতে—সে শক্তি মানসিক শক্তি। এই শক্তি আবিষ্কার করবে তার নিজের ভেতরকার সঙ্গতিকে এবং আত্মনিমগ্ন হবে ধ্যানে—অনন্ত বৈচিত্র্যে ভরা যে সব সৃষ্টিশীল সম্ভাবনা তার মধ্যে লুকিয়ে আছে—সেইগুলি হবে তার ধ্যানের সন্ধান।"

"কি ভয়ানক মানসিক কল্পনা!" ব্যঙ্গ ভরে হাসতে হাসতে ব্লক বললেন। "তবে এইটে জেনে আনন্দ হচ্ছে যে বস্তুর রক্ষণশীল ধর্মের এটি বিরোধী তত্ত্ব।"

"কিন্তু আমি? আমি খুশি এই ভেবে যে, গবেষণাগার থেকে উৎপন্ন নিয়মগুলো আমাদের অজানিত বিশ্বনিয়মের সঙ্গে সব সময়ে মেলে না। আমি স্থির নিশ্চয় যে, মাঝে মাঝে যদি আমরা আমাদের এই গ্রহটার ওজন নিতে পারতাম তা হলে দেখতাম—ক্রমে ক্রমে এর ওজন কমছে।"

"এ সব বড় ভয়ংকর কথা", মাথা নাড়তে নাড়তে ব্লক বললেন। "ব্যাপারটা আরও সহজ; কথাটা হলো এই যে, ঈশ্বরে আস্থার ব্যাপারে আমরা হয়ে উঠেছি খুবই চতুর এবং নিজেদের ওপর আস্থার ব্যাপারেও আমরা যথেষ্ট শক্তিমান নই। জীবন এবং বিশ্বাসের রক্ষক হিসাবে আছে একমাত্র ঈশ্বর এবং আমি স্বয়ং।

মনুষ্যত্ব? কিন্তু এই যুদ্ধের পর এবং আরও নিষ্ঠুর সব ঘটনা ঘটার আসন্ন অন্ধকার মুহূর্তে মনুষ্যত্বের প্রজ্ঞায় আর কারুর বিশ্বাস থাকবে কি?—না। তোমার আঁকা ছবি … ও বড় ভয়ংকর! … আমি এখনও মনে করি, তুমি আমার কথায় গুরুত্ব দিচ্ছ না।"

ব্লক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন, "যদি চিন্তাটা আমরা একেবারে থামিয়ে দিতে পারতাম, শুধু দশটা বছরের জন্য! যে বিশ্বাসঘাতক, কুয়াসাচ্ছন্ন ছোট্ট আলোটুকু—পৃথিবীর রাত্রির গভীর থেকে গভীরে আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে যদি নিভিয়ে দিতে পারতাম এবং হৃদয় দিয়ে যদি শুনতে পারতাম বিশ্ব-লোকের সঙ্গতিপূর্ণ সুরটুকু! সেই মস্তিষ্ক, … মস্তিষ্ক।… এ এমন একটা যন্ত্র যাকে বিশ্বাস করা যায় না—আসুরিক ভাবে ওটা বৃহৎ, আসুরিক এর বৃদ্ধি। এ একটা স্ফীতি—গলগণ্ড রোগের মতো।"

ঠোঁট চেপে কয়েক মিনিট তিনি চুপ করে রইলেন, তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন: "সমস্ত সঞ্চালন বন্ধ করার জন্য, একটু অবকাশের জন্য—খানিক স্থির হয়ে দাঁড়াও!"

"এটা হতে পারে, যদি বিভিন্ন ধরনের গতির বেগ একই রকম থাকে।"

ব্লক তাঁর ভুরু তুলে চোখের কোণে আমার দিকে তাকালেন। তারপর অতি দ্রুত তিনি অসংলগ্নভাবে কথা বলতে লাগলেন এমন প্রলাপের ঘোরে যে আমি তাঁকে আর বুঝে উঠতে পারলাম না। এ এক আমার আশ্চর্য অনুভূতি—মনে হলো, তিনি যেন তাঁর অঙ্গ থেকে জীর্ণ কম্বলটাকে ছিঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন। তারপর হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আমার দিকে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং একটা ট্রাম ধরার জন্য চলে গেলেন। প্রথম দৃষ্টিতে তাঁর চলবার ভঙ্গীটিকে মনে হয় বলিষ্ঠ কিন্তু একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—তিনি হাঁটছেন নিরবলম্ব ভাবে, ভারসাম্য রাখছেন এক পা থেকে অন্য পায়ে। এবং যত ভাল পোশাকই তিনি পরুন—অন্য লোকের থেকে তাঁর সাজসজ্জা আলাদা হোক, এইটে অনেকেই চায়। স্যামোয়েড বা ল্যাপদের পশমওয়ালা কোট পরে জাঁকিয়ে সাজসজ্জা করলেও গুমিলাফকে মনে হবে সাধারণ অন্য পাঁচজনের মতই। কিন্তু ব্লকের প্রয়োজন একটু স্বতন্ত্র বেশ।

* * *

ব্লকের সঙ্গে আমার কথাবার্তা সবে লেখা শেষ করেছি এমন সময় বল্টিক নৌবাহিনীর একজন নাবিক W.—পড়বার জন্য আমার কাছে এসে ধার চাইল

'ঔৎসুক্য জাগায় এমন একখানা বই।' বিজ্ঞান সে ভয়ানক ভালবাসে, সে আশা করে—জীবনের সব ধাঁধার অবসান করে দেয় বিজ্ঞান। আবেগে এবং প্রত্যয়ে সে ওই সম্পর্কে কথা বলতে লাগল। আজ সে এসে জানাল বিস্ময়কর এক সংবাদ :

"ওরা বলে—একজন বিদ্বান আমেরিকান নাকি একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন—এমনি খুবই সাধারণ একটা দূরবীন, ওটার একটা চাকা আছে আর আছে একটা হাতল, আপনি জানেন? শুধু হাতলটা ঘুরিয়ে দিন—অবাক কাণ্ড! আপনি সব দেখতে পাবেন : যতো বিশ্লেষণ, ত্রিকোণমিতি, সমালোচনা—প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর ইতিহাসের গোটা মানেটাই। যন্ত্রটা এ-সব তো দেখায়-ই—আবার শিস্‌ও দেয়।"

ওই যন্ত্রটার যেটা আমি সব চেয়ে পছন্দ করি—সেটা হলো এই যে, ওটা শিস্‌ও দেয়।

১৯শ পরিচ্ছেদ ।। শেখভ

আজ প্রায় পাঁচ দিন হয়ে গেল আমার গায়ের তাপ স্বাভাবিকের ওপরেই আটকে আছে কিন্তু বিছানায় আটকে থাকা আমার কাছে শঙ্কারজনক।

ধূসর বৃষ্টিকণা মাটির ওপর ছড়িয়ে দিচ্ছে সূক্ষ্ম ভেজা ধুলো। আমি শুনতে পাচ্ছি ফোর্ট ইকোতে কামানের গর্জন— শত্রু বোধ হয় তাদের আক্রমণ করেছে। সন্ধানী আলোর লম্বা জিভ রাতের মেঘগুলোকে লেহন করে যাচ্ছে; দৃষ্টিকে ও বড় আঘাত করে— ও যেন ভুলতে দেয় না শয়তানের আবিষ্কার যুদ্ধকে।

আমি শেখভের লেখা পড়ছিলাম। দশ বছর আগে তিনি মারা না গেলে এই যুদ্ধ মানুষ জাতটার ওপর আগে তার মন ঘৃণায় বিষিয়ে দিয়ে তারপর নিশ্চয় তাঁকে মেরে ফেলত। তাঁর অন্ত্যেষ্টির কথা আমার মনে পড়ছে।

মস্কোর মানুষের প্রিয়তম ছিলেন লেখক—তাঁর শবাধার আনা হচ্ছিল সবুজ রঙের একটা ভাড়াটে গাড়িতে, গাড়ির পাশে বড় বড় অক্ষরে লেখা : 'ঝিনুকের জন্য।'* লেখককে শেষ বিদায় জানানোর জন্য যে জনতা স্টেশনে এসে জড়ো হয়েছিল—তার একটা বড় অংশ জেনারেল কেলারের শবাধারকে অনুসরণ করল। কারণ ঠিক ওই সময়ে মাঞ্চুরিয়া থেকে জেনারেলের শবাধারও এসে পৌঁছেছিল। সবাই সবিস্ময়ে দেখল—পুরোপুরি মিলিটারী সম্মানে শেখভের

* শেখভের বিখ্যাত এক রচনা

সমাধি দেওয়া হচ্ছে। ভুলটা যখন ধরা পড়ল তখন কেউ কেউ খুশিতে খল্‌খল্ করে হেসে উঠল এবং ঠাট্টা তামাসা সুরু করে দিলে। শেখভের শবানুগমনে শ'খানেক লোকের বেশী ছিল না। তার মধ্যে দু'জন উকিলকে আমার বেশ মনে পড়ছে, পায়ে নতুন জুতো, গলায় বিচিত্র নেকটাই আঁটা, 'প্রেমিক প্রেমিক' ভাব। তাদের পেছনে যেতে যেতে তাদের একজন—ভি. এ. মাকলাকফকে আলোচনা করতে শুনলাম কুকুরের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে ; অন্যজনকে চিনিনে—তিনি তাঁর দেশের বাড়ির স্বাচ্ছন্দ্য এবং তার চারপাশের সৌন্দর্য সম্পর্কে ব্যাখ্যান দিচ্ছিলেন। নীলাভ পোশাক-পরা একটি মহিলা, হাতে লেশ দেওয়া ছাতা, এক মস্ত চশমা পরা বৃদ্ধ ভদ্রলোককে মৃতের গুণপনা সম্পর্কে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। "ওঃ, তিনি কি আশ্চর্য রকমের মধুর ছিলেন—আর কি তীক্ষ্ণবুদ্ধি।..." বৃদ্ধ ভদ্রলোক সন্দিগ্ধভাবে কাশলেন। দিনটা ছিল গরম এবং ধূলিধূসর। মিছিলের আগে আগে একটা মোটাসোটা সাদা ঘোড়ায় চেপে রাজকীয় গাম্ভীর্যে চলেছে দীর্ঘদেহ, গাঁট্টাগোট্টা এক পুলিস। সবটাকে বোধ হচ্ছিল বড় নিষ্ঠুর ভাবে সাধারণ এবং অশিষ্ট—সেই বিরাট এবং সূক্ষ্ম এক শিল্পীর স্মৃতির অযোগ্য।

বৃদ্ধ এ. এস. সুভোরিনকে* শেখভ তাঁর এক চিঠিতে লিখেছিলেন :

> "বলতে গেলে, বেঁচে থাকার গদ্যময় জীবন-সংগ্রাম অপেক্ষা ক্লান্তিকর ও কবিত্বহীন আর কিছু নেই—জীবনের সব আনন্দকে তা শুষে নেয় এবং ঠেলে দেয় ঔদাসীন্যের দিকে।"

কথাগুলো অতিমাত্রায় রুশ চিন্তাধারারই প্রতিফলন। কিন্তু আমার মনে হয়—শেখভের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও রকম ছিল না। রাশিয়ায় সব কিছুর যেখানে এত প্রাচুর্য—অথচ মানুষের যেখানে কর্মের প্রতি অনুরাগ নেই—সেখানে বেশীর ভাগ লোক ওই রকমই চিন্তা করে থাকে। রাশিয়া শক্তির প্রশংসা করে—কিন্তু তার ওপরে বিশ্বাস রাখতে সক্ষম নয়। জ্যাক লণ্ডনের দৃষ্টান্ত ধরা যাক, ওই রকম একটা সক্রিয় মনের লেখক রাশিয়ায় হওয়া অসম্ভব। যদিও তাঁর বইগুলো এখানে খুবই জনপ্রিয়—কিন্তু রাশিয়ার মানুষকে তা কর্মোদ্দীপনায় প্রেরণা দিতে দেখি না। তা শুধু রুশদের কল্পনাকে উত্তেজিত করে!

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শেখভ পুরোপুরি রুশ নন। তাঁর ক্ষেত্রে 'জীবনের সংগ্রাম' সুরু হয়েছিল যৌবনের আরম্ভ থেকেই। এই দাস্যবৃত্তি, প্রাত্যহিক

* নভোজে ভ্রেমজা পত্রিকার সম্পাদক

জীবনের ক্ষুদ্রতা, এক টুকরো রুটির জন্যে চেষ্টা ও চিন্তা—এ শুধু তাঁর নিজের জন্য নয় ; কারণ তাঁর বৃহৎ পরিবারে বেশ বড় টুকরোর রুটিরই দরকার ছিল। সেই আনন্দহীন চেষ্টার মধ্যে যৌবনের সমস্ত শক্তি তাঁর নিয়োজিত হয়েছিল এবং আমরা অবাক হই এই ভেবে যে, তিনি কি করে তাঁর রসজ্ঞানকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। পরিতুষ্টি এবং শান্তির জন্য জীবনকে তিনি দেখেছিলেন শুধু একটা বিবর্ণ উচ্চ আশা রূপে। তার যে বিরাট নাটকীয়তা এবং ব্যর্থতার বেদনা—তা প্রাত্যহিক জীবনের ঘন আস্তরণের আড়ালে তাঁর চোখের সামনে চাপা পড়ে গিয়েছিল। কেবল যখন সংসারের সমস্ত লোকগুলির মুখে পরিমিত আহার তুলে দেওয়ার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারলেন তখনই তাঁর সুগভীর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সেই জীবন-নাট্যের মূলে।

সমস্ত সংস্কৃতির মূলে শ্রমের যে গুরুত্ব এবং তার যে বৈচিত্র্য—শেখভের চেয়ে আর কেউ বেশী অনুভব করেছিল বলে আমি জানি না। জীবনের ছোটখাটো ব্যাপারগুলোর মধ্যেও তাঁর এই অনুভূতির প্রকাশ দেখতে পাই : তাঁর স্বভাবে, তাঁর পছন্দে এবং মানুষের শ্রমের প্রতি সেই মহান ভালোবাসায় ও মানুষের সৃষ্টিশীল শক্তির প্রশংসায় তাঁর ক্লান্তি ছিল না। কোনো কিছু গড়তে, বাগান তৈরী করতে, পৃথিবীকে অলংকৃত করতে তিনি ভালবাসতেন। শ্রমের সঙ্গীতকে তিনি অনুভব করতেন। কী মর্মস্পর্শী মমতায় তাঁর বাগানে লাগানো ফলের গাছ এবং বাগান সাজানোর খুদে ঝোপগুলোকে তিনি বড় হয়ে উঠতে দেখতেন, আউট্‌কায় তাঁর বাড়ি তৈরীর পরিকল্পনায় মশগুল তিনি, বলতেন :

"প্রত্যেক লোকে, তার যতটুকু জমিই থাক, তাকে যদি সাজিয়ে-গুছিয়ে তোলে তা হলে পৃথিবীটা কি সুন্দর হয়ে ওঠে !"

'ভাস্‌কা বুসালেভ'* নামে একটা নাটক তখন লিখতে সুরু করেছিলাম। একদিন আমি ভাস্‌কার একটা গর্বোদ্ধত একোক্তি পড়ে শোনাচ্ছিলাম :

> "আরও শক্তি ও আরও ক্ষমতার অধিকারী হত যদি এই দেহ,
> আতপ্ত নিঃশ্বাস ফেলে গলাতেম জমাট তুষার !
> পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চষে ফেলতেম তাকে !
> চলতেম বছরের পর বছর, গড়তেম শহরের পর শহর,
> তৈরী করতেম সংখ্যাতীত গীর্জা, সাজিয়ে দিতেম বাগানে বাগানে ;
> সাজাতেম এ পৃথিবীকে—যেন এক সুন্দরী কুমারী ;
> জড়াতেম বাহুর আড়ালে—প্রেয়সীর মত ;

* নভ্‌গোরদ কাব্যের নায়ক

হৃদয়ের কাছে তুলে ধরে বয়ে নিয়ে যেতাম ঈশ্বরের কাছে :
হে ঈশ্বর দেখ, এখানে এই মর্ত্যের ধূলায়,
দেখ, কী চমৎকার সাজিয়েছে ভাসাকা !
তুমি একে পাথরের মত ছুঁড়ে দিয়েছিলে শূন্যে,
অমূল্য হীরার মতো বানিয়েছি তাকে !
দেখ—হে ঈশ্বর দেখ, আমার আনন্দে যোগ দাও !
দেখ এর উজ্জ্বল দ্যুতি সূর্যের আলোতে !
তোমাকে দিয়েছি হে ঈশ্বর এ সুন্দর উপহার—
শুধু—না, তা হওয়ার নয়, আমি নিজে ভালবাসি একে !"

এই একোক্তিটা শেখভ খুব ভালবাসতেন এবং খুব উত্তেজিত ভাবে কাশতে কাশতে আমাকে এবং উপস্থিত ডক্টর এ. এইচ. আলেক্সিনকে বললেন :

"ভারী সুন্দর ! অত্যন্ত সত্যি, অত্যন্ত মানবীয় ! এতেই আছে সমস্ত দর্শনের সার। এ পৃথিবীকে মানুষ বাসযোগ্য করে তুলেছে—তাই তার নিজের জন্য একে সাচ্ছন্দ্যদায়কও অবশ্যই করে তুলবে।"

বেশ জেদের সঙ্গে, মাথা ঝাঁকি দিয়ে কথাটাকে তিনি সমর্থন করলেন এবং আবার বললেন : "সে করবেই !"

ভাসকার গর্বোদ্ধত বক্তৃতাটা আবার আমাকে পড়বার জন্যে বললেন। আমি পড়লাম এবং তিনি মন দিয়ে শেষ পর্যন্ত শুনলেন। তারপর মন্তব্য করলেন : "শেষ দুটো লাইনের দরকার নেই—ও দুটো অপ্রাসঙ্গিক। ওর কোনো প্রয়োজন নেই।"

* * *

তাঁর নিজের সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে তিনি বলতেন খুব কম এবং খুব অনিচ্ছায়। লিও টলস্টয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি যেমন খুব সংযত ও হুঁশিয়ার হয়ে কথা বলেছেন—তেমনি। কচিৎ, যখন খুব মনের আনন্দে থাকতেন, তখন মাথায় কোনো নতুন ভাব এলে হাসতে হাসতে বলতেন সাধারণত রসিকতা করে। একদিন বললেন :

"জান, একটি শিক্ষয়িত্রীকে নিয়ে লিখব ভাবছি। তিনি হবেন একজন নাস্তিক, ডারুইনকে শ্রদ্ধা করেন, লোকের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করা দরকার বলে মনে করেন। কিন্তু প্রেমের বশীকরণের জন্য একটা বিশেষ হাড় দরকার বলে মাঝরাতে স্নানের ঘরে একটা কালো বেড়ালকে সেদ্ধ করতে তার কিছুমাত্র আটকাবে না।"

তাঁর নাটকগুলি সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'আনন্দ ভরা' এবং আমি মনে করি, তিনি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতেন—আনন্দময় নাটক তিনি লিখে গেছেন। সম্ভবত তাঁর এই বিশ্বাসের প্রভাবেই সাভা মকোজোফও* বলতেন: "গীতিময় কমেডি হিসেবেই শেখভের নাটকগুলি মঞ্চস্থ হওয়া উচিত।"

সাধারণভাবে তিনি সাহিত্যকে দেখেছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিতে, সাহিত্য যারা সবে সুরু করেছে তাদের সম্পর্কে তাঁর মনোযোগ বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য। অপূর্ব ধৈর্যে বি. লাজারেভস্কি, এন. অলিগি ও আরও অনেকের অনেক পাণ্ডুলিপি তিনি সতর্ক ভাবে পড়েছেন।

"আমাদের অনেক লেখকের দরকার", তিনি বলতেন। "সাহিত্য আমাদের দেশে এখনও একটা নতুনত্বের মত, এমন কি শিক্ষিতদের মধ্যেও। নরওয়েতে প্রতি দু'শ ছাব্বিশজন লোক পিছু একজন লেখক আর রাশিয়ায় প্রতি দশ লক্ষের জন্য একজন।..."

* * *

তাঁর অসুস্থতা মাঝে মাঝে তাঁকে করে তুলতো মানসিক বিকারগ্রস্থ—প্রায় মানব-বিদ্বেষী। ওই সব দিনে তাঁর বিচার হতো খামখেয়ালি এবং সমস্ত মানুষ জনের ওপর ব্যবহারে হয়ে উঠতেন কর্কশ। একদিন কৌচে শুয়ে শুয়ে কাশছিলেন এবং একটা থার্মোমিটার নিয়ে নাড়ানাড়া করছিলেন। বললেন:

"মরেও যেতে পারি—এই জন্যে বেঁচে আছি, এটা খুব সুখের নয়। কিন্তু বেঁচে আছি এইটে জেনে যে, সময় হওয়ার আগেই মরে যাব—সে বড় মর্মান্তিক।..."

আর একদিন, খোলা জানালার সামনে বসে সমুদ্রের সুদূর দিগ্বলয় রেখার দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে হঠাৎ গর্‌ গর্‌ করে বলে উঠলেন:

"চমৎকার আবহাওয়া, ভালো ফসল, মধুর ভালোবাসার ঘটনা, বড়লোক হওয়া অথবা পুলিসের বড় কর্তার একটা চাকরি—এই সব আশার মধ্যে বেঁচে থাকতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি কিন্তু এমন লোক আমি দেখিনি যে আরও চতুর ও বুদ্ধিমান হয়ে ওঠার আশায় বেঁচে থাকতে চায়। আমরা ভাবি, 'নতুন জারের অধীনে আমরা আরও ভালো থাকবো এবং আরও ভালো থাকবো দুশো বছরের মধ্যে'—কিন্তু আগামী কালের জীবনটাকে একটু উন্নত করে তোলার কষ্ট স্বীকার কেউ করে না। সামগ্রিক ভাবে জীবন ক্রমশ জটিল হচ্ছে

* মস্কোর এক ব্যবসায়ী—একজন বিপ্লবী এবং শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

উঠছে প্রত্যেক দিন এবং গড়িয়ে চলেছে তার নিজের ইচ্ছে মতো। এদিকে লোকে যেন ক্রমশ নির্বোধ হয়ে উঠছে প্রত্যেক দিন এবং ক্রমশ বেশী সংখ্যায় জীবন ধারার বাইরে গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অলস ভাবে।"

কয়েক মিনিট তিনি গভীর চিন্তায় ডুবে রইলেন, তারপর ভুরু কুঁচকে বলে উঠলেন: "ঠিক গীর্জার মিছিলে খোঁড়া ভিক্ষুকের মত।"

তিনি ছিলেন ডাক্তার এবং সাধারণ রোগীর চেয়ে ডাক্তারের অসুস্থতার বোঝা বহন করা কঠিনতর। রোগী শুধু অনুভব করে, আর ডাক্তার অনুভূতির সঙ্গে এ-ও জানে যে, কোন ধারায় তার দেহযন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এই রকম ক্ষেত্রে আমরা জ্ঞানকে আসন্ন মৃত্যুর কারণ বলে ধরে নিতে পারি।

* * *

যখন তিনি হাসতেন তাঁর চোখ দুটো হয়ে উঠতো বড় সুন্দর; কমণীয়, স্নেহাতুর ও কোমল—মেয়েদের মতো। আর তার হাসি—প্রায় শব্দহীন—এমন এক অস্বাভাবিক রকমের হাসি ছিল তাঁর। তিনি যে আনন্দিত, উচ্ছলিত—সহজেই ধরা পড়ত। আমি বলতে পারি—এমন ভাবুকতায় ভরা হাসি আর কারুকে হাসতে দেখিনি। অমার্জিত কোনো কথা কখনো তাঁর হাসির উদ্রেক করত না।

তাঁর সেই খুশির হাসি হাসতে হাসতে একদিন তিনি বললেন:

"তুমি জান, তোমার ওপরে টলস্টয়ের মনোভাব এত বদলে গেছে কেন? এ তাঁর ঈর্ষা। তিনি মনে করেন—সুলারজিংস্কিকে তিনি যতটা ভালবাসেন, তার চেয়ে সুলার তোমাকে ভালবাসেন বেশী। হ্যাঁ হে—ব্যাপারটা এই রকমই। তিনি গতকাল আমাকে বললেন: 'গোর্কিকে আমি সরল বলে মনে করতে পারিনে—আমি জানি না কেন এমন মনে হয়—তবে আমি পারি না। সুলার যে ওর সঙ্গে এক জায়গায় থাকে—এ জেনেও আমার খুব খারাপ লাগে। সুলারের পক্ষে ওটা খারাপ। গোর্কি একটা নির্দয় লোক। ওর কথায় এক ধর্মতত্ত্বের ছাত্রের কথা আমার মনে পড়ে যায়। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে তার ওপরে মঠের কেতা মাফিক সাজ-সজ্জা চাপিয়ে দেওয়া হলো এবং তার ফলে সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল সকলের ওপরে। গোর্কির আত্মা গোয়েন্দার আত্মা, ও যেন এসে পড়েছে কানানদের দেশে—যেখানে সে নিজেকে বিদেশী বলে মনে করে, তার চারদিকে যা ঘটছে সবই সে লক্ষ্য করে, সকলকেই সে লক্ষ্য করে এবং তার নিজের দেবতার কাছে বিবরণ দাখিল করে। এবং তার

দেবতা হলো একটা দানব, অর্ধেক ছাগল—অর্ধেক মানুষ অথবা কিসান মেয়েদের উপকথার সেই জলের অপদেবতার মতো একটা কিছু।' "

এই কথা বলতে বলতে শেখভ হাসতে সুরু করলেন যতোক্ষণ না তাঁর চোখে জল এসে পড়ল। তারপর চোখ মুছে বলে চললেন:

"আমি তাঁকে বললাম—গোর্কি খুব হৃদয়বান মানুষ! কিন্তু তিনি সজোরে বললেন: 'না, না, আমি তার সম্পর্কে সব জানি! তার নাকটা হাঁসের মত—কেবল অসুখী এবং নির্দয় মানুষদের নাকই ওই রকম হয়। মেয়েরাও তাকে ভালোবাসে না এবং মেয়েরা হলো কুকুরের মতো—গন্ধ শুঁকে ভালো লোক চিনে নেয়। সুলার—সে অবশ্য অন্য ব্যাপার—মানুষকে নিঃস্বার্থ ভাবে ভালো-বাসার সত্যিই দুর্লভ ক্ষমতা আছে তার। ও ব্যাপারে সে একটা প্রতিভা! কেমন ক'রে ভালোবাসতে হয় জানার মানেই হলো সব কিছু জানা।' "

শেখভ এক মুহূর্ত থেমে আবার বলে উঠলেন:

"হ্যাঁ হে, বৃদ্ধকে ঈর্ষা্য় পেয়ে বসেছে ··· কী অপূর্ব মানুষটি!"

* * *

টলস্টয় সম্পর্কে তিনি যখনি কোন কথা বলছেন তখনি দেখেছি তাঁর চোখে লেগেছে অদ্ভুত, দুর্বোধ্য কিন্তু কমনীয় এবং ভাবুক একটা হাসি, কণ্ঠস্বর এসেছে নেমে—যেন বলছেন কোনো রূপকথা বা অতীন্দ্রিয় কিছু, ভাষা হয়েছে কোমল এবং সতর্ক। তিনি এমন অনুযোগ প্রায়ই করতেন যে, টলস্টয়ের কোনো এর্কমানের মতো সমালোচক নেই যিনি এই বৃদ্ধ যাদুকরের সমস্ত তীক্ষ্ণ, আকস্মিক এবং প্রায়ই পরস্পর-বিরুদ্ধ চিন্তাগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে তুলে ধরেন।

"তোমার এটা করা উচিত," তিনি সুলারজিৎস্কিকে বলতেন। "টলস্টয় তোমাকে এত পছন্দ করেন, এত সুন্দর ভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলেন এবং এত কথাও সব বলেন।..."

সুলার সম্পর্কে একবার শেখভ আমায় বলেছিলেন, "ও বিজ্ঞলোক।..." কথাটা অত্যন্ত সত্য।

একদিন টলস্টয় শেখভের কোনো একটা গল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন, বোধ হয় গল্পটার নাম 'দুশেংকা।' "এ যেন একটা লেস," তিনি বলেছিলেন, "কোনো শুদ্ধমতি তরুণীর বোনা! সেকালে এই রকম লেস বোনার মানুষ ছিল; লেসের নক্সায় তাঁরা তুলতেন তাঁদের

জীবন, তাঁদের সুখের যত স্বপ্ন। তাঁদের কাছে যা ছিল প্রিয়—তাই তাঁরা স্বপ্ন দেখতেন নক্সায়—বুনে তুলতেন তাঁদের নির্মল, অনিশ্চিত প্রেম।"

বিচলিত কণ্ঠে কথা বলছিলেন টলস্টয়, তাঁর চোখে ভরে এসেছিল জল। সেই দিনই আবার শেখভের শরীরের তাপটাও বেড়ে গিয়েছিল খুব। তিনি বসে ছিলেন মাথা নীচু করে, জ্বরের তাপে গাল দুটো লাল হয়ে উঠেছে, আস্তে আস্তে চশমার কাচ মুছছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে তিনি চুপচাপ বসেছিলেন, তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। কথা বললেন চাপা, লজ্জিত কণ্ঠে: "অনেকগুলো ছাপার ভুল থেকে গেছে ওটায়।"

* * *

শেখভ সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা যায় কিন্তু সে লেখা হওয়া চাই সুন্দর সূক্ষ্ম বিচারক্ষম—যা আমার নেই। তিনি নিজে যেমন করে লিখেছেন 'প্রান্তর' (দি স্টেপ)—অদ্ভুত সে গল্পের বাতাবরণ, এত মৃদু এবং রুশীয় ধারায় এত করুণ বিষণ্ণ—তেমনি ভাবেই লেখা চাই। যেন একটা গল্প—কারুর নিজের জন্য। এমন মানুষের স্মৃতিচারণ মঙ্গলকর, এ জীবনে এনে দেয় একটা নতুনতর শক্তি, একটা পরিষ্কার সুস্পষ্ট অর্থ।

পাপ এবং বিচ্যুতি সত্ত্বেও মানুষ এ পৃথিবীর কেন্দ্র-গত শক্তি। সহযাত্রী মানুষের প্রেমের জন্য আমরা ক্ষুধিত এবং যখন ক্ষুধার্ত—তখন আধ-সেঁকা রুটিও আমাদের কাছে মিষ্টি লাগে।

২০শ পরিচ্ছেদ ॥ কবি ব্লক ও নিশীথসঙ্গিনী

একদিন চায়ের দোকান পেকার-এ বসে নেভস্কি থেকে আসা একটি অল্পবয়সী মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম।

"আপনার এই বইটি," মেয়েটি বললে, "বিখ্যাত সেই ব্লকের লেখা, তাই না? আমিও তাঁকে জানতুম—যদিও, সত্যি কথা বলতে কি, কেবল একবার মাত্র তাঁকে দেখেছিলাম। ...

"গভীর এক হেমন্ত রাতের কথা, ভেজা কুয়াশার ভেতর—আপনি জানেন, ওই সময়ে কেমন ভিজে ওঠে সব—পরিষদ ভবনের ঘড়িতে তখন মাঝ-রাতের ঘণ্টা বেজে গেছে। খুবই শ্রান্ত বোধ করছিলাম। আমি ঠিক করলাম—বাড়িই ফিরে যাই। হঠাৎ ইটালিয়ানস্কার কোণা থেকে বেশ ছিমছাম পোশাক করা একটি লোক আমার দিকে এগিয়ে এলেন এবং তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্যে

বন্ধুদের কোনো চিহ্ন দেখতে পেলাম না। আমার মাথার ওপরে কয়েকটা ন্যাড়া গাছের ডালপালা দেখা যাচ্ছে এবং কয়েকটা ডালের ওপরে নাড়ি-ভুঁড়ি সব ঝুলছে দড়ির মতো।

"প্রথমে ওই দেখে আমার তো হাসিই পেয়ে গেল! আমার বন্ধুদের অবশিষ্টটুকু যে-ভাবে ডালপালায় ঝুলছে তা দেখে মজাই লাগল।

"একটু পরে অবশ্য খুব বিশ্রী বোধ হতে লাগল। যাই হোক, তারা আমার বন্ধু ছিল, আমারই মতো মানুষ। আর এখন—হঠাৎ—তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, যেন তারা কোনোদিন ছিলই না। কিন্তু প্রথমে—হেসেই উঠেছিলাম।"

* * *

"একবার আমরা এসে পৌঁছলাম এক গ্রামে—যেখানে তিনটের বেশী কুঁড়ে আর নেই। তারই একটার পাশে এক বৃদ্ধা বসে ছিল এবং কাছাকাছি একটা গোরু চরছিল। 'এই যে—দিদিমা', বৃদ্ধাকে আমরা বললাম, 'এই জীবটি কার—তোমার নাকি?'

"চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ল, বৃদ্ধা হাউমাউ করে উঠলে এবং হাঁটু গেড়ে বসল—এই রকম সব আরও কত। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে, 'আমার কাচ্চাবাচ্চারা ··· ওরা সব চোরা-কুঠরিতে লুকিয়ে আছে। তোমরা গোরুটি নিয়ে গেলে তারা মরে যাবে।'

" 'ও নিয়ে চেঁচিও না অতো', আমরা তাকে বললাম। 'তোমাকে পাকা রসিদ লিখে দেবো।'

"আমাদের বাহিনীতে একটা লোক ছিল—কোসট্রমের এক ছোকরা, একেবারে চোরেদের বাটপাড়। সে বৃদ্ধাকে এই রকম একটা রসিদ লিখে দিলে: 'এই বৃদ্ধা নব্বুই বছর বেঁচে আছে এবং আরও নব্বুই বছর বাঁচবার আশা রাখে—কিন্তু তা হবার নয়।' এবং হারামজাদা রসিদে এই ভাবে সই করে দিলে,—'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।'

"বৃদ্ধাকে রসিদটি দিয়ে গোরুটাকে আমরা সঙ্গে টেনে নিয়ে চললাম। এই তামাসাটুকুর ওপরে আমরা এমনি হাসাই হাসছিলাম যে আমাদের হাঁটা আর হচ্ছিল না। বেশ কয়েকবার পেট চেপে ধরে দাঁড়াতে হয়েছে এবং চোখের জলও মুছতে হয়েছে।"

২২শ পরিচ্ছেদ ॥ বীর

১৪ই জুন, ১৯১৫ সালের 'নভোজে ভ্রেমজা'র একটা ছেঁড়া পাতায় আমি নীচের ঘটনাটা পড়েছিলাম :

"পেরিস্কোপ তুলে দেখি—আমাদের ট্রেঞ্চের সামনে সবুজ ক্ষেত বাতাসে দোলা খাচ্ছে, তার ওপরে বিকশিত হয়ে উঠেছে নীল বিন্দুর মত ফুলগুলি। একটু দূরে একটা রাস্তা—দু-পাশে গাছের সারি। রাস্তার ওপাশেও মাঠ—মাঠের একান্তে ফিকে বাদামী রঙের মাটির রেখা—নীচু মতো খাড়াই একটা। ওইখানে হলো শত্রুপক্ষের ট্রেঞ্চ। আমাদের কাছ থেকে দু'শো গজের বেশী নয় জায়গাটা—জার্মানরা ওইখানে গা ঢাকা দিয়ে আছে।

"আমার পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম : 'ট্রেঞ্চের বাইরে জার্মানদের কি কখনো চোখে পড়ে না?'

কখনো সখনো ওদের দেখা যায়—প্রায় সময়েই নয়। স্বাভাবিক ভাবেই, আমাদের লোকজন সব সময়ে ওই ধরনের লক্ষ্যবস্তুর খোঁজে থাকে এবং আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ত্বরিৎ লক্ষ্যভেদে পাকা ওস্তাদও আছে। তাদের একজনকে আমায় দেখিয়ে দেওয়া হলো। ছোটখাটো চেহারার মানুষটি। এমনি দেখে মনে হয়, অপটু—উদাসীন, চোখে ঘুম্-ঘুম্ ভাব। ট্রেঞ্চের খাড়ির ওপরে বসানো বিশেষ ধরনের ইস্পাতের চাদরের পর্দা একটা—তাতে একটা ফুটো করা। তারই পাশে বসে আছে সে অবিচল। এমনি নিঃশব্দে ফুটোয় তীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখে বসে থাকে সে। এইভাবে কাটিয়ে দেয় সারাটা দিন। কেউ তাকে এ কাজ দেয় নি—এ কাজে তাকে বাধ্যও করেনি কেউ। শুধু একমাত্র ওই ফুটোটা দিয়েই দূরের সেই উপত্যকাটা দেখা যায়—যেখানে জার্মানরা পানীয় জল আনতে যায়। যতটা সম্ভব তারা নীচু হয়েই এগোয় অবশ্য; কিন্তু একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে কি বাস্, আবার আড়াল হওয়ার আগে দুম্ করে আওয়াজ ওঠে রুশ ট্রেঞ্চে, এবং ফুটোয় চোখ রাখা লোকটি শূন্য টোটাটা রাইফেল থেকে খুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে নতুন টোটা ভরে নেয়।

"একজন অফিসার জানালেন, 'বন্দীরা আমাদের বলেছে, ওই রাস্তাটাকে তারা বলে "মৃত্যুর রাস্তা"। সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে প্রায় চল্লিশ জনের মতো লোক ওখানে মরেছে। এবং সবগুলি হলো এই ভদ্রলোকটির কীর্তি।'

'ভদ্রলোকটি' অচঞ্চলভাবে শুনলেন আমাদের কথাবার্তা—যেন কথাগুলো

তার সম্পর্কিত কোনো ব্যাপারই নয়। বরং তাঁর লাল লাল দুটো চোখ—নিদ্রাহীনতায় যেন ভার ভার, তেমনি ফুটোর ওপরে একাগ্রভাবে নিবদ্ধ হয়ে রইল।”...

* * *

এই রকম যান্ত্রিক ধ্বংসাবলীর ব্যাপারে আর এক ভদ্রলোকের কথা আমার মনে পড়ে, তিনিও এ বিষয়ে কম সাংঘাতিক নন।

আমাদের রেলগাড়ির কামরায় ছোট বেঞ্চটাতে ইতিমধ্যেই জনা ছয় আছি। আবার ওলখোব স্টেশনে এক চওড়া কাঁধ, গাঁট্টাগোট্টা সৈনিক উঠল ঠেলে-ঠুলে—পিঠে মস্ত ভারী বোঝা, বোঝার ভারে নুয়ে পড়েছে। আমার পাশে যিনি বসেছিলেন তাঁর হাঁটুতে বোঝাটা ঠেসিয়ে দিয়ে, বুকের ওপরে সেণ্ট জর্জের ক্রশটা ঠিক করে নিলে, তারপর একদৃষ্টে তাকাল আমাদের দিকে।

“আপনারা ছ'জন আছেন দেখছি,” সে বলল। “তা ঠিক আছে। ও একই কথা—আপনারা একটু সরে সরে বসুন—আমাকেও একটু বসতে দিন।”

আমার পাশে বসেছিলেন শুল্ক বিভাগের এক কর্মচারী, তিনি রাগে গর্‌গর্‌ করে উঠলেন, “এখানে আর একজনের জায়গাটা আছে কোথায়।”

“তা ইচ্ছে করলে হয়—একজন বীরের জন্য! একজন বীর একটু জায়গা পেতে পারে বৈকি।” বীরপ্রবর শুল্ক বিভাগের কর্মচারীটির পায়ে হাঁটুর একটু চাপ দিয়ে, ঘুরে, বসে পড়ল আমাদের দু'জনের মাঝখানে—কনুই দিয়ে একটু ঠেলে পাশে সরিয়ে দিলে আমাদের দুজনকে।

“এই তো—চমৎকার।”

ওর মাংসল মুখটা এমন কষে কামানো যে নীল হয়ে উঠেছে, তার মাথার চুলও চামড়া তক্‌ ছাঁটা। পাত্‌লা দুটো চোখের ভুরু—যেন চুলগুলো টেনে টেনে তোলা, ভুরুর তলায় ঠেলে আসা গোল গোল দুটো খুদে চোখ—যেন মাছের মতো।

ট্রেনটা হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দুলে উঠল; আমার উল্টো দিকের ভদ্রলোকের ফিকে একটু ঘুম এসেছিল—তিনি বিড় বিড় করে উঠলেন। তারপর আমরা সবাই চুপ করে গেলাম। সৈনিকটি নির্ভয়ে একটা সিগারেট ধরাল এবং তার সামনে বসা লাল দাড়িওয়ালা লোকটির সঙ্গে কথা-বার্তা সুরু করে দিলে। আমি ঢুলতে লাগলাম আর যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ওদের কথা আমার কানে বাজতে লাগল।

"সকলের কাছেই এ একটা অসাধারণ চিত্তাকর্ষক যুদ্ধ," লাল দাড়িওয়ালা লোকটি বললে।

সৈনিকটি কামরার মেঝেতে খানিকটা থুতু ফেলে কথাটার সম্মতি জানালে: "সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।"

"বিশেষ করে চারদিকে সব কিছুকে উৎসাহে ভরে তুলেছে।"...

"এবং আমাদেরও সব দিকে কাজের স্বাধীনতা দিয়েছে।"

"ঠিক কথা। তবে সন্দেহ নেই—অনেক বেশী লোকেই তার ফলে মারা যাচ্ছে।..."

এই প্রস্তাবনাটুকুর পর গাড়ির চাকার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হতে লাগল সৈনিকটির জমকালো হেঁড়ে গলা:

"আমার কথাই ধরুন। যুদ্ধের আগে, এই আপনার মতোই কাপড়-জামা পরা একটা সাধারণ লোক ছিলাম মাত্র। আমি পাঁচটি বছর নদীর এদিক ওদিক কাঠের বোঝা ঠেলে মরেছি; আর এখন—'এন. সি. ও'তে অনেকে মারা যাওয়ায়, আমার শুধু একটা পরীক্ষায় পাশ করলেই হলো—সোজা কর্পোরেলের চাকরী। স্কুলেই এখন চলেছি। হাসপাতালে আহত হয়ে পড়ে থাকার সময়ে লেখাপড়া করেছি। ওরা জানে—আমি নিয়মানুবর্তিতা বুঝি, বন্দুক চালাবার নিশানা আছে আমার রীতি মতো ভালো এবং অবধারিত। ঈশ্বর আমার ওপর সদয়। নিজেই আমি অবাক হয়ে ভাবি—কেন আমার এই সৌভাগ্য। সাধারণ অফিসার, মাসকেটি অফিসার সবাই আসতো আমার গুলি ছোঁড়া দেখতে। আমার প্রথমবার আহত হওয়ার আগেই আমি উনত্রিশ জন জার্মানকে খতম করেছিলাম—গুন্‌তি ভুল নেই; আমি নিজে অবশ্য গুণিনি; কারণ আমি ভাল করেই জানি, যেমনি আমি গুণতে সুরু করবো অমনি আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাবে। এক বছরে আমি যত জার্মান মেরেছি—জঙ্গলে সারা জীবন শিকার করেও অতোগুলো বুনো মুরগী কেউ মারতে পারেনি। অবশ্য মুরগী বা হাঁসের চেয়ে মানুষ আকারে অনেক বড়। কিন্তু এমন কখনো হয় না যে মানুষটার গোটা শরীরটা তোমার চোখে পড়বে—তোমার লক্ষ্য শুধু মাথাটুকু কখন ট্রেঞ্চের ভেতর থেকে একটু উঁকি মারবে বা এক ট্রেঞ্চ থেকে আর এক ট্রেঞ্চে যাওয়ার সময় একটু নড়ে চড়ে উঠবে। আমার কাজ ছিল আমার ছোট ট্রেঞ্চ টুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। একটা ফুটোর মধ্যে চোখ দিয়ে আমি বসে থাকতাম। সামনে ছিল একটা জলা—দু'শো হাতের মতো চওড়া। ওই জলার ওপারে

ছিল জার্মানরা। তাদের পক্ষে ব্যাপারটা খুব সুখকর ছিল না—এ আমি স্বীকার করি ; একবার আমি পুরো একদিনে খতম করেছিলাম আটজনকে।"

সে হেসে উঠলো—অদ্ভুত ঘড়ঘড়ে হাসি, খিরগিজের মানুষদের মত। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

"এই খেলায় আমার সফলতা বেশ বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে উঠেছিল।..."

আমি চোখ খুলে তার দিকে তাকালাম। হেমন্তের ভোরের অস্পষ্ট আলোয় বীর সৈনিকের গোল, কেশবিহীন মুখটা ঝক্‌মক্‌ করছে—যেন তেল মাখানো। লোকটি নিজে নিজেই খুশি এবং গর্বিত। মাছের মতো চোখ দুটো তার খুশিতে উপছে উঠছে।...

*　　　　*　　　　*

এই সৈনিকের গল্পটি আমার জানা এক পাদ্রীকে আমি বলেছিলাম।

"এতে তোমার এত রাগ করার কি আছে?" তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন। "আমাদের কাজের অনিবার্যতায় যদি আমরা বিশ্বাস করি, কাজ আমাদের করতেই হবে—আমাদের প্রতিদিনের কর্তব্য, পুরোপুরি যতটো পারি। আর ঈশ্বর যদি যুদ্ধের ভেতর দিয়েই এই কুটিল শাস্তির ব্যবস্থা করেন—তা হলে ওটাকে তাঁর বিধান হিসেবেই মেনে নিতে হবে। আর এ যদি তাঁর বিধান হয়, তা হলে"—তিনি তাঁর কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, "ঈশ্বর আমাদের চেয়ে বেশী নিষ্ঠুর নন। অতএব তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এস আমরা কাজ করি এবং আবার বলছি—পুরোপুরি যতটা আমরা পারি।"

ছোটখাটো, শুকনো মতো মানুষটি তিনি ; তাঁর স্বচ্ছ শিশুর মতো চোখ দুটি বিষণ্ণভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চোখ নামিয়ে তিনি ফিস ফিস করে কোমল কণ্ঠে বললেন: "ঈশ্বর আমাদের চেয়ে বেশী নিষ্ঠুর নন।..."

২৩শ পরিচ্ছেদ ॥ যুদ্ধ সম্পর্কে মতামত

সে ছিল মস্কোর এক গাড়োয়ান—কাঠ-কাঠ মুখে ভাবলেশহীন একজোড়া চোখ। একটা ঘোড়া ছিল তার—সেটা যেন উট আর ভেড়ার বর্ণশংকর। ওর মাথায় পরা জীর্ণ দোমড়ানো একটা টুপি এবং গায়ে একটা নীল ওভার কোট—বগলের তলাটা আবার ছেঁড়া ; তার পশমী বুট জুতোর ফুটোর ভেতর থেকে দেখা যায় নোংরা মোজার কিছুটা। মনে হয় মানুষটা যেন ওই রকম জীর্ণ

পোশাক পরেছে ইচ্ছে করেই—লোক-দেখানোর জন্যে। 'দেখ আমি কি রকম গরীব'—যেন এই রকম বলতে চায়। সে তার গাড়ির বসবার জায়গায় বসবে একপাশ ঘেঁষে, যাওয়ার পথে যতো গীর্জা পড়বে সব কটির সামনে ক্রুশ-চিহ্ন করবে। বসে বসে অলস কথালাপে বলবে—দিনগুজরান করা কেমন ব্যয় সাপেক্ষ হয়ে উঠেছে। ঠিক অভিযোগ নয়—কিছুটা কর্কশ গলায় উদ্দেশ্যহীন বক্‌বকানি।

একবার তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—যুদ্ধ সম্পর্কে সে কি ভাবছে।

"ওসব নিয়ে আমি ভাববো কেন?" সে উত্তর দিল। "এ যুদ্ধ করছেন জার—তাই ভাববার দায় তাঁরই।"

"তুমি কাগজ পড়?"

"না—আমরা লেখাপড়া জানা লোক নই। কখনো কখনো মদের দোকানে এক-আধটুকু খবর শোনার সুযোগ হয়: এগিয়েছে—পেছিয়েছে—এইরকম সব। কিন্তু খবরের কাগজে ভালটা কি হয়? এদেশে একজন আছে—যে অনেক মিথ্যে কথা বলে এবং তার নাম 'খবরের কাগজ।' "

তার চাবুক দিয়ে বগলের তলাটা সে চুলকোতে লাগল এবং বললে: "জার্মানরা কি আমাদের হারিয়ে দিচ্ছে?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

"লোক কাদের বেশী—আমাদের না জার্মানদের?"

"আমাদের।" আমি উত্তর দিলাম।

তার ঘোড়ার লোমশ গায়ের ওপর দিয়ে চাবুকটা সশব্দে ঘুরিয়ে নিয়ে দার্শনিক স্থৈর্যে সে বলে উঠল: "ওই দেখ—জলে মাখন গলে না।* অর্থাৎ সংখ্যায় বেশী হলে কি হবে, উত্তাপ কম।"

* * *

এক রেলকর্মচারীর দাড়ি কামাচ্ছিল এক নাপিত।

"এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই," সে পরম আশ্বাস দিয়ে মন্তব্য করল, "জার্মানরা আমাদের চড় কষাবে; এ তারা সব সময়েই করেছে।"

রেলকর্মচারী প্রতিবাদ করে বললে, "না, আমরাও সময় মতো মার দিয়েছি। যেমন, মহারাণী এলিজাবেথের রাজত্ব কালে আমরা, এমন কি বার্লিন পর্যন্ত অধিকার করেছিলাম।"

---

* রুশ প্রবচন

"ও কথা আগে কখনো শুনিনি তো!" নাপিত বলল। "নিজে আমি সৈনিক ছিলাম—কিন্তু ও কথা আগে কখনো শুনিনি।" যেন ওই বানানো গল্পের আসল কথাটা সে ধরে ফেলেছে—তাই আরও বললে, "বোধ হয় কথাটা বানানো হয়েছে আমাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্যে, আমাদের বোধশক্তিকে জাগিয়ে তুলবার জন্যে।"

অথচ, এই মাত্র গত বছর এই মানুষটিই আমাকে বলেছিল যে, শীত প্রাসাদের সামনে সে হাঁটু গেড়ে বসে, গেয়েছিল রুশ জাতীয় সঙ্গীত। চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল তার মুখ। "আমার সমস্ত হৃদয় গান করছিল," সে বলেছিল। "সে ছিল বড় মহিমময় মুহূর্ত।..."

* * *

রুশ জাতীয় থিয়েটার 'নারোদনি দোমে'র সামনের বাগানে জড়ো হয়েছিল নানা ধরনের মানুষের একটা দল—ছোটখাটো একটি সৈনিকের খুব তেজদীপ্ত কথাবার্তা শুনছিল তারা। সৈনিকটির মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজের পট্টি জড়ানো এবং তার উজ্জল চোখে ঝলসে উঠছে উদ্দীপনা। কথা বলছিল সে বেশ উঁচু গলায় এবং তার শ্রোতাদের ওপর প্রভাব জমাবার মতলবে মাঝে মাঝে চেপে ধরছিল তার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের।

"বাস্তবিক পক্ষে," সে বলল, "আমরাই অবশ্য বেশী শক্তিমান, তবে অন্যান্য বিষয়ে আমরা ওদের যোগ্য নই। জার্মানরা হিসেব কষে যুদ্ধ করে, সৈন্য ব্যবহার করে সতর্ক ভাবে, আর আমরা—ওই দুমদাম! এক সঙ্গে সব দিলাম হাঁড়িতে ঢেলে।..."

বিশালকায়, শক্ত সমর্থ এক কৃষক, গায়ে ছেঁড়া ওভার কোট পরা—বেশ কাজের লোকের মতো ভারিক্কি গলায় এই সময়ে মন্তব্য করলো: "লোক-গুলোকে নিয়ে কি করবো না করবো—এ ভাবনার চেয়ে আমরা জানি, আমাদের লোক আছে ঢের। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা জার্মানদের মতো না করে অন্য রকমে কাজ করি। আমাদের গোটা উদ্দেশ্যটা হলো—এ দেশের লোক সংখ্যা কমানো, যাতে বেঁচে থাকবে যারা তারা যেন যথেষ্ট জায়গা পায়।"

কথাগুলো বলতে বলতে সে বেশ জমকালো একটা হাই তুললে। কথায় তার ব্যঙ্গের সুর দেখে তার মুখের দিকে তাকালাম—কিন্তু মুখটা যেন পাথর থেকে কুঁদে তোলা এবং চোখে কেমন প্রশান্ত, ঘুম ঘুম ভাব।

তার সুরে সুর মিলালো পাকা মাথা, তুবড়ে যাওয়া খুদে মতো একটি

লোক। "ঠিক কথা," সে বলল। "যুদ্ধ আর কিসের জন্যে—হয় অন্যের দেশ গ্রাস করো—নয় নিজেদের লোকসংখ্যা কমাও।"

সৈনিকটি বলে চললো: "তাছাড়া, পোলদের পোল্যাণ্ড ফিরিয়ে দিয়ে ইতিমধ্যেই একটা ভুল করে ফেলা হয়েছে। তারা এখন সর্বত্র। কিছু গিয়ে যোগ দিয়েছে হূনদের সঙ্গে, কিছু আছে আমাদের সঙ্গে এবং এখন সব মেশামেশি হয়ে একাকার। তারা পরস্পরকে মারবার জন্যে মোটেই ভাবছে না।"

বিশালকায় কৃষকটি স্থির বিশ্বাসে জোর দিয়ে বলে উঠল, "আহা, যদি তাদের বাধ্য করতেও পারা যেত—তা হলেও ঠিক তারা পরস্পরকে মারত, শুধু একজন যদি কেউ ওদের লাগিয়ে রাখতে পারে। আমাদের লোকেরা লড়াইটা ভালোইবাসে।"

* * *

মোটামুটি ভাবে আমি দেখি, রাস্তার লোকে এই জঘন্য নোংরা হত্যালীলা সম্পর্কে এমন ভাবে বলাবলি করছে যেন এ এমন একটা ঘটনা—যার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, সে যেন দর্শক হিসেবে শুধু দেখছে। কখনো শুনি কিছুটা বিদ্বেষ মেশা কথা-বার্তা যদিও আমি বুঝতে পারি না, কার বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষ। কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে সমালোচনা চোখে পড়ার মতো বৃদ্ধি পায়নি, তার বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যাও বেড়েছে বলে বোধ হয় না। যা লক্ষ্যে পড়ে তা হলো একটা বিরক্তিকর, সাধারণ নৈরাজ্যবাদের উদ্ভব। এর বিরুদ্ধে রয়েছে শ্রমিকদের দৃষ্টিভঙ্গী, তারা সম্পূর্ণ সচেতন যে এই দুঃখবহ ঘটনা সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি তুলনাহীন ভাবে উন্নত; বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের নেতৃত্বের সহজাত প্রবৃত্তি—এমন কি, মানবতা-বোধও। পার্টির বাইরের সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যেও এই দৃষ্টিভঙ্গী সহজেই লক্ষ্যে পড়ে—পি. এ. স্করোখোডফের মতো রীতিমতো পার্টির লোকদের তো কথাই নেই।

খুব বেশী দিনের কথা নয়—স্করোখোডফকে একটা মন্তব্য করতে শুনেছিলাম —দৃষ্টান্ত হিসাবে উদ্ধৃত করি:

"সামরিক পরাজয়ে শ্রেণী হিসাবে আমরা লাভবান হবো—বলা বাহুল্য, এইটাই আসল কথা। কিন্তু তা' সত্ত্বেও ওই ভাবের কথায় আত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। লড়াইয়ে লজ্জা-বোধ না করেও উপায় নেই, আবার যাঁরা সব লড়াই করছেন তাঁদের জন্য দুঃখ-বোধও হয়। ভেবে দেখুন একবার, সব চেয়ে স্বাস্থ্যবান মানুষগুলো সেখানে মারা যাচ্ছে—যাঁরা কাজ সুরু করতে পারতেন

আগামী কালের। বিপ্লব চাইবে সমস্ত স্বাস্থ্যবানদের। যথেষ্ট সংখ্যায় আমাদের তখন থাকবে কি ?"

সংস্কৃতির গুরুত্বটাও তিনি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন : "এটা বলা বোকামি যে, সংস্কৃতিটা বুর্জোয়াদের আবিষ্কার, অতএব আমাদের পক্ষে খারাপ। সংস্কৃতি আমাদের, এ আমাদের আইনানুগ সম্পদ, আমাদের উত্তরাধিকার। ওর মধ্যে ফালতু কি কি আছে সে আমরাই খুঁজে বার করবো এবং যা অপ্রয়োজনীয় তাকে বর্জন করবো। কিন্তু প্রথমে চাই ওর মূল্যায়ণ এবং আমরা ছাড়া সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার আর কারুর নেই। এই সেদিন প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ধরে আমার এক তরুণ বন্ধুর কথা শুনছিলাম—যিনি স্যাম্পসোনেভস্কি কারখানা থেকে সংস্কৃতিকে একেবারে বিদায় করে দিচ্ছিলেন। এবং আমি ভাবছিলাম : এই লোকটি আমাকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করছেন যে, একটা ভাল বুট জুতোর চেয়ে ছেঁড়া জুতোই ভাল। কি চমৎকার শিক্ষা। এর একমাত্র ওষুধ ওই সব লোকের কান মলে দেওয়া।

২৪শ পরিচ্ছেদ ॥ বাঁদরের বদলে

বীজানুতত্ত্ববিদ অধ্যাপক জেড. এক সময়ে আমাকে এই গল্পটা বলেছিলেন।

"একদিন জেনারেল বি-র সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম যে আমার গবেষণার জন্য কিছু বাঁদর দরকার।—কেমন করে তা জোগাড় করা যাবে তার জন্যে আমি চিন্তিত। সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল রীতিমত গুরুত্ব দিয়েই বলে উঠলেন :

'ইহুদীরা কেমন—চলবে তাদের দিয়ে ? এখানে আমার কিছু ইহুদী আছে, সব গুপ্তচর, তাদের ফাঁসী তো হবেই—তাদের দিয়ে যদি চলে তো আপনি এখুনি তাদের পেতে পারেন।'

"এবং আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই তিনি তাঁর আর্দালীকে হুকুম দিলেন—'ফাঁসীর জন্য কজন গুপ্তচর আছে দেখ।'

"আমি মাননীয় জেনারেলকে ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে আমার গবেষণার পক্ষে মানুষ ঠিক কাজে লাগবে না। কিন্তু তিনি আমার কথা একেবারেই বুঝতে পারলেন না এবং দু-চোখ বড় বড় করে বললেন :

'সত্যি বটে—বাঁদরের চেয়ে মানুষ আরও বুদ্ধিমান, তাই না ? আপনি যদি মানুষের শরীরে বিষ ঢুকিয়ে দেন তা তাহলে সে বলতে পারবে—কি তার মনে হচ্ছে কিন্তু বাঁদর তা পারবে না।'

"এমন সময় আর্দালী এসে জানাল—'গুপ্তচর হিসেবে যাদের ধরা হয়েছে তাদের মধ্যে একটিও ইহুদী নেই, আছে শুধু রুমানিয়া আর বোহেমিয়ার মানুষ।'

'কি দুঃখের বিষয়!' জেনারেল বললেন, 'আমার বোধ হয়—বোহেমিয়ার লোক দিয়েও চলবে না?...কি দুঃখের কথা!' "...

২৫শ পরিচ্ছেদ ॥ ইহুদী বিরোধিতা

ইহুদীদের সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতে যে কেউ লজ্জা এবং নিন্দার বিষয় বলে মনে করেন। বিস্ময়কর ভাবে সংকল্পে অটল এবং ধ্বংস থেকে অব্যাহতি পাওয়া ওই জাতির কোনো মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে আমি অবশ্য জীবনে কখনো কোনো ভাবে আঘাত করিনি। বরং যখনি কোনো ইহুদীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তখনি আমার মনে পড়ে গেছে—ইহুদী-বিদ্বেষী ধর্মোন্মাদ একটা সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার জাতিগত সম্পর্ক আছে এবং আমার দেশের মানুষের উন্মাদ সব কাজকর্মের জন্য আমার দায়িত্বও কম নয়।

আমি বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে এবং মনোযোগ দিয়ে বেশ কয়েকখানি বই পড়েছি যাতে ইহুদী-বিদ্বেষকে সমর্থন করা হয়েছে। একটা জাতিকে—পুরো জাতিকে কলঙ্কিত করার একটা নির্দিষ্ট, কুৎসিত ও দুর্নীতিপূর্ণ অভিসন্ধিতে লেখা কোনো বই পড়ে ওঠা বড় কষ্টকর এবং এমন কি, মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এ এক যন্ত্রণাদায়ক কর্তব্য! একটা নৈতিক অজ্ঞতা, একটা ক্রুদ্ধ চিৎকার, বন্যপশুর গজরানি এবং দ্বেষ ও হিংসার দাঁত কড়মড়ি ছাড়া ওসব গ্রন্থে আমি আর কিছু পাইনি। এই রকম অস্ত্রে সজ্জিত হলে একজনের প্রমাণ করতে আটকায় না যে, স্লাভ বা ফিন বা অন্যান্য সব জাতিও নষ্ট হয়ে গেছে এবং উদ্ধারের অতীত। ভয়ংকর ইহুদী-বিদ্বেষের এটাও কি একটা কারণ নয় যে, অন্যান্য বর্ণশংকর জাতিগুলির মধ্যে তারাই হলো একমাত্র জাতি, যারা তুলনা মূলক ভাবে বাইরের জীবন এবং অন্তর-সত্তার সবচেয়ে বেশী পবিত্রতা রক্ষা করছে? ইহুদী বিদ্বেষীদের চেয়ে বোধকরি মানবীয় গুণাবলীর আধিক্য ইহুদীদের মধ্যেই কি দেখি না?

জনসাধারণের মধ্যে ইহুদী-বিদ্বেষ প্রচারের নিন্দনীয় কাজে ইহুদী 'উপাখ্যানের' লেখক ও বর্ণনাদাতাদের অবদানই বেশী। তাদের মধ্যে ইহুদী লেখকদেরও প্রায় সাক্ষাৎ মেলে—এও এক অদ্ভুত ব্যাপার। এটা হওয়া সম্ভব যে, তাঁদের কেউ কেউ হয়তো চান—তাঁদের জাতির বিষাদময় রসিকতা গুলো যে

কি চমৎকার—সেগুলো তুলে ধরে তাঁরা তাঁদের জাতির মানুষদের জন্য শত্রুদের মধ্যেও সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে চান। এমনও হতে পারে—অন্যান্য উপাখ্যান প্রণেতারা ইহুদীদের পরিহাস করার মধ্যে দিয়ে তাঁদের চারদিকের নির্বোধদের এটাই বিশ্বাস করাতে চাচ্ছেন যে, তিনি ভীতির সঞ্চার করছেন না। অবশ্য ওই সব লেখকদের মধ্যে অনেক হীনমনা এবং দুষ্কৃতিকারীও আছে।

"জাতিসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব", "মানবজাতির সখ্য" !—এই রকম সব প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জাতিগুলি থুতু ফেলছে পরস্পরের মুখে।

* * *

১৮৮০ সালের দিকে এই রকম সব উপ্যাখ্যান প্রণেতাদের সংখ্যা খুব বেশীই ছিল। এদের মধ্যে সব চেয়ে প্রখ্যাতনামা ছিলেন ভেইনবার্গ প্লুস্‌কিন। তিনি ছিলেন পি. আই. ভেইনবার্গের ভাই! হাইনরীখ হাইনের রচনার সার্থক অনুবাদ করে যিনি 'তাম্‌বোফের হাইনে' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। এই ভেইনবার্গ প্লুসকিন অত্যন্ত নির্বোধ ধরনের 'ইহুদী উপাখ্যান' অথবা 'ইহুদী জীবনের খণ্ড চিত্র' নাম দিয়ে দু-একখানি গ্রন্থও প্রকাশ করেছেন। গল্পগুলো আমি উপভোগ করেছি। তিনি ছিলেন একজন ওস্তাদ গল্প লিখিয়ে। সঙ্গীত ভবনের মঞ্চে যখন তিনি অভিনয় করতেন তখন কাজানের 'পানাএফ' থিয়েটারে তাঁর গল্প শুনতে প্রায়ই যেতাম। সে সময়ে আমি ছিলাম পাঁউরুটির কারবারী।

অল্পবয়সী এক ছাত্র গ্রেইসমানকে সঙ্গে নিয়ে একদিন গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। বড় মধুর চরিত্রের মানুষ ছিল গ্রেইসমান; পরে সে আত্মহত্যা করে। সেদিন ভেইনবার্গের রসিকতা খুবই উপভোগ করছিলাম, এমন সময় হঠাৎ আমার পাশেই শুনতে পেলাম একটা গোঙানির আওয়াজ—একটা মানুষের গলা চেপে ধরলে যেমন শব্দ বেরোয় তেমনি। তাকিয়ে দেখলাম। চাঁদের আলো আর মঞ্চের লাল লণ্ঠনের আলোয় গ্রেইসমানের মুখটা হয়ে উঠেছে ভয়ংকর অস্বাভাবিক রকমের—সমস্তটা পাংশু সবুজ এবং ভয়ংকরভাবে যেন নিষ্পিষ্ট! প্রচণ্ডভাবে সে কাঁপছিল—এমন কি দাঁত গুলোও যেন কাঁপছে; তার মুখ অর্ধ-বিস্ফারিত, চোখ সজল এবং ভয়ানক রক্তিম। দাঁতের ফাঁকে একটা অদ্ভুত হিস্‌ হিস্‌ শব্দ করে সে বলতে লাগল:

"ঘৃণ্য—ঘৃণ্‌—ণ্য—"

তারপর শক্ত হয়ে উঠলো তার হাত, দুর্বল একটা ঘুষি তুললো শূন্যে—এমন আস্তে আস্তে, যেন এক মন ওজন।

আমার হাসি থেমে গেল। গ্রেইসমান দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালো—মাথা নীচু করে, দর্শকদের ভেতর দিয়ে পাশ কাটিয়ে সে হল থেকে বেরিয়ে গেল। আমিও উঠে পড়লাম এবং চলে এলাম—তাকে অনুসরণ করে নয়, চলে গেলাম অন্য দিকে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছিলাম অনেকক্ষণ আর কেবলি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল একটা অত্যাচারিত মানুষের বিকৃত মুখ। আমার স্পষ্টই মনে হচ্ছিল—তার যন্ত্রণা আমি আনন্দে উপভোগ করছিলাম।

আমি অবশ্যই সচেতন যে, সমস্ত জাতির মানুষই পরস্পরের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে একটা কুৎসিত আচরণ করে চলেছে, যত রকমের নীচতার কল্পনা করা যেতে পারে তাকে নানা উদ্ভাবনী কৌশলে সামনে তুলে ধরছে। এই রকম সমস্ত সক্রিয় শত্রুতাচরণের মধ্যে ইহুদী-বিদ্বেষকে আমি সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার বলে মনে করি।

২৬শ পরিচ্ছেদ ।। বিদ্রোহী চিন্তাধারা

'প্যালেস অফ জাস্টিস'—ধর্মাধিকরণ প্রাসাদ জ্বলছে দাউদাউ করে। ছাদ ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়েছে। দেয়ালগুলোর মাঝে মাঝে চড়-বড় শব্দ করে উঠছে আগুন, লাল ও হলদে উলের গোছার মতো অগ্নিশিখা উঁকি মারছে জানালা দিয়ে—রাত্রির কালো আকাশে ছুঁড়ে দিচ্ছে নথিপত্র-পোড়া ভস্ম রাশি। আগুন নেভাবার কোনো চেষ্টা কেউ করছে না।

প্রায় জনা তিরিশ লোক আগুনের এই ধ্বংসলীলার তারিফ করছিল। দাঁড়ে বসা কোকিলের মতো বসেছিল তারা কামানের ওপরে—অস্ত্র কারখানার প্রাচীন সম্পদ গুলি। কেউ বসেছিল কামানের পেছনের দিকে। সার সার সমস্ত কামানগুলোর মুখ পরিষদ ভবনের দিকে ফেরানো—ওগুলো দেখাচ্ছে কেমন অদ্ভুত এবং কৌতূহলোদ্দীপক। আর পরিষদ ভবন যেন উথলে ওঠা কেটলি। অন্যদিকে মোটরে অথবা পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বন্দী জেনারেল অথবা মন্ত্রীদের আর তাই নিয়ে অন্ধকারে, অজস্র ভীড়ের মধ্যে লোকজনের ব্যস্ত ছোটাছুটি এদিক ওদিক।

একটি যুবা কণ্ঠ সুস্পষ্ট ধ্বনিত হয়ে উঠল :

"কমরেড, কে এখানে একটা রুটি ফেলে গেছে?"

কামান-টানা গাড়িগুলোর মাঝখানে লম্বা পানা একটি লোক, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে-পড়া, প্রহরীর মতো ঘোরাফেরা করছে। মাথায় তার ভেড়ার

চামড়ার লোমশ টুপি। ভেড়ার চামড়ার ওভার কোটের উঁচু কলারে ঢাকা পড়ে গেছে তার মুখটা। সে থমকে দাঁড়াল এবং সোজসুজি জিজ্ঞেস করলো :

"এর মানে কি তা হলে—সব বিচার-ব্যবস্থা বাতিল? সমস্ত দণ্ড-শাস্তির শেষ?—তাই কি?"

কেউ তার উত্তর দিল না। রাতটা বড় ঠাণ্ডা। ঝুঁকে ঝুঁকে থাকা দর্শকদের মূর্তিগুলো নিশ্চল—পাথরের দেয়ালগুলোর মাঝে মাঝে কাঠের স্তূপের দহনলীলা দেখতে দেখতে তারা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে। জনতার হলদে হলদে মুখগুলো আগুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—অদৃশ্য চোখগুলো ঝলকে উঠেছে। কামানের কাছে জড়ো হয়ে থাকা লোকগুলোকে মনে হচ্ছিল যেন পুরানো—দলা পাকানো কিছু; আজকে এই রাতে ওরা যেন বিস্ময়কর ভাবে ফালতু হয়ে গেছে—আর রাশিয়া তখন একটা নতুন, কঠিনতর এবং অধিকতর বীর্যের পথে মোড় নিচ্ছে।

"আমি জানতে চাই—অপরাধীদের কি হবে? তাদের বিচার আর হবে না—না কি?"

কে যেন নীচু গলায় বিদ্রূপ ভরে উত্তর দিল: "ভয় নেই—তোমাকে তারা ভুলবে না, তারা তোমাকে ঠিক বিচারের কাঠগড়ায় খাড়া করবে হে?"

অলস ভাবে গড়িয়ে চললো অদ্ভুত কথাবার্তা।

"মামলা তারা ঠিক চালিয়ে যাবে।"

"আগুন লাগালো কে?"

"জেলের কয়েদীরা নিশ্চয়ই।"

"বোধ হয় তাদের সুবিধের জন্য?"

"ওই যে—ওখানে যেমন একজন।..."

লোমশ টুপি-পরা লোকটি সক্রোধে চীৎকার করে বলে উঠল, "আমি অপরাধী নই, চোরও নই—এই বাড়িটার আমি পাহারাদার। আমি ছাড়া এখানে কেউ নেই—না, কেউ নেই।"

পায়ের তলায় মাটিতে সে থুক্ করে খানিকটা থুতু ফেললে, তার ওপরে বুট ঘষে সে বলে চললো :

"এ ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। যদি ওরা সমস্ত অপরাধীকে ক্ষমা করবে বলে ঠিক করে থাকে—তাহলে আমার মনে হয়—এই ধরনের ব্যাপারে ওটা খুব কাঁচা কাজ হবে। বিচার পদ্ধতি নষ্ট করার আগে ওদের উচিত—অপরাধকে

নিশ্চিহ্ন করা। কাগজপত্র এবং ঘর বাড়ি পোড়ানো বোকামি। আগে অপরাধীদের বাতিল করে দিতে হবে—না হলে আবার ঢিমে তালে সেই সব সুরু হবে—সেই লেখালেখি, কাগজপত্র, বিচারের রায় এবং গারদখানা। আমি বলি, আগে সেই পাপকেই এই মুহূর্তে শেষ করো। ··· সমস্ত পুরাতন যন্ত্র।···"

সে তার মাথা ঝাঁকি দিয়ে আবার বলল, "ওটা কেমন করে করতে হবে—তা আমি এখুনি ওদের গিয়ে বলছি।"

সে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল এবং পরিষদ ভবনের দিকে এগিয়ে গেল। তার চারদিকের লোকজন একটা অস্পষ্ট, বিদ্রূপভরা গুঞ্জন করতে করতে তাকে অনুসরণ করল। কে একজন হেসে উঠল এবং কুকুরের মতো শব্দ করে তীক্ষ্ম ভাবে কাশতে সুরু করে দিলে। তবু এই লোকটিই, যে যুক্তির প্রেরণায় নয়—বরং সহজাত বোধের দ্বারা চালিত হয়ে মূল কথাটা প্রথম ঘোষণা করেছিল: 'সব কিছু বাতিল করা উচিত।'

এখন গ্রীষ্মকাল এসে গেছে। বিপ্লব সম্পর্কে বক্তৃতাগুলিও আরও সুদৃঢ় ভাবে এবং সংখ্যাতেও ক্রমশ বেশী হয়ে উঠছে। গতকাল লোকসভা ভবনের সভার পর দাড়িওয়ালা এক সৈনিক জন পঞ্চাশেক লোকের এক ভিড়ের সামনে তোৎলাতে তোৎলাতে এবং ঢোক গিলতে গিলতে উৎসাহ ভরে বক্তৃতা সুরু করে দিল:

"ওরা এত কী বক্ বক্ করছে? ওরা আবার সেই সব পুরাতন ব্যাপার সুরু করছে—সেই সব ব্যাপার যা আমাদের এখন ধ্বংস করে দিচ্ছে। আর নয় বন্ধুগণ, এসো আমরা তাদের বলি—তোমাদের খাদ্য, পানীয় আর বক্তৃতা যতো খুশি ইচ্ছে তোমাদের মধ্যেই চালিয়ে যাও—আমাদের জনসাধারণকে ছেড়ে দাও, আমরা আমাদের ব্যাপার ঠিক করে নেবো। দেখতে পাচ্ছ না? তোমাদের সমস্ত নোংরা আবর্জনা আমরা সাফ করে ফেলবার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং শেকড় মূল যতো আছে সব ছিঁড়ে উপড়ে নিঃশেষ করে দেবো। হ্যাঁ, আমরা তাই করবো। তাই নয় কি বন্ধুগণ?"

সমবেত কণ্ঠে জনতা প্রতিধ্বনি করে উঠল: "খাঁটি কথা; আসল কথা।"

"বেশ—এই তাহলে ঠিক হয়ে গেল—তাদের সোজাসুজি বলতে হবে: 'সরে দাঁড়ান মশায়রা—আমাদের ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন না। যত খুশি খাওয়া দাওয়া করুন, পান করুন—কিন্তু আমাদের আপনারা বিরক্ত করবেন না।' ওরা

আমাদের বলে—'এগিয়ে যাও—আবার লড়াই লাগিয়ে দাও।' না না—আর নয় বন্ধুগণ ! আমরা এগিয়ে গেছি, কুচকাওয়াজ করেছি, লড়াই করেছি এবং মরেওছি ঢের। বলুন—মরিনি আমরা ?"...

আবার সেই জনতার ঐক্যবদ্ধ সম্মতি—যেন এক মানুষ :

"ঠিক।"

উঁচু থেকে আরও উঁচু হয়ে উঠছে সামাজিক বিপ্লবের কোলাহল। এ এখন জনসাধারণের মধ্যে থেকেই উঠে আসছে। জনতার মধ্যে জন্ম নিয়েছে একটা কিছু করার আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং এই আকাঙ্ক্ষাই হবে তাদের সংগঠিত করার উত্তেজক ওষুধ—দূর করে দেবে তাদের রাজনৈতিক অজ্ঞতা। নেতাদের আর বিশ্বাস করা হয় না। সম্প্রতি 'সারকি মডার্ন'-এ মোটর গাড়ির এক ড্রাইভার ছোকরা দুটো রুশ শব্দ নিয়ে খুব চতুর ভাবে শ্লেষ করেছিল—ভোজদি (নেতা) এবং ভোজজি (শাসন)। অর্থাৎ 'নেতার' সঙ্গে সঙ্গে 'শাসন'ও চলেছে পিছু পিছু। ছোকরার কৌতুকে দু'শো মানুষের একটা ভীড় ফেটে পড়েছে হাসিতে আর বাহবায়।

প্রত্যেক দিন জীবন হয়ে উঠছে ক্রমশ অধিকতর ভাবে সংকল্পে সুস্থির, চরিত্র হয়ে উঠছে দৃঢ়তর—সর্বত্র একটা চাপা উত্তেজনা বাড়ছে—কেবলি বাড়ছে।

২৭শ পরিচ্ছেদ ।। যুদ্ধ ও ফুলমালঞ্চ

ফেব্রুয়ারী ।। ১৯১৭

দেয়ালের গায়ে কাদা ছিট্‌কে হু হু করে মোটর গাড়িগুলো ছুটে চলেছে রাস্তা দিয়ে—তাদের ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে পথচারীদের। সৈনিক আর নাবিকের গাদাগাদি ভীড়ে ভর্তি সব গাড়িগুলো—বেয়োনেটগুলো খাড়া হয়ে আছে ইস্পাতের কাঁটার মতো—যেন সব বিপুল-কায় শজারু ছুটে চলেছে উন্মত্তের মতো। ক্ষণে ক্ষণে ফেটে পড়ছে রাইফেলের আওয়াজ। বিপ্লব !... নতুন স্বাধীনতা লাভ করে উদ্‌ভ্রান্ত রুশ জাতি যেন ছুটছে এদিক ওদিক ; মুঠো করে ধরতে চাচ্ছে সে স্বাধীনতাকে—কিন্তু দেখছে, তা যেন কিছুটা পিছলে যাচ্ছে।

আলেকজাণ্ডার পার্কে এক মালী তার নিঃসঙ্গ কাজের মধ্যে একেবারে নিমগ্ন হয়ে আছে ; পঞ্চাশ বছরের আঁটোসাটো মানুষটি। থপ্‌ থপ্‌ করে নিঃশব্দে সে ফুলের কেয়ারী আর রাস্তা থেকে পুরাণো ঝরা পাতা আর

জঞ্জালের রাশি ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছে—সাফ করছে নতুন-পড়া তুষার। তার চার দিকের এত হৈ-হট্টগোল সম্পর্কে সে এতটুকুও কৌতূহল দেখায় নি; মোটরের বৈদ্যুতিক হর্নে পেঁচার মত বিকট চীৎকার, এত হৈ-হাল্লা, গান আর গুলির শব্দ—সে কানেও তোলেনি। এমন কি লাল নিশানগুলোও সে চোখ তুলে দেখেনি। আমি তাকে লক্ষ্য করে দেখছিলাম, চারদিকে মানুষজনের এত ছোটাছুটি, বেয়োনেটে ঝলসানো মোটর লরীগুলো একবারও সে চোখ তুলে দেখে কিনা। কিন্তু একভাবে ঝুঁকে আছে সে, শক্ত হয়ে সেঁটে আছে তার কাজে। সহজেই মনে হয় সে যেন অন্ধ।

মার্চ ॥ ১৯১৭

বড় রাস্তা, পার্কের ছোট ছোট রাস্তা দিয়ে লোকসভা ভবনের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে খাকী পোশাক পরা হাজার হাজার সৈনিক, কেউ কেউ দড়িতে বাঁধা শুয়োরের মতো পেছনে টেনে টেনে নিয়ে চলেছে মেসিন গান। অসংখ্য মেশিন গান বাহিনীর মধ্যে থেকে একটা বাহিনী এইমাত্র ওরানিয়েনবুম থেকে এসে পৌঁছল। ওরা বলে—ওই বাহিনীতে নাকি দশ হাজারেরও বেশী সৈনিক আছে। তারা জানে না তারা কি করবে। সেই সকাল এসে পৌঁছবার পর থেকে তারা শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আস্তানা খুঁজছে। পথচারীদের সঙ্গে কথা বলতে গেল তারা সরে পড়ে—কারণ এই মানুষগুলো যুদ্ধ-ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত এবং ভয়ংকর। ওদের কিছু লোককে দেখতে পেলাম—গোল একটা ফুলের গাছ লাগানো বেদী জুড়ে বসে গিয়েছে, তার ওপরে ছড়ানো ওদের রাইফেল এবং থলে।

সঙ্গে সঙ্গে ধীরে সুস্থে এসে হাজির হয়ে গেল মালী, হাতে ঝাড়ু। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সকলকে একবার দেখে নিল।

"এটাকে কি তোমাদের শিবির করবার জায়গা ঠাউরেছ—এঁ্যা! এটা ফুলের গাছ লাগানোর জায়গা হে—এখানে ফুল ফুটবে কদিন বাদে। ফুল কি, তোমরা জানো তো—না কি? তোমাদের চোখ নেই? এটা ছেলেমেয়েদের খেলার জায়গা। উঠে এস ওখান থেকে বলছি। বলি শুনতে পাচ্ছ?"

ভয়ংকর সশস্ত্র মানুষগুলো ও জায়গা ছেড়ে শান্তভাবে সরে গেল সুড়্সুড়্ করে।

৬ জুলাই ॥ ১৯১৭

সবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে আনা লোহার শিরস্ত্রাণ পরা সৈনিকেরা ঘিরে ফেলেছে পিটার ও পলের দুর্গ। ওরা রাস্তার ফুটপাথে এবং পার্কের রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছে অলস ভাবে, পেছনে টেনে নিয়ে চলেছে মেসিন গান, কাঁধে ঝুলছে রাইফেল। কেউ কখনো শান্তভাবে পথচারীদের বলে দিচ্ছে :

"চটপট সরে পড় ; গুলিগোলা এখুনি সুরু হতে পারে।"

শহরবাসীরা লড়াই দেখতে উৎসুক এবং নিঃশব্দে সৈনিকদের অনুসরণ করছে। শেয়ালের মতো গতিবিধি তাদের—গাছের আড়ালে আড়ালে, ঘাড় এঁকিয়ে বেঁকিয়ে, সামনের দিকে দেখার প্রবল চেষ্টা তাদের।

আলেকজাণ্ডার পার্কে পথের ধারে ধারে ফুল ফুটে উঠেছে। মালী তাই নিয়ে ব্যস্ত। বুকে ঝুলছে পরিষ্কার এ্যাপ্রন—হাতে কোদাল। সে যাচ্ছে আর বকছে যত সৈনিক ও ফালতু দর্শকদের—যেন তারা একপাল ভেড়া।

"বলি ওদিকে কোথায় চলেছ? তুমি মাড়িয়ে যাবে বলে কি ওই সব ঘাস লাগানো হয়েছে? বলি রাস্তায় কি হাঁটবার জায়গা ছিল না?"

সৈনিকের পোশাক-পরা দাড়িওয়ালা এক কৃষক, মাথায় শিরস্ত্রাণ, বগলে রাইফেল—মালীকে বললে :

"নিজের চরখায় তেল দাও বুড়ো—নইলে সিধে গুলি করব।"

"অ—তাই নাকি? একবার চেষ্টা কর। দিব্যি লোক তো তুমি হে।..."

"যুদ্ধ চলছে তুমি জান না? এখুনি লড়াই লেগে যেতে পারে।"

"অ—তাই নাকি? ভাল, তোমরা লড়াই কর—আমি আমার কাজ করি।" তারপর পকেট থেকে একটা গাছ-ছাঁটা কাঁচি বার করল। বিরক্তিতে গজ্‌রে উঠলো, "যেখানে যাওয়ার নিয়ম নেই সেইখানে সব মাড়িয়ে চলেছে।..."

"এ যে লড়াই।"

"তাতে আমার কি? লড়াই যারা পছন্দ করে তাদের কাছে ওটা ভাল এবং ও ব্যাপারে সাহায্য করার ঢের লোকও তোমাদের আছে। কিন্তু আমার কাজে আমি একা। তুমি বরং তোমার রাইফেলটা একটু পরিষ্কার করে নিও হে—সবটায় জং ধরে গেছে।..."

হঠাৎ একটা হুইশিল বেজে উঠল। ঠোঁটে একটা সিগারেট চেপে সৈনিকটি সেটা ধরাবার চেষ্টা করছিল—আপাতত দ্রুত সেটা পকেটে ভরে ছুট দিল গাছ পালার আড়ালে।

অত্যন্ত বিরক্তি ভরে তার পেছনে থুক্ করে খানিকটা থুতু ছিটিয়ে দিলে মালী এবং চেঁচিয়ে উঠল রাগে :

"ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটছ কেন শয়তান ? আর কি কোনো রাস্তা ছিল না ?"

হেমন্ত ।। ১৯২৭

কাঁধে মই—হাতে গাছ-ছাঁটা কাঁচি, মালী ধীরে সুস্থে চলেছিল বাগানের পথে। মাঝে মাঝে থম্‌কে দাঁড়াচ্ছিল—ছেঁটে দিচ্ছিল পথের পাশের শুকনো ডালপালাগুলো। সে রোগা হয়ে গেছে—মনে হচ্ছে যেন শুকিয়ে গেছে। বাতাসহীন দিনে মাস্তুল থেকে ঝুলে পড়া পালের মতো ঝুলে পড়েছে তার জামা কাপড়। শুকনো ডালপালা কাটতে কাটতে কাঁচিটা যেন রাগে কিচ্-মিচ্ করে উঠছে।

তাকে দেখতে দেখতে ভাবছিলাম—ভূমিকম্প হোক, বন্যা হোক—তার কাজে বাধা দিতে কেউ পারবে না। শেষ বিচারের দিন ঘোষণা করতে এসে প্রধান দেবদূতের ভেরী যদি যথেষ্ট ঔজ্জ্বল্যে ঝলোমল্ না করে ওঠে, তা হলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস—সেই সৈনিকটিকে যে ভাবে ও বকে দিয়েছিল তেমনি ক'রে দেবদূতকেও বকে দেবে :

"ভেরীটাকে আপনার একটু পরিষ্কার করে নেবেন—সবটা বড় নোংরা।..."

২৮শ পরিচ্ছেদ ।। আইনের প্রহসন

১৯১৭ সালের মার্চ মাস, সকালটা বড় ভেজা ভেজা। বেঁটে মতো একটি লোক, বছর চল্লিশ বয়স হবে, পোশাক একটু জীর্ণ—তবু তারি ওপরে দিব্যি ফিটফাট, গায়ে বোতাম আঁটা জ্যাকেট, আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। চেয়ারে বসে রুমালে মুখ মুছলেন এবং একটু হাঁফ নিয়ে যেন কিছুটা তিরস্কারের ভঙ্গীতে বললেন :

"অস্বীকার করবার উপায় নেই—আপনি বেশ উঁচুতেই থাকেন। এই পাঁচতলায় ওঠা একজন স্বাধীন মানুষের পক্ষে বেশ কষ্টকর।"

তাঁর হাত দুটো ছোট ছোট এবং কাল্‌চে, পাখীর পায়ের মতো। চশমা পরা চোখ দুটো কঠিন এবং কেমন একটা একগুঁয়েমী এবং সন্দেহ সেখানে জ্বল্‌জ্বল্ করছে। তাঁর রোগা রোগা হলদে মুখের ওপরে হলদে নাকটা খাড়া হয়ে আছে পাখীর ঠোঁটের মতো। জোরে একবার নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে

তিনি আমার বইয়ের সেল্‌ফ্‌ দেখতে লাগলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন :

"বোধ হয় ভুল হয়নি—আপনিই তো মিস্টার পেসেখনোফ—তাই না ?"

"না, আমার নাম পোসকফ।"

"মনে হচ্ছে দুটো নাম এক নয় ?"

"নিশ্চয় নয়।"

তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন এবং আমাকে একবার খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে মনে হয় কথাটা মেনে নিলেন।

"দেখতেও আপনারা এক রকম নন—অন্য জনের ছোট একটা দাড়ি আছে। আমি দেখছি ভুল করে ভুল জায়গায় এসে পড়েছি।" তারপর বিষণ্ণভাবে তাঁর মাথাটা নেড়ে বললেন, "সব কিছুই আজকাল এত গোলমেলে।..."

আমি জানালাম—পেসেখনোফকে সম্ভবত কামেনেসত্রোভস্কিতে এক্লিট সিনেমায় পাওয়া যেতে পারে—সেখানে পেত্রোগ্রাদস্কাইয়া স্টোরোনার প্রতিনিধি দপ্তর সংগঠিত হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, "তাঁর সঙ্গে আপনার কি দরকার, জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?"

অন্যমনস্ক ভাবে ছোটখাটো মানুষটি সজোরে নাকে একটা শব্দ করলেন। তারপর টেবিলের ওপর থেকে একটা বই তুলে নিয়ে তার ধারগুলো দেখতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত বললেন, "একজন স্বাধীন নাগরিকের কর্তব্য অনুসারে —দেয়ালে টানানোর জন্য আমি তাঁকে আইনের কয়েকটা ব্যবস্থা দিতে চাই।"

একটা অস্বাভাবিক কিছু অনুমান করে আমি তাঁর কাছে খোঁজ করলাম—কি ধরনের আইনের ব্যবস্থার কথা তিনি ভাবছেন।

"ওটা আমার কাছেই আছে", তিনি বললেন; এবং বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে চার ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে আমার হাতে তুলে দিলেন। সযত্নে বেশ বড় বড় অক্ষরে নীচের কথাগুলো তাতে লেখা আছে :

অবশ্য পালনীয় বিধি :

সাধারণ দাঙ্গাহাঙ্গামার অবস্থায় স্বাধীনতাকে নিরংকুশ ভাবে রক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত বর্তমান বিধি ; অতএব :

জরুরী :

স্তবক ১॥ সংঘটিত ঘটনাসমূহ এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে যাহারা সন্দেহজনক ভাবে আলোচনা করে এবং যাহারা পুরাতন রীতি অনুযায়ী, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতে চায়—সেই সব ব্যক্তিদের বন্দী কর।—

স্তবক ২ ॥ বিশেষতঃ আন্না পোতাসোফা ওরফে ভারনাস্‌খা, নোভাইস দেরেভনাব প্রমোদ ভবনেব ম্যানেজার জ্যাকব ফেদোরেফের স্ত্রীকে।—

স্তবক ৩ ॥ এবং জানানো যায় যে, সম্মানীয় নাগরিক পেসেখনোফ সাধারণ মানুষের ন্যায় পোশাক পরিচ্ছদ করেন এবং সেই হেতু তিনি শাসকসুলভ কোনো চিহ্ন ধারণ করেন না। তিনি উপরোক্ত মহিলাকে কতকগুলি খালি পিপা বেদখল করা হইতে আইনগতভাবে বিরত করেন—কারণ পিপাগুলি মহিলাব নহে; সেহেতু উল্লিখিত ভাবনাসখা শ্রদ্ধেয় নাগরিক মহাশয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে।

স্তবক ৪ ॥ বিজ্ঞপ্তি—(ক্রমশ), উপবোক্তভাবে মহিলাটি নাগবিক মহাশয়েব দাড়ি এবং গোটা চেহারাটাই অপছন্দ করেন। উপবস্তু উক্ত মহিলা বলিযা থাকেন যে, স্বাধীনতা নিষ্পাপ কন্যার ন্যায—তাহাব মূল্য অনেক এবং তাহাকে ভোগ কবিবাব অধিকার সকলে পাইতে পারে না।

স্তবক ৫ ॥ অতএব হুকুম হয় যে—কোনো আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া তাহাকে প্রথমেই বন্দী কবা হোক।
'ক্ষমতা বলে আইন অধিকর্তা—

জ্যাকব ফেদোরেফ।'

আইন-বিধিটি পড়ার পর আমি 'আইন অধিকর্তার' কাছে ওর একটা প্রতিলিপি করে নেবার অনুমতি চাইলাম। চোখ দুটি অর্ধমুদ্রিত করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "আপনার উদ্দেশ্য?"

"শুধু একটা স্মারকচিহ্ন—এই আর কি।"

তিনি সযত্নে কাগজটা ভাঁজ করতে করতে বললেন, "দেয়ালে শিগ্‌গিরই ওটা যখন টানিয়ে দেওয়া হবে তখন আপনি ওখান থেকে ছিঁড়ে নিতে পারবেন।"

কিন্তু আমি একটা প্রতিলিপি দেওয়ার জন্য তাঁকে খুব ধরে পড়লাম। শেষ পর্যন্ত, কিছুক্ষণ দ্বিধা দেখানোর পর তিনি সহজভাবে কাগজটা আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি যখন ওটা লিখে নিচ্ছিলাম তখন তিনি আমার টেবিলের বইগুলো নেড়ে চেড়ে শিরোনামগুলো দেখছিলেন আর নাক সিটকাচ্ছিলেন। তারপর তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, মাথা ঝাঁকালেন এবং বিড় বিড় করে বললেন:

"এসব বইয়ের অনেকগুলোকেই এখন নিষিদ্ধ করে দিতে হবে। আর একটা আইন দরকার হবে। তাতে সন্দেহ নেই।"

আমি প্রতিলিপিটা লিখে শেষ করে বললাম, "তাহলে আপনার মতে, তাদের সকলকে ধরা উচিত যে—"

"যে নিন্দুকের মতো কথা বলে।"

নিন্দাবাদের রুশ প্রতিশব্দটা,তিনি ভুল উচ্চারণ করছিলেন—আমি শুধরে দিতে চাইলে তিনি কঠিন প্রতিবাদ করে উঠলেন এবং মূল প্রতিশব্দটার ধাতুগত অর্থ ধরে বুঝিয়ে দিলেন : "একটা শব্দকে আপনারা বিকৃত করে তার মূল অর্থটাকে আর লুকিয়ে রাখতে পারবেন না।"

তাঁর সঙ্গে কথা বলা সহজ নয় দেখে আমি তাঁর পেশা কি জিজ্ঞেস করলাম।

"কেন—এই !"—

এবং তাঁর আইনবিধির কাগজটা সামনে তুলে ধরলেন।

"আপনার এই আইন রচনার কাজ সুরু করার আগে আপনি কি করতেন ?"

তিনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। জ্যাকেটের বোতামগুলো লাগালেন এবং বললেন, "আমি শুধু চিন্তা করতাম।"

তারপর সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি সন্দেহভরা গলায় বিড় বিড় করে উঠলেন : "তা হলে মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, মিস্টার পেসেখনোফ এবং লেখক মিস্টার গোর্কি একই লোক নন ?"

"আজ্ঞে না—তা নন।"

"সেইটে বোঝা শক্ত," তিনি বললেন এবং দুই চোখ অর্ধমুদিত করে যেন মানেটা বোঝবার চেষ্টা করলেন। "এ যেন দু'জন লোক ছিল—এবং স্পষ্টতঃ তিনজন। কিন্তু আপনি যদি তিনজন হিসেবে গোণেন—তা হলে আপনি পাবেন দু'জন। এটা কি কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিষিদ্ধ গণিতের আইনের নিয়ম-ভঙ্গ করা নয় ?"

"এখনো পর্যন্ত কোনো কর্তৃপক্ষ নেই।..."

"হ্যাঁ...্যা। ওই কোনো এক রকম। আবার, পাসপোর্টের দিক থেকেও, একজনের দুটো পাসপোর্ট থাকতে পারে না—পারে ? আইন তো তাই —নাকি ?"

অসম্মতির ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন, কিসে যেন একটা হোঁচট খেলেন এবং ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন :

"ক্ষমা করবেন—ভুল বুঝে আমি এসে পড়েছিলাম। চিন্তার ভারে আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল—তা না হলে আমার মাথা দিব্যি পরিষ্কার—এই রকমই সবাই বলে। কিন্তু আপনি জানেন, এখনকার মতো সময়ে ..."

দরজার বাইরে জুতো ঠিক করতে করতে তাঁকে বিড়বিড় করে বলতে

শুনলাম : "স্বয়ং বিসমার্কই এর মাথা-মুণ্ডু কিছু ঠিক করতে পারবে না।... ওরা দু'জন না তিনজন?..."

২৯শ পরিচ্ছেদ ॥ স্বপ্নবিলাসী ব্রীক

১৮৮০ সালের দিকে নিঝনি-নোভগরোদের পথে পথে এক ছোকরাকে ঘুরতে দেখতাম। দুটি চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, বুকে ঝোলানো একটা বাক্স। সপ্রতিভ ভাবে গলা নামিয়ে ফেরি করে বেড়াত: "বুকে পরবার ছোট ক্রশ, পরলোকগতদের নাম লেখবার খাতা, চুলের পিন চাই।"

প্রায়ই তাকে দেখে দেখে আমার ধারনা হয়েছিল—তার মধ্যে কেমন একটা বেআদপি ভাব আছে যেন: পথচারীদের মধ্যে হঠাৎ কারুকে সে বেছে নিত এবং ক্রমাগত তাকে অনুসরণ করে চলতো, পাশে চলতে চলতে একভাবে বলে যেত: "বুকে পরার জন্যে ক্রশ, পরলোকগতদের নাম লেখবার খাতা।..."

পথচারীরা রাগে হয়তো তাকে এড়াবার চেষ্টা করতো, গালা-গালি করতো, কিন্তু চকার ছোকরা হাঁ-করে তাকিয়ে থাকতো তাদের মুখের দিকে এবং যেন কৃপার হাসি হেসে আরও কিছু ক্রশ দিত এগিয়ে। আমার বোধ হতো—ছোকরা একটা গোলমাল পাকাতে চায়, মার-ধর খেয়ে যাবে কবে কার হাতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন জানি না, আমার মনে হয়েছিল—ওর মন ব্যবসায়ে মোটেই নেই, ওর আসল উদ্দেশ্য হয়তো আরও কোনো চিত্তাকর্ষক ব্যাপারে জড়িত এবং হয়তো তা আরও ভয়ংকর।

কিন্তু আমি খুব হতাশ হলাম যখন দেখলাম ছোকরা এক ছোট্ট মতো স্টল খুলে বসেছে! রোজদেসত্রেনস্কাইয়ার রাস্তায়—যেখানে লোকজনের যাতায়াত খুব বেশী, তারই ওপর গীর্জার দেয়ালে একটু জায়গা নিয়ে তার স্টল—সেখানে সে ক্যালেণ্ডার এবং চিরায়ত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বিক্রী করতে সুরু করল। অল্প দিনের মধ্যেই স্টল হলো দস্তুরমতো দোকান, সামনে লেখা সাইন বোর্ড:

ভি. আই. ব্রীক: পুস্তক বিক্রেতা

এর কিছুদিন পরেই নিঝনিতে গোলাপী মলাটের একটা বই প্রকাশিত হলো—নাম: সন্ন্যাসী ফিয়োদোর কুস্‌মিচের জীবনী। মলাটের ওপরে খুব লম্বা, টাক মাথা এবং মস্ত দাড়িওয়ালা এক জনের জমকালো এক ছবি। নীচে প্রকাশকের নাম ছাপা: ভি. আই. ব্রীক: প্রকাশক।

বইটা যে ভাবে লেখা হয়েছিল পরে জানতে পারলাম। 'দি রুক' নামে এক সাধারণ হোটেলে এক তীর্থযাত্রী সাইবেরিয়ার এই রহস্যময় সন্ন্যাসী সম্পর্কে গল্প করে। সঙ্গে সঙ্গে তেরেনতিয়েফ নামে এক ভবঘুরেকে গিয়ে ধরলো ব্রীফ—লোকটি আগে কোন এক স্কুলের শিক্ষক ছিল। তাকে দিয়ে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর জীবনী লেখানো হলো—পারিশ্রমিক এক স্বর্ণমুদ্রা মাত্র! মনে হয়-তেরেনতিয়েফ আগে এই ফিয়োদর কুস্‌মিচ সম্পর্কে কিছু পড়েছিল অথবা শুনেছিল এবং বেশ আকর্ষণীয় একটা জীবনী সে রচনা করে ফেললে। ভলগার দু'ধারে এবং ওকার সর্বত্র এই বইটি হাজারে হাজারে ছড়িয়ে পড়ল এবং ব্রীফ এ থেকে লাভ বেশ ভালই করেছিল।

যখন আমার প্রথম গল্পের বই বাজারে বেরুল—একদিন ব্রীফ এল দেখা করতে। শিষ্ট সাজসজ্জা—তবে ঘন নীল কোট প্যাণ্ট চোখে পড়ার মতো, ওয়েস্ট কোটের পকেটে ভারী রূপোর ঘড়ি—রোল্ড গোল্ডের চেন ঝুলছে বুকে, পায়ে মসমসে বুট জুতো। জুতোর কালির গন্ধ এবং সাবানের সুবাস ভুরভুর করছে তার গা থেকে। গাল ভরা-হাসি তার মুখে। অনুপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত একটা মানুষের মতো তার চাপা কণ্ঠস্বর।

"আমার হৃদয়ের স্বপ্নগুলি নিবেদন করবার অনুমতি দিন। আমাদের এই প্রাচীন শহরটির নাম গৌরবময় করে তোলার জন্যে এবং তার ইতিহাস রচনায় সব রকমের সাহায্য করার বাসনায় আমাদের সব বিশ্রুত স্বদেশবাসীর জীবনী ছোট ছোট পকেট সংস্করণে ছাপার পরিকল্পনা করেছি। যেমন ধরুন—কোসমা মিনিন, গোষ্ঠীপতি নিকোন, প্রধান পাদ্রী আওয়াকুম, কুলিবিন, মিলি, বালাজুরেফ, মিস্টার ববোরিকিন, দবরোলিনবোফও অবশ্য থাকবেন এবং মেলনিকফ-পেচেরস্কিও। নিঝনি নোভগরোদের আরও সব প্রতিভাধর মানুষরাও থাকবেন। এই কাজে আপনার সাহিত্যিক সাহায্য পাবো কি?"

আগেই বলেছি—এমন চাপা গলায় সে কথা বলে, যেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সব গোপন কথা ফাঁস করছে। ভাষা তার অনর্গল এবং শব্দগুলি সব বাছা বাছা। কিন্তু সব সময়ে সে যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল—পা দুটো অস্থির চঞ্চল, হাতে ঘুরছে একটা ছিট্‌ছিট্ রুমাল। হঠাৎ সে পকেটে হাত ঢোকাল—ঝনঝন শব্দ করে উঠলো পকেটের ভেতরে—যেন ঘোড়ার লাগামে লাগানো পেতলে পেতলে ঠোকাঠুকির শব্দ হলো। তারপর মুসলমানদের নমাজের মতো হাতের চেটো দুটো জড়ো করে মুখে ঘষলো। সর্বাঙ্গ যেন তার চর্মরোগে

ভরা এবং চুলকানি আর চেপে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে—এই 'রকম একটা মনোভাবের সৃষ্টি হয় তার অস্থিরতা দেখে।

এক ধরনের মজার আমুদে চরিত্রের মানুষ সে—তাছাড়া সব রকমের দুঃখ-কষ্টের জন্য প্রস্তুত থাকার মতো রুশীয় চরিত্রের সতর্কতাও তার মধ্যে লক্ষণীয়। চেহারাটা কিছুটা লোমশ ধরনের। গালের হাড় দুটো উঁচু মতো—কণ্ঠার হাড় থেকে চিবুক পর্যন্ত এক গোছা ফিকে রংয়ের দাড়িতে শোভিত মুখমণ্ডল, গমের কেশরের মতো খোঁচা খোঁচা গোঁফ এবং ভুরু। ওকে দেখে মনে মনে বললাম—"লোকে যাদের বলে 'সজারুর মাথা'—তুমি তাই।" তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক ধরনের—গোল গোল, সবুজাভ, চোখের পাতায় চুল নেই। উদ্দীপনায় তা ঝলসে ওঠে ছোট স্ফুলিঙ্গের মতো। হঠাৎ মনে হয়—তা জ্বলে উঠবে এবং কালো দুটো গর্ত মাত্র থেকে যাবে তার জায়গায়।

আমি তাকে যখন 'সাহিত্যিক সাহায্য' দিতে অস্বীকার করলাম—সে নাকে জোরে একটা শব্দ করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে। তারপর সুরু করলো তার অদম্য উৎসাহের কথা।

"তা হলে আর একটা প্রস্তাব আপনার কাছে করি—এটা অবশ্য আরও সহজ।" সে উঠে দাঁড়ালো এবং কবিতা আবৃত্তি করার মতো দু'বার দম নিয়ে বলে চলল: "আপনার আকর্ষণীয় অস্বাভাবিক জীবন এবং তার নতুনতর প্রারম্ভ সম্পর্কে একটা আর্থিক প্রস্তাব আছে। পঞ্চাশ রুবল পারিশ্রমিকে আপনি যদি আপনার আত্মজীবনী একটা লেখেন, কথা দিচ্ছি, আমি তার প্রকাশক হব।"

আত্মজীবনী লিখতেও আমি অস্বীকার করলাম কিন্তু আমার 'জীবনী' বলে একটা আজে-বাজে বই যদি সে প্রকাশ ক'রে বসে—তাতে ব্রীফকে ঠেকাবে কে! সে ক্ষেত্রে তার নামে আমি মামলা করবো বলে তাকে আগাম ভয় দেখিয়ে রাখলাম।

"আপনার একজন স্বদেশবাসী হিসেবে আমাকে বিশ্বাস করুন", ব্রীফ নিজেকে সমর্থন করবার চেষ্টা করল, "টাকা-পয়সার জন্য নয়—সে আর কী! আপনার শিষ্টতার ওপর আঘাত করবো—এ মতলব আমার নেই, বরং একে বলতে পারেন আমার দেশপ্রীতির একটা উচ্ছ্বাস।"

১৯০৫ সালে কে যেন আমায় বলেছিল যে ভি. আই. ব্রীফ নাকি 'ইউনিয়ান অফ দি রাশিয়ান পিপল'-এর* নিঝনি নোভগরোদ শাখার সভাপতি

* অতি দক্ষিণপন্থী সংস্থা

নির্বাচিত হয়েছে এবং সোৎসাহে বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং স্বৈর-শাসনকে সংহত করে তুলছে। তারপর, মনে হয় ১৯১০ সাল নাগাদ—ব্রীফ আমাকে ক্যাপ্রিতে এক চিঠি পাঠায়। তাতে সম্রাট ২য় নিকোলাসের দয়া ও উদারতার খুব প্রশস্তি ছিল। আমার অপরাধের জন্য অনুতাপ ও রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনার জন্য সে চিঠিতে আমাকে অনুরোধ করে-ছিল। চিঠিটা লেখা হয়েছিল ভারী মজার ভঙ্গীতে এবং তাই আমার বিরক্তির উদ্রেক করেনি। এমন কি, আমি ব্রীফকে জবাবও দিয়েছিলাম এই বলে যে, নিজেকে আমি 'দেশান্তরী' বলে মনে করি না এবং যেদিনই আমার ইচ্ছে হবে সেদিনই আমি কারুর অনুমতি না নিয়েই রাশিয়ায় ফিরে যেতে পারি। এই সঙ্গে আমি সাধারণভাবে স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে আমার মতামত লিখেছিলাম।* ১৯১৪ সালে রাশিয়ায় ফিরে আমি শুনলাম—ব্রীফ নিঝনি ছেড়ে চলে গেছে।

১৯১৭ সালের মে মাসে, অত্যন্ত কর্মব্যস্ত একদিনে একটা টেলিফোন পেলাম। অত্যন্ত বিচলিত একটা কণ্ঠ আমায় বলল :

"ব্রীফ কথা বলছি—ভ্যাসিলি আইভনোভিচ ব্রীফ, আমাকে চিনতে পারেন ? নিঝ্‌নি নোভগরোদের সেই স্বপ্নপাগল লোকটা ?"

ঘণ্টাখানেক পরে, আমার সামনের চেয়ারে বসে বসে সে ছটফট করছিল—কথার বৃষ্টি ঝরিয়ে দিচ্ছিল যেন চারদিকে, চেহারাটা তেমনি লোমশ—সেই বিশ বছর আগে দেখতে যেমন মজার মানুষটি ছিল। শুধু খাড়া খাড়া চুলগুলো তার একটু যেন নরম হয়েছে—কিন্তু সজীবতা গেছে হারিয়ে। অবাধ্য দাড়ি এবং অবিন্যস্ত গোঁফটা কামিয়ে ফেলেছে ; শুধু তার ভুরু দুটো মনে করিয়ে দেয় বাচ্চা সজারুর কথা। কিন্তু তার সবুজে চোখ এখনও সতেজ—জীবন্ত, আগুনে যেন ঝল্‌কে ওঠে—এখনও তাতে দেখা যায় সেই স্ফুলিঙ্গ। একটা মোটা ধোঁয়াটে রঙের পোশাক তার পরনে, নেকটাইতে ঝকমক করছে একটা হীরা, তার বাঁ হাতের এক আঙুলে আংটিতে বসানো চকচকে বড় একটা রুবি। তাছাড়া এ সেই অস্থির, সদা উত্তেজিত মানুষটি—যাকে দেখে একদিন আমার মনে হয়েছিল, যেন নানা চর্মরোগে ভোগা একটা লোক।

দু'হাত নেড়ে অবাধে নানা ভঙ্গী করে শেষ পর্যন্ত হঠাৎ হাত দুটো প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিলে, তারপর সেখান থেকে তার ওয়েস্ট কোটের পকেটে।

---

* আমার এই চিঠিটা ইংরেজী পত্রিকা 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'-এ কে যেন 'এক রাজতন্ত্রীকে লেখা চিঠি' এই শিরোনামে প্রকাশ করেছিল।—গোর্কি

পকেট থেকে বার করলে কতকগুলো খনিজ পাথর—অনেক খনি ঘুরে এগুলো সংগ্রহ করা। "সোনা মিশে আছে এই পাথরে!" নমুনাগুলো টেবিলের ওপরে রাখতে রাখতে সে ব্যাখ্যা করে বলে চললো; "এই হলো টাংস্টেন! এই হলো সর্বোৎকৃষ্ট লিথোগ্রাফিক পাথর! এই হলো এক অজানা পাথর—এটা যে কি, কেউ জানে না! এ সব আমার—এ আমারই ধন—হ্যাঁ…, আমার দাবীর খাঁশগাড়ী করে দিয়েছি! এখন আমি এসেছি আপনার কাছে, আপনি আমার দেশবাসী। আপনি আমায় একটু সাহায্য করুন যাতে এগুলো আমি পেয়ে যাই। আমাদের নতুন ভাগ্যবিধাতা কর্তাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক তো ভালই।"

এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করায় সে কিছুমাত্র নিরাশ হলো না; শুধু একটু বিস্মিত হলো—এবং বলল, "এই নিয়ে চারবার আপনি আমার অনুরোধ রাখলেন না।…"

"কিন্তু এ সব ব্যাপারের আমি কিছুই জানি না!"

সে তার কাঁধ ঝাঁকি দিলে—বললে, "সোনা সম্পর্কে বোঝার কি আছে? ওর একমাত্র কাজ—ওকে খনি থেকে তুলে আনা, তারপর ওর সঙ্গে জড়িয়ে যাবে আমাদের জীবন।" চোখ আধবোজা করে, মাথা নাড়তে নাড়তে যে যেন গানের সুরের মত বলে গেল:

"আপনি যদি জানতেন কি অপরিমেয় ধনরত্ন সাইবেরিয়ায় পোঁতা আছে! এ একটা দেশ নয়, যেন গোরুর দুধের বাঁট—যা কখনো শুকোয় না। দিব্যি করে বলতে পারি। এ শুধু ডাকছে আর দুয়ে নিতে বলছে। কিন্তু কোনো লোক নেই কাজ করবার। আমরা জানি না তা কেমন করে করতে হয়। একমাত্র দক্ষ দুইনেওয়ালা কিছু আছে বটে—লেনার ইংরেজরা।…"

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কতদিন সে সাইবেরিয়ায় আছে?

"তিন বছর—ঠিক তিন বছর। এই অসম্ভব যুদ্ধ যেমনি সুরু হলো—আমি চলে গেলাম ওখানে। কি এক অসাধারণ জীবন যে আমি কাটিয়েছি তা আপনাকে বলবার জন্য আমি ছটফট করছি—কারণ আমি নিশ্চয় জানি, নিঝ্‌নির মানুষ হিসেবে আপনি আপনার এক দেশবাসীর সাফল্যে আনন্দিত হবেন। একটা রুশ-মানুষের বিস্ময়কর গল্প আপনি ছাড়া আর কে-ই বা জানবে? আপনি আমার দেশবাসী ছাড়াও, বলতে গেলে—রুশীয় আত্মার অভিযাত্রার লিপিকার—আপনার ভাগ্যে আমাদের জন্য সাহিত্যের স্তম্ভ রচনার

দায়িত্ব পড়েছে—সেই একটা প্রাচীন শহরের মানুষ আমরা—যার কাছে সারা রাশিয়া ঋণী। সেই তিনশ' বছর আগে একটা অকাল-বিলুপ্তির হাত থেকে নিঝ্‌নির মানুষ তাকে বাঁচিয়েছিল।…"

কথার মোড় আর একদিকে চলে যাচ্ছিল। সে বলল :

"আমি শুনেছি—আপনাকে একটা সরকারী পদ দেওয়া হয়েছে। তাই কি ?—না ? কি দুঃখের কথা। মন্ত্রীদের মধ্যে আমাদের একজন কেউ থাকলে আমরা নিঝ্‌নির মানুষ খুশি হতাম।"

সে আমাকে খুঁটিয়ে দেখলে—আবার বলল :

"এমন কি লোকশিক্ষা বিভাগেও যদি একটা হত।"

* * *

পরের দিন সন্ধ্যাবেলাও ব্রীফ আবার আমার ঘরে হাজির। তেমনি উত্তেজিত, ঘর্মাক্ত। খাড়া হয়ে উঠেছে ফিকে হলুদ-খয়েরি চুল—এমন ভঙ্গভঙ্গী করছে যেন ময়দার তাল ঠাসছে। আমাকে বলল :

"জাপ-যুদ্ধের কষ্টের বছরটাতেই আমার জীবনে সুরু হলো সংকট। তার আগে পর্যন্ত আমি বেঁচে ছিলাম শুধু আমাদের সুন্দর শহরটাকে ভালবেসে। রাজনীতির কথা আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি—আমার স্বপ্ন ছিল অন্য রকমের : সে স্বপ্ন আমি জেগে জেগেও দেখতাম। খুব পরিশ্রম করবো, বড়লোক হব, নিঝ্‌নিতে একটা বাড়ি তৈরী করবো—খুব সুন্দর বাড়ি—এত সুন্দর যে শুধু নিঝ্‌নির মানুষ নয়—বিদেশীরাও দেখে যেন অবাক হয়। এমন কি লণ্ডন, প্যারিস থেকেও লোক এসে যেন ব্রীফের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে! সমস্ত কাগজে তার ছবি ছাপা হবে : লোকে লিখবে—'রাশিয়ার একটা প্রাদেশিক শহরে এমন বাড়ি আছে যা আমাদের দেশে কোথাও দেখিনি।' "

নীচের রাস্তা থেকে ভেসে আসছে গভীর গর্জন ; মোটরের হর্ন বেজে উঠছে জোরে, গাল-ভরা দাড়ি নিয়ে খাকি পোশাক পরা সৈনিকের দল চলেছে কুচকাওয়াজ করে অশ্রান্ত প্রবাহে, কেমন একটা কুটিল ফিসফিসানি আচ্ছন্ন করে রেখেছে সারা দেশটাকে ; শোনা যায় চাপা অস্পষ্ট আর্তনাদ ও কান্না—রুশ সাম্রাজ্য টলোমল্‌ করে উঠেছে, ভেঙে পড়ছে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে।

"আমি বোকা নই, ক্ষমতা আমার কতটা তা আমি জানি। কিন্তু এই আমি, ভ্যাসিউৎকা ব্রীফ. বিশাল এই রুশ দেশে একটা মাছির মতো। তবু সেদিন অপমানের একটা লজ্জা কী তীব্র ভাবেই যে এসে লেগেছিল।

আমাদের বিশাল এই সাম্রাজ্য—কত প্রতিভার জননী—তাকে একটা বিদেশী জাত হারিয়ে দেবে! আমার এই অসুখী ছোট্ট হৃদয়ে সেই অপমান যদি এত অসহ্য হয় তা হলে আমার চেয়ে বড় এবং বুদ্ধিমান রুশ মানুষদের কাছে তা কতটা তীব্র হয়ে বাজতে পারে?

"সেইদিন থেকে বুদ্ধিজীবী এবং সমস্ত শিক্ষিত মানুষের ওপর আমি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলাম—কারণ, দেখলাম রাশিয়ার ভাগ্য সম্পর্কে তাদের মনে এবং হৃদয়ে একটা অদ্ভুত দুর্বোধ্য উদাসীনতা। অসন্তোষই সমস্ত রাজনীতির উৎস: বাস্তবিক পক্ষে রাজনীতি হলো অসন্তোষ। তাই আমি অবাক হয়ে ভাবতাম—আমাদের লোকেরা, আমাদের সেনাবাহিনী যখন হারছে তখন আপনি বা আপনার মত লোকেরা কেন তার জন্য দুঃখিত হচ্ছেন না, ভাবিত হচ্ছেন না!

"আমি বুঝতে পারি—জনসাধারণের জন্য কেন কেউ দুঃখ বোধ করে না: এমন কি তারা নিজেদের জন্যও দুঃখ বোধ করতে জানে না। আমি তাদের সম্বন্ধে কিছু জানি। এমন কথা বলছি বলে আমাকে ক্ষমা করুন, কিন্তু আমার মতে—জনসাধারণ বলে কিছু নেই—ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই—যতক্ষণ না তাদের একটা জায়গায় স্তূপের মতো জড়ো করেন, হুংকার ছাড়েন, ভয় দেখান এবং আদেশ করেন। জনসাধারণের থাকবে শুধু এক স্বার্থ, এক ভাব—এ অসম্ভব, এমন জিনিসের অস্তিত্বই নেই। তারা বালির মত বা কাদার মত। একটা সাম্রাজ্যের ভিত্তি হিসেবে তাদের তৈরী করে নিতে হলে ময়দার তালের মতো তাদের ভালো করে ঠেসে নেওয়া দরকার এবং গন্‌গনে আগুনে সেঁকে নেওয়া দরকার।

"আপনি যদি জনসাধারণের জন্য না দুঃখিত হন—ঠিক আছে, আমি আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু আপনার নিজের স্বপ্নই যে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে—তাতে আপনি দুঃখিত নন? মানুষ শুধু বেঁচে থাকে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষায়—আর তার বাঁচার কোনো অবলম্বন নেই। জীবনের সব চেয়ে সুন্দর জিনিসটির জন্যে আমাদের সকলের মধ্যেই একটা সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা আছে—এবং সেইটেই মানুষের মধ্যে শক্তি হিসেবে কাজ করে। একটা অপূর্ব রাষ্ট্রের স্বপ্ন—যা পৃথিবীর অন্য সকলের থেকে সুন্দর, এই রকম একটা স্বপ্ন সমস্ত জাতির মধ্যেই আছে—শুধু এক ইহুদী ছাড়া অবিশ্যি। কারণ একদিন তাদের যে স্বদেশ ছিল—আজ আর তা নেই, তাই তারা শুধু তাদের স্বার্থের কথাই চিন্তা করে। সাধারণভাবে জীবনকে সুসজ্জিত করে তোলার যে স্বপ্ন—তা ইহুদীদের পক্ষে অসম্ভব, তেমনি জিপ্‌সি

বা ওই রকম ভবঘুরে যে কোনো জাতির পক্ষেই তা অসম্ভব। আমি জানি—আপনি এ কথার সঙ্গে একমত হবেন না, কারণ আপনি ইহুদী-ভক্ত—এই ব্যাপারটা আমার কাছে অবিশ্যি খুবই দুর্বোধ্য লাগে। আমাকে ক্ষমা করুন, কিন্তু এ যেন আত্মার ভেতরে একটা উলটো মোচড়—এ এক ধরনের রোগের মত।

"কিন্তু সে অন্য কথা। এখন ১৯০৫ সালের কথা বলি। সারা পৃথিবী জুড়ে একটা ওলট-পালট অবস্থা, সকলেই বিপ্লব করতে ব্যস্ত—এমন কি, যে প্যান্টে একটা বোতাম পর্যন্ত লাগাতে জানে না সে-ও। প্রত্যেকেই মন-খুশি বরের মতো রাস্তায় ছুটোছুটি করছে কিন্তু অনেকের আত্মার ভেতরে তখন আসন্ন অন্ত্যেষ্টির সূত্রপাত হয়ে গেছে!

"এর পরে পরেই জন্মলাভ করলো আমার স্বপ্ন: হঠাৎ মনে এল। তিনশ' বছর আগে একবার এই নিঝ্‌নি নোভগরোদ শহরটাই রাশিয়াকে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল—সেই মহান ব্যাপারটিকে আবার একবার আহ্বান করা এবং স্মরণ করার সময় কী এই নয়? বিপ্লবটা কি? আমার একজন কেরাণী ছিল—নাম লিওনিদ্‌কা, বেশ বুদ্ধিমান ছোকরা, বিপ্লবীদের দলে নাম লিখিয়েছিল, সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় কমিউনিজম ঘোষণা করে বেড়ায়। আমি তাকে বললাম, 'আচ্ছা লিওনিদ্‌কা, তুমি বিপ্লব একটা করবে ঠিক—কিন্তু তারপর কি করবে?' সে বললে, 'আমি? কেন, যখন এ-সব চুকেবুকে যাবে এবং জীবন নতুন ধারায় বইতে সুরু করবে—আমি ফিরে যাব আমার ব্যাঙের ছাতির ব্যবসায়। আরও বেশী করে তার চাষ করবো এবং বেশী করে ভিনিগারে জারাবো। আমার বিশেষ একটা কায়দা জানা আছে—যাতে ব্যাঙের ছাতির চারা স্বাভাবিকের চেয়ে শতকরা চল্লিশ ভাগ বাড়ানো যায়।' 'ওহে গদভ,' আমি তাকে বললাম, 'তোমার ওই ব্যাঙের ছাতির জন্য এত বড় একটা রাষ্ট্রের গোটা শৃঙ্খলাটা তুমি নষ্ট করে দেবে?' এবং সেই রকম ব্যাপারটাই আজ সর্বত্র ঘটছে—বিপ্লবের লক্ষ্য সম্পর্কে যাকে খুশি আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন—শেষ পর্যন্ত দেখবেন, ওই ব্যাঙের ছাতির মতো সবটা একটা অতি তুচ্ছ।

"আমরা—'ব্ল্যাক-হান্‌ড্রেড্‌রা'* একটা যোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলাম—আমাকে ক্ষমা করুন, আমরা সেদিনের সেই মত্ততা ও নির্বুদ্ধিতার যোগ্য জবাব দিয়েছিলাম, কিন্তু কিছু লোক প্রচুর মারধরও খেয়েছিল। আমি স্বীকার

* জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে অতি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থা

করি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল—যেমন আপনার বন্ধু ওষুধের কারবারী হাইনেৎজের ক্ষেত্রে। কিন্তু কি করা যায়। প্রচণ্ড চুলোচুলির সময় চুল আর গোণে কে? প্রবাদে যেমন বলে, 'ঈশ্বর-অনুগৃহীত লোক কমলে শয়তানের আনন্দ।' বিপ্লবকে ব্যর্থ করতে পারায় আমরা অবশ্যই খুব খুশি হয়েছিলাম এবং আমাদের জয়ের ফলশ্রুতিটাকে সংহত করতে উদ্যোগী হলাম। ঘটনাবহুল বছরগুলো তখন এগিয়ে আসছে: ১৯১২ সাল, ১৯১৩ সাল—রাশিয়ার বড় বড় ঘটনার শতাব্দী পূর্তির-বছর। ... আমি তার জন্য তৈরী হলাম।

"আপনাকে মন খুলেই বলছি—সোজাসুজি বলছি বলে মনে কিছু করবেন না, আমার চিঠির জবাবে আপনার সেই সাহসভরা চিঠি পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছিলাম। নিজেকে বলেছিলাম—আমাদের নিবৃনির লোকেরাই এমনি লিখতে পারে! কিন্তু আপনার মতামতের সঙ্গে একমত ছিলাম না—আমি একমত হতে পারিনি—আজও পারি না। কারণ গোটা রাজ্যের ভিত্ তখন টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, স্বয়ং জার তাঁর প্রজাদের দ্বারা বন্দী। ফরাসীদের সঙ্গে অশুভ মৈত্রী করে আমরা কোন্ পাগলামীর মধ্যে এসে পড়লাম! এখানেও আমরা রাজতন্ত্রকে বরবাদ করে দিলাম!

"তাই দেখতেই পাচ্ছেন—আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না। আমি জনসাধারণকে জানি। সিংহাসনে কে বসলো—তার জন্যে কানা কড়িও তাদের চিন্তা নেই, সে তাতার হতে পারে অথবা খিরগিজ হতে পারে—এই পর্যন্ত তারা ভাবে। শুধু একজন—অথবা একটা কিছু থাকা চাই, যার সঙ্গে তার স্বপ্নকে সে জুড়ে দিতে পারে। জনসাধারণ বাঁচে তার স্বপ্নে—তাদের সেই জোরালো কল্পনা দরকার যাতে তারা জীবনের কঠোরতাকে সহ্য করতে পারবে, জীবনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারবে; কারণ এইটাকেই তারা একমাত্র পার্থিব জীবন বলে জানে।"

এই সময়ে ত্রীফকে আমি বাধা দিয়ে বললাম যে, এখনও আমরা কিন্তু বিপ্লবের দিনগুলির মধ্যেই বেঁচে আছি। শুনে সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, উত্তেজনায় তার মুখ কালো হয়ে গেল এবং চাপা গলায় সে বলে উঠল:

"বিপ্লব! স্বাধীনতা! আপনি কি বিবেচনা করে কথাগুলো বলছেন? আগামী কাল যে-কেউ একজন লাফ দিয়ে এসে চীৎকার করে বলবে—'সব চুপ! কেমন করে বাঁচতে হয় আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি!' সবাই তাকে অনুসরণ

করবে যেখানে সে নিয়ে যাবে—কিন্তু তারপর ফিরে আসবে আবার সেই দাস্য-বৃত্তির মধ্যে যেখান থেকে সে যাত্রা সুরু করেছিল। আমাদের সম্মানীয় দেশবাসী আপনি, বিশ্বাস করুন, জনসাধারণের সত্যিকার স্বাধীনতা হলো তার কল্পনার স্বাধীনতা। জীবনটা তাদের কাছে আশীর্বাদের মতো নয়, হবেও না কোনোদিন কিন্তু চিরকাল তাদের এই আশ্বাস, এই আশা থাকবে যে—আশীর্বাদের মতো তা হয়তো কোনোদিন হয়ে উঠতেও পারে। জনসাধারণের একজন নায়ক দরকার, একজন পুণ্যাত্মা দরকার—দরকার জেনারেল স্কোবেলোফ, ফিয়োদোর কুসমিচ, আইভ্যান দি টেরিব্‌ল্—তাদের কাছে এঁরা সবাই সমান। ব্যবধান যত বেশী হয়, অস্পষ্টতা যত বেশী হয়, নায়ক যত দুরধিগম্য হয়, কল্পনার ততো স্বাধীনতা, বাঁচা ততো সহজতর। 'একদা কোনো এক সময়ে ছিল'—ধরনের, রূপকথার গল্পের মতো। ঈশ্বরের কল্পনা স্বর্গে নয়—মর্তে, এই নিরানন্দ পৃথিবীতেই চাই। অপরিমেয় জ্ঞান এবং আসুরিক ক্ষমতাসম্পন্ন যে কেউ ; যে কেউ হোক—সে সর্বশক্তিমান হবে, যে কেবলমাত্র ইচ্ছে করবে আর সবাই হবে সুখী। এই ধরনের একজনের স্বপ্নই মানুষ দেখে।

"ভাই, জনসাধারণের কাছে রোমানফদের জার্মান বলে প্রমাণ করার চেষ্টা বৃথা। তাদের কাছে সব সমান ; তারা মরদোভিয়ানও হতে পারে—তাদের কোনো পরোয়া নেই। আমি বলছি—আমি জনসাধারণকে জানি! তাদের গণতন্ত্রের প্রয়োজন নেই, ইংরেজদের ধরনের পার্লামেন্টও তাদের দরকার নেই, কোনো রকমের শৃঙ্খলিত ব্যবস্থার তারা ধার ধারে না—তারা চায় রহস্যময়তা। তাদের দরকার সংহত একটা বিরাট কেন্দ্রীভূত শক্তি—একটা বিরাট কিছুর অস্তিত্ব, এমন কি, সে অস্তিত্ব যদি একেবারে শূন্যও হয় : সে শূন্যকে ভরে তুলবে তারা কল্পনা দিয়ে। হঁ্যা—হঁ্যা!...

"কিন্তু আপনার চিঠির কথাটা শেষ করি। আমি চিঠির পাঁচটা কপি করলাম এবং আমার দেশবাসীদের কয়েকজনকে তা পাঠিয়ে দিলাম। আসল চিঠিটা নিয়ে গেলাম স্বয়ং গভর্নর খভোসটফের কাছে। তাঁকে গিয়ে বললাম, 'দেখুন গোর্কি কি লিখেছে!' কেন তা করেছিলাম? কারণ আমি ভেবে-ছিলাম, আপনার কথা নিঝনির মানুষের জানা প্রয়োজন—যদিও সে-সব কথা ক্ষতিকারক। আমার দেশপ্রেম সম্পর্কে সম্ভবত কেউ প্রশ্ন তুলতে পারত না এবং যদিও আপনি দেশ-ছাড়া—তবু, আপনি যাই হোন, আমাদেরি একজন তো। গভর্নরের কাছে চিঠিটা নিয়ে গিয়েছিলাম এই জন্যে যে, ও চিঠির যে কপিগুলো

বিলিয়েছি তার জন্যে আমার কোনো দোষ ধরতে না পারেন। আর কিছু নয়, আমি শুধু সেই সময়টায় আপনাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলাম। কারণ, ১৮১২ এবং ১৮১৩ সালে আমাদের বিস্ময়কর দেশে যে বিরাট বিরাট সব ঘটনা ঘটে গেছে তাকে স্মরণ করার জন্য বেশ সাড়ম্বরে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। তার মধ্যে আপনাকে চেয়েছিলাম।"

আীফ তার হাতের চেটো দুটো দুই কানের ওপর চেপে ধরে মাথাটা নাড়তে লাগল এদিক ওদিক। কঠিন দৃষ্টিতে মিট মিট করে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলে উঠল:

"উল্টো দিকে পিছিয়ে গোণায় আমার মাথা কেমন গুলিয়ে যায়। '১৩ সাল থেকে '১২ সাল, তারপর '১৪ সাল; এই সংখ্যার ওলট পালট সব ভুল! যদি রোমানফের নির্বাচন ১৬১১ সালে ঘটে থাকে এবং 'বারো জাতির' ওপর জয়লাভ হয়ে থাকে '১২ সালে, তাহলে, হয়তো ১৯১৪ সাল আর ঘটতো না।"

কান থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে সে শক্ত করে মাথাটা চেপে ধরল, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার অনর্গলভাবে বলে চললো:

"আমরা, যারা গণতন্ত্রের শাসনে বিশ্বাস করি—তৈরী হচ্ছিলাম বিপ্লব দমন এবং এক কালের সেই দূরব্যাপী ইওরোপ জয়ের স্মরণোৎসব উদযাপনের জন্য। আয়োজন হচ্ছিল প্রচণ্ড আড়ম্বরে, সব কিছু ম্লান করে দেওয়া জাঁকজমকের ছটায়—বলতে গেলে, এর একটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতও ছিল সকলের কাছে। বোঝাতে চেয়েছিলাম—'একবার তাকিয়ে দেখ আমাদের: প্যারিস অধিকার সমেত সমগ্র ইয়োরোপের বিরুদ্ধে আমাদের মহান "স্মরণোৎসব উদযাপন" রূপ এই সংগ্রাম।—কেন? কারণ তিন শ' বছর আগে রোমানফদের মঙ্গলময় হাত রাশিয়াকে গ্রহণ করেছিল!' মর্মটা বুঝলেন তো? এই ছোট্ট পরিকল্পনাটুকু এসেছিল আমার মাথায় এবং গর্ভিনী স্ত্রীলোকের মতই এই বোঝার ভার অনুভব করতাম আমি।

"অনুষ্ঠানটা এমন ভাবে করতে চাইছিলাম যাতে উৎসবের ঔজ্জ্বল্যে লোকের মন থেকে জাপানী যুদ্ধের বিষাদময় ব্যর্থতার স্মৃতিটা মুছে যায়, তাছাড়া মাজেপ্পা, সেই পাদ্রী গাপোসকাদের লজ্জাকর নষ্টামি—প্রকৃত পক্ষে অতীতের যত খারাপ ঘটনা সব যাতে চাপা দিতে পারি। আমাদের ইতিহাসের সূর্যোকরোজ্জ্বল দিনগুলির ভাস্বর মহিমা তুলে ধরাই ছিল আমার উদ্দেশ্য।"

সে হঠাৎ চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল—কেউ যেন তাকে ছুঁচ ফুটিয়ে দিয়েছে। তারপর চেয়ারের হাতলে হাত রেখে সে ঝুঁকে দাঁড়াল।

একটা সবুজ আলো ঝিকিয়ে উঠল তার চোখে, তার লাল ঘর্মাক্ত মুখটা কালো হয়ে গেল এবং গালের হাড় দুটো যেন ফুলে উঠে মুখটাকে দেখাল ভার ভার, নাক উঠল ফুলে। কণ্ঠার নলীটা এমন ভাবে নড়তে লাগল, মনে হলো সে যেন কিছু গিলছে। কিছুক্ষণ যেন সে তার উত্তেজনাকে চেপে রাখতে পারল না; তারপর গালের ওপর থেকে জলের ফোঁটাগুলো অতি দ্রুত হাত দিয়ে মুছে নিয়ে, বাঁকা ঠোঁটে একটু হাসল। এবং আবার উত্তেজিত কণ্ঠে বলে চললো সে চাপা গলায়—প্রায় ফিস ফিস করে:

"এবং হঠাৎ একদিন আমাকে বলা হলো: 'ভ্যাসিলি আইভানোভিচ, ফরাসীদের সঙ্গে আমাদের মৈত্রী-বন্ধনের জন্য ওই "স্মরণোৎসব"-পালন নিয়ে খুব হৈ-হল্লা করা চলবে না—কারণ বন্ধুরাষ্ট্রকে তা আঘাত দিতে পারে।' হ্যাঁ—আমাকে ঠিক এই কথাগুলি বলা হয়েছিল। আমি প্রতিবাদ করে বলেছিলাম: 'আমার বুদ্ধিদীপ্ত মুখটা যদি আমার সঙ্গী পছন্দ না করেন তাহলে আমি কি মূর্খের মুখোস পরে থাকবো? আমার মনে হয়—সে মুখোস আমরা দীর্ঘদিন ধরেই পরে আছি। অনেকে তাই দেখে হাসে এবং আঙুল দেখিয়ে বলে—সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে যদি স্বেচ্ছাতন্ত্র নাচে তা হলে মাথা ঘুরে যাবে আগে স্বেচ্ছাতন্ত্রের—কথাটা খাঁটি সত্যি। স্বেচ্ছাতন্ত্রের ইতিমধ্যেই মাথা ঘুরছে: ইতিমধ্যেই আমাদের পার্লামেন্ট প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে এবং মিস্টার মিলিউকফ প্রেসিডেন্ট হওয়ার দিকে নজর দিয়েছেন!'

"আপনি অবশ্যই জানেন, আমাদের 'ইউনিয়ান অফ রাশিয়ান পিপল' এই ফরাসী-রুশ মৈত্রীকে একটা দুর্ভাগ্যজনক ভুল বলে বিবেচনা করত। এ যেন শকুনি আর ভালুকের বন্ধুত্ব—একজন আকাশে, অন্যজন জঙ্গলে এবং কেউ কারুর কাজে লাগে না। আমরা ঠিকই ভেবেছিলাম যে জার্মানির সঙ্গে বন্ধুত্বে আমাদের অনেক বেশী লাভ—একটা পাথর-খোদা, লোহা-পেটা বন্ধুত্ব, যা হবে পরিপূর্ণ দুর্জয়।

"অল্প কথায়, এতদিনের গড়ে তোলা 'স্মরণোৎসব"-সংগ্রামের উৎসব শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল না। এখানে ওখানে পার্কে—ৎসাইকভস্কির ১৮১২ সালের 'ঐকতান' বাজানো হলো মাত্র এবং তারপরে লোকজন ঘুমোতে গেল। জার রোমানফদের তৃতীয় শতবার্ষিকীর জুবিলী উৎসবের জন্য আমি আরও বেশী উৎসাহে আয়োজন করতে লেগে গেলাম! আর্ট এ্যাকেডেমীর ছাত্রদের আমি জড়ো করে ফেললাম এবং তাদের বললাম, 'শোন ছেলেরা, ১৬১৩ সালে নিঝ্‌নি-নোভগরোদে জীবন

ধারা যেমন ছিল—যতটা পার আঁক—এঁকে মিনিনের স্মৃতি-স্তম্ভটি সাজিয়ে ফেল ; সমস্ত হৃদয় দিয়ে আঁকতে হবে !' সত্যি কথা বলতে কি, তারা খুব ভালই করেছিল এবং বেশ কয়েকটা ভাল ছবিই এঁকেছিল। তা থেকে পরে আমি কিছু ছবিওয়ালা পোস্টকার্ড ছেপেছিলাম — এবং তার হাজার হাজার কপিও বিক্রি হয়ে গেছে। পরে বেশ বড় একটা বজরা ভাড়া করলাম—তাতে এক ছবির প্রদর্শনী সাজিয়ে সারা ভলগা বেয়ে দেখিয়ে বেড়ালাম ; এই ভাবেই জনসাধারণকে বলতে চেয়েছিলুম যে—দেখ, এক সময়ে কি তোমাদের সামর্থ্য ছিল ! হাজার হাজার মানুষ আমাদের পেছনে পেছনে ঘুরেছে। কিন্তু তারা ও সব দেখেছে আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলেছে—আহা জনসাধারণ, কি হালের জনসাধারণ ! ···লোহার ছাঁচে তৈরী সন্তান। ···"

হাত দুটো দিয়ে মাথার পেছন দিকটা চেপে ধরে ব্রীফ কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখ দুটো বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ।

"সে ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি। আমি যেন হাওয়ায় উড়ছিলাম। সব কিছু চলছে কুচকাওয়াজের মত শৃঙ্খলায়, সর্বত্র চলছে ভোজ, ভলগার ধারে ধারে যত শহর—সর্বত্র বেজে উঠছে গীর্জার ঘণ্টা, সঙ্গীতের সুর—যেন আমাদের গোটা কদাকার জীবনটা হঠাৎ হয়ে উঠেছে রাজকীয় এক অপেরা থিয়েটার ! কি মহিমায় ভরা ছিল দিনগুলি··· !"

টেবিল থেকে একটা চামচ তুলে নিয়ে হঠাৎ যেন গভীর মনোযোগে সেটা দেখতে লাগল, গড়াতে লাগল আঙুলের ওপর, তারপর সেটা টেবিলের ওপরে রেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে এবং জিভ দিয়ে ঠোঁটটা চাটল।

"সে সময়টা আমি যেন নেশায় ভরপুর হয়ে ছিলাম এবং সেই সময়েই পেলাম বজ্রতুল্য আঘাত। একদিন জার নিকোলাসের সামনে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য হলো। তিনি খুব প্রসন্ন হলেন আমার ওপরে এবং এই রুবি বসানো আংটিটা তিনিই আমাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু—সেই যে বিখ্যাত সার্কাস-পরিচালক আকিম নিকিতিন, সে-ও গর্বভরে একদিন বললে যে, জারের একটা আংটি সে-ও পেয়েছে। ···

"জারের সঙ্গে দেখা করার পর আমার মনে কি যেন ঘটে গেল। কল্পনা করুন আপনি, এতদিন কোনো অনধিগম্য মানুষের ওপর আপনার বিশ্বাস ছিল, ভাবতেন—সেই মানুষটির মধ্যে সমাহিত সমস্ত শ্রেষ্ঠ মানবীয় গুণাবলী, রাশিয়ার সমস্ত শক্তি, সমস্ত জ্ঞান এবং পবিত্রতা, একটা আধ্যাত্মিক মেরুদণ্ডের

মতো সব কিছুকে ধরে রেখেছে—গোটা জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড তিনি। এবং হঠাৎ, যেন দায়িত্বহীন ভাগ্যের নির্দেশে সেই মানুষটির সামনাসামনি গিয়ে দাঁড়ালেন একদিন,—বেদনায় এবং ভয়ে আপনি দেখলেন, আপনি যা ভেবেছিলেন তা তিনি নন! যার জন্যে আপনি বেঁচেছিলেন—তা তিনি নন, আপনার আদর্শ তিনি নন! তাঁর চারপাশের ঝকমকানি এবং ঠাম্‌ঠমক্‌ সবই আছে—কিন্তু তা সব ঝুটা! এইভাবে আমার সামনে দেখলাম—আমার কল্পনার জারকে নয়, আমার স্বপ্নের একচ্ছত্রাধিপতিকে নয়, এমন কি একটা মস্ত মানুষও নয়—দেখলাম সাধারণ দুটো ঠ্যাংয়ের ওপর খাড়া একটা মানুষকে। তা ছাড়াও মনে হলো, এই যে ভ্যাসিলি ত্রীফ—যে তার যৌবনকাল থেকে নিজেই নিজের শিক্ষক, তার চেয়ে উনি খুব বুদ্ধিমান নন। অতি সাধারণ একটা মুখ। তবে হ্যাঁ, ভারী মধুর স্বভাবের, ভারী অনুগ্রহশীল মানুষটি—কিন্তু ও-ই মাত্র।”

ত্রীফ উঠে দাঁড়াল—যেন সর্বাঙ্গ বিক্ষুব্ধ, এমন ভাবে হাত তুললে যেন কবিতা আবৃত্তি করবে। তারপর বলতে লাগল একটা চাপা, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে:

‘রা-শি-য়ার জার হবে অবশ্যই ভয়ং-ক-র এবং ভীতিপ্রদ। ভয়ংকর শুধু স্বভাবেই নয়—দেখতেও। অথবা হবে রূপকথার সুন্দর রাজকুমার অথবা অসম্ভব একটা দানব। হ্যাঁ—রা-শি-য়ার জারকে হতে হবে ভয়ং-ক-র এবং ভীতিপ্রদ।...”

গলায় হাতটা চেপে সে এগিয়ে গেল জানালার দিকে এবং থুতু ফেললে রাস্তায়—যেন নিরবচ্ছিন্ন গোলমাল আর হৈ-হাল্লার মাথার ওপরে। তারপর ফিরে দাঁড়াল এবং সংযত গলায় বললে:

“ভ্যাসনেৎজোফের আঁকা জার ‘আইভ্যান দি টেরিব্‌ল্‌’-এর ছবিটা তো আপনি জানেন? তা হলেই আপনি বুঝুন। ওই হলো রুশ জনসাধারণের জার! মনে আছে আপনার—একটা চোখ কেমন একটু ট্যারচা রকম? ওই হলো আপনার জারের চোখ। সব কিছু দেখতে পাওয়া চোখ। ওই রকম একটি জার দেখতে পাচ্ছে সব কিছু এবং বিশ্বাস করছে না কোনো কিছুই। একা দাঁড়িয়ে আছেন তিনি! প্রত্যেকটি আঙুলে তাঁর ব্যক্তিত্ব। তাঁর সামনে গিয়ে যে দাঁড়াবে সে-ই বুঝতে পারবে—সব কিছু যথাস্থানে আছে কিনা, সব কিছু সুশৃঙ্খল কিনা। জার-মহলের জার তিনি, সাম্রাজ্যের প্রভু।...”

ত্রীফ বসে পড়ল আবার, হাত দুটো এলিয়ে দিলে টেবিলের ওপরে, এবং শান্ত ভাবে বলতে লাগল:

"পরের কাহিনী ক্লান্তিকর। একদিন আমার ঘোড়াটা ফেলে দিলে আমাকে। আর সকলের মতই আমি বেঁচে ছিলাম, অন্য সকলের মতই আমি টুপি পরেছি—তারপর হঠাৎ একদিন জেগে উঠে দেখলাম, আমার মাথাটাই বুঝি আর নেই! এল ১৯১৪ সাল এবং সুরু হলো অভিশপ্ত যুদ্ধ। মনে মনে ঠিক করলাম—রাশিয়ার সঙ্গে এবার সব সম্পর্ক শেষ করে দেবো—এখন বাকি রইলো শুধু একটা গভীর গর্ত খোঁজা এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেইখানে লুকিয়ে থাকা।

"আমি সাইবেরিয়ায় চলে যাওয়া ঠিক করলাম—যেখানকার সেই পুণ্যাত্মা সন্ন্যাসী ফিয়োদোর কুস্‌মিচকে ধরেই একদিন আমার সোভাগ্যের উন্মেষ হয়েছিল। সে সময়ে আমাদের অনেকেই ভেবেছিলেন—জার্মানরা আমাদের বাণ্ডিল বেঁধে উরাল পার করে দেবে। আমি তো আমার নিজের লোকদের জানি! তারা সহ্য করতে পারে কিন্তু প্রতিরোধ করতে পারে না। তাছাড়া, আমি সাইবেরিয়ার দিকে অন্য কারণেও ঝুঁকেছিলাম: কাজানের কলেজে পড়া একটি সাইবেরিয়ান তরুণীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল—সেখানে আমার একটা বইয়ের দোকানও আছে, ঘর-বাড়িও আছে। এতো জানা কথা যে, প্রেম বয়সের হিসেব করে না।... আমরা পরস্পরকে ভালবাসতাম, যদিও আমি পঞ্চাশ পার হয়ে গেছি এবং সে এখনো পুরো বিশও হয়নি। আমি আমার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের বললাম: 'সারা জীবন আমি তোমাদের জন্য খেটেছি—এবার ক্ষান্তি দাও! এখন আমি শুধু নিজেকে নিয়েই বাঁচতে চাই। পঞ্চাশ হাজার রুবল মাত্র আমি নিয়ে যাচ্ছি। নিঝ্‌নি-নোভগরোদে বাকি যা কিছু রইল সব তোমাদের, তোমরা নিয়ো। বিদায়।' এবং আমি চলে গেলাম।

"সাইবেরিয়ায় গিয়ে একটি লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো যে মাটির নীচের ধনসম্পদ সম্পর্কে সব কিছু জানে। তাই আমি কাজ সুরু করে দিলাম খনিতে। একজনকে একটা কিছু গড়ে তুলতে হয় তো। মাটির ওপর ভবঘুরের মতো ঘোরা আমার স্বভাব নয়। আমার স্বপ্ন আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমাকে ক্ষমা করুন—রাশিয়াকে আমি মূর্খতায় আচ্ছন্ন দেখেছি এবং গেঁজে ওঠা ধারনার মধ্যে ডুবে যেতে দেখেছি। আমার নিজের মানুষকে আমি আর চিনতে পারি না। চিরকাল তারা সূর্যমুখীর বিচি চিবিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়িয়ে কাটিয়ে দেবে—এ আমি বিশ্বাস করি না ... শিগ্‌গিরই ওরা মাটিতে থুবড়ে পড়বে আবার।..."

কেমন দ্বিধা ভরে কথা বলছিল সে এবং স্পষ্টই মনে হচ্ছিল—অন্য কিছু সে ভাবছে। তার ছোট ছোট সবজে চোখ দুটো মিট্‌মিট্‌ করছে এবং জ্বলে উঠছে যেন। আবার চোখের তারায় লক্ষ্য করলাম তার সেই স্ফুলিঙ্গ। মাছের মতো সে একটা হাঁ করলো এবং তার কালো শুকনো ঠোঁটের ওপরে দ্রুত জিভটা বুলিয়ে নিলে। তারপর সহসা, যেন কোনো কথা বলতে গিয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সে হাত ছুঁড়ে দিলে শূন্যে, কথা বলা বন্ধ করল, উঠে দাঁড়াল, হাত দিয়ে চেপে ধরল চেয়ারের পেছন দিকটা। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, একটা অত্যন্ত উত্তেজক মরিয়া চিন্তা যেন তার মনে ঝলক্ দিয়ে উঠেছে। চোখ দুটো সে আধ বোজা করলো; ভুরুর মোটা মোটা লোমগুলো তার সেই পরিচিত ভঙ্গীতে খাড়া হয়ে উঠলো এবং কাঁপতে লাগল। একটু শুকনো কাশি কেশে আবার সে বলতে লাগল প্রায় ফিস্ ফিস্ করে :

"তার স্বপ্ন—তার আদর্শ নিয়েই বাঁচে মানুষ—এই আমি বলি। তার এমন একটা প্রবল কল্পনা থাকা চাই—যাতে সমস্ত তিক্ততা, সমস্ত প্রতিবাদ ঝেড়ে ফেলে জীবনকে সে আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করতে পারে। যেন সহজ ভাবে সব জিনিসকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে পারে। আদর্শহীন একটা মানুষ—এবং একটা জাতি জন্মান্ধেরই মতো। তাই বলছিলাম। ..."

আবার সে কাশলো এবং বুকটা ঘষে নিলে। তার চোখ ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল :

"মানব-আত্মার এই আকাঙ্ক্ষাকে কেমন করে পেতে হয় এ যদি কেউ জানে, একটা সুন্দর জিনিস—যা পাওয়া সম্ভব, তাকে কেউ যদি কল্পনায় জাগিয়ে দিতে পারে, তা হলে মানুষ পায়ে হেঁটে সমুদ্র পারেও তাকে অনুসরণ করবে। এবং সে সমস্ত কিছুকে ক্ষমা করতে পারবে, সমস্ত ভ্রান্তি এবং পাপকে ভুলে যাবে। তাই বলছিলাম ..."

হঠাৎ, আমার হাতটা সে তার দুই হাতে তুলে নিয়ে, প্রচণ্ড ভাবে চেপে ধরল। বললে :

"আপনিও ... আপনিও সেই স্বপ্নপাগল মানুষ! দেখুন—কি মহান কর্তব্য আপনার সামনে! আপনার প্রতিভা এক ঘন্টার মধ্যে সব কিছু ঠিক করে দিতে পারে। ..."

বোধ হলো—সে যেন প্রলাপ বকছে, কারণ সর্বাঙ্গ তার কাঁপছিল। ভাবতে সুরু করলাম, বুঝি সে পাগল হয়ে গেল। তাই আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হলাম

না যখন সে আমার হাত চেপে ধরে কানে কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলতে লাগল : "জানতে চান সেটা কেমন ভাবে হবে ? ব্যাপারটা খুব সোজা। জনসাধারণের মধ্যে এই রকম একটা কিম্বদন্তী চলে আসছে যে অজ্ঞাত সন্ন্যাসী ফিয়োদোর কুস্‌মিচ হচ্ছেন সেই সৌভাগ্যবান জার আলেকজাণ্ডার। গ্রীগোরি রাসপুটিন হলেন রুশ জারের সন্তান—জন্মেছেন সাধারণ এক কৃষক মায়ের গর্ভে এবং ৎসারেভিচ আলেক্সি হলেন রাসপুটিনের ছেলে—অর্থাৎ জার আলেকজাণ্ডারের নাতি আর ৎসারেভিচের মধ্যে আছে সাধারণের রক্ত ! দেখছেন ? ক্ষমা ! অতীতের সমস্ত পাপ, সমস্ত ভ্রান্তি মুছে যাচ্ছে এক খাঁটি রুশকে দিয়ে—খাঁটি সাধারণের রক্তে যার জন্ম। কৃষক-কুলে জন্ম একজন জার—সম্রাট !

"কি জানি—আমার হয়তো সবটাই ভুল, সবটাই হয়তো অন্য রকম হতে পারে, কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করুন, এ ব্যাপারে সত্যের কোনো প্রয়োজন নেই। যা প্রয়োজন তা স্বপ্ন ; নগ্ন সত্যের ওপর আপনি সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারেন না—এমন জিনিস হতেই পারে না। স্বপ্নের পুনরুত্থানের সেই মহান কর্তব্যে আপনি যদি আপনার প্রতিভাকে কাজে লাগাতে পারেন, রাষ্ট্রের সত্যকার একটা রুশীয় স্বপ্ন ..."

এমন ভাবে সে হাত দুটো তুলে ধরল—যেন আকাশে উঠছে এবং একটা খ্যাপা হাসি—অথবা ছেলেমানুষি হাসি হেসে, নিজের কথায় নিজেই প্রায় দমবন্ধ হয়ে গাঢ় গলায় বলে উঠল :

"এবং ভেবে দেখুন—আমার কাছে তার মূল্য কতখানি। ব্রীক ভ্যাসিউৎকা, ভ্যাসিলি আইভনোভিচ আমি—জীবন সুরু করেছিলাম রহস্যময় সেই সন্ন্যাসী ফিয়োদরের শক্তিতে—এবং ফিয়োদর হলেন মিখাইল রোমানফের বাবা ! আমার জীবনের শেষ হবে আকাশে তাঁর মহিমা ছড়িয়ে দিয়ে। কি রকম স্বপ্ন ! এ্যাঁ ?"

নীচে—রাস্তায় তখন রাশিয়ার জনতা ফেটে পড়ছে বজ্রের আওয়াজে, ভেঙে ফেলছে—নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে সাম্রাজ্যের লৌহ-কঠিন ঠাট—গড়ে উঠেছিল যা যুগের পর যুগ ধরে। ...

৩০শ পরিচ্ছেদ ॥ বিপ্লবের টুকরো ছবি

১৯১৯ সাল। বসন্তকালে গরমের প্রথম দিকেই পেত্রোগ্রাদের রাস্তায় রাস্তায় কোথা থেকে যেন হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল কিছু যাদুকরের মত

মানুষ। এতদিন পর্যন্ত কোথায় এবং কেমন করে এরা বেঁচে ছিল ? নিঃসন্দেহে কোনো বস্তিতে, অথবা কোনো পুরাতন, নিভৃত, জরাজীর্ণ ঘরে—জীবন-প্রবাহ থেকে যা ছিল লুকানো, পৃথিবীর কাছ থেকে অপমানিত এবং বর্জিত। যতবারই আমি তাদের দেখি ততোবারই একটা কথা আমার মনে বড় হয়ে ওঠে : ওরা যেন কি ভুলে গেছে এবং চেষ্টা করছে আবার মনে করবার, নিঃশব্দে গুড়ি মেরে তারি সন্ধান করে ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরময়।

গায়ে তাদের জীর্ণ শতছিন্ন নোংরা পোশাক। স্পষ্ট মনে হয় অত্যন্ত ক্ষুধার্ত কিন্তু ওদের ভিখারী বলে মনে হয় না এবং ভিক্ষাও চায় না। সাধারণ পথচারীদের সন্দেহে ও কৌতূহলে দেখতে দেখতে অত্যন্ত নিঃশব্দে এবং অত্যন্ত সতর্ক ভাবে চলাফেরা করে ওরা। দোকানের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে —যে সব জিনিস সাজিয়ে রাখা হয়েছে। চোখে এমন একটা দৃষ্টি—যেন আবিষ্কার করবার অথবা মনে করবার চেষ্টা করছে—ও সব মানুষের কোন্ কাজে লাগে। মোটর গাড়ি ওদের ভয় পাইয়ে দেয়, যেমন ওরা একদিন বিশ বছর আগে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল দেশের নর-নারীকে।

* * *

লম্বা মতো এক বৃদ্ধ, মুখটা কালো, চোখ দুটো গর্তে ঢোকা, বাঁকা নাক এবং সবজে দাড়ি, একটা দুমড়ানো পাশ-ফুটো টুপি ভদ্রভাবে মাথার ওপর তুলে ধরে এবং অপসৃয়মান একটা মোটর গাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করে :

"বিদ্যুৎ ? ... আহা ! ... ধন্য ... ধন্য।"

বুক ফুলিয়ে হাঁটে সে, মাথা সোজা খাড়া, কারুকে রাস্তা ছেড়ে দেওয়ার জন্য একপাও সরে দাঁড়ায় না এবং সামনে লোকজন দেখলে তার আধ-বোজা চোখে কেমন একটা উপেক্ষা চোখে পড়ে। পায়ে তার জুতো নেই—খালি পায়ে যখন সে ফুটপাথের পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটে তখন পায়ের আঙুলগুলো যেন খামচে ধরে—যেন পাথরের শক্তি পরখ করছে। এক অলস ফোকড় ছোকরা চট্ করে তাকে জিজ্ঞেস করে বসলো :

"আপনি কে দাদু ?"

"একটা মানুষ, যতোটা মনে হয়।"

"রুশ ?"

"আজন্ম।"

"সেনাবাহিনীতে ছিলেন ?"

"বোধ হয়।"

তারপর ছোকরাটিকে খুঁটিয়ে একটু দেখে নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো :

"বিপ্লব করছো ?"

"ইতিমধ্যেই করা হয়ে গেছে!"

"অ। ..."

বুড়ো মানুটি ঘুরে দাঁড়াল এবং একটা পুরোনো বইয়ের দোকানের জানালায় সাজানো বইগুলো দেখতে লাগল—বাঁ হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা তার দাড়ি। সেই ফোকড়-মতো ছোকরাটি তখনও ফুট কাটছে, কি যেন জিজ্ঞেস করলো আবার। কিন্তু বৃদ্ধ আর তার দিকে না তাকিয়ে শুধু মৃদু শান্ত কণ্ঠে বলল :

"সরে পড়।"

* * *

সেমিওনেভস্কি স্ট্রীটের গীর্জার ফটকে গা-ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বছর চল্লিশ বয়সের এক মহিলা। তার হলদে মুখটা ফুলে উঠেছে—তার চোখ দুটো, মুখটা আধ-খোলা, যেন নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য হাঁ করেছে। মস্ত একজোড়া জুতোর মধ্যে তার পা দুটো ঢোকানো, জুতোর ওপরে লেগে রয়েছে পুরু কাদার শুকনো আস্তর। পরনে তার পুরুষের একটা হালকা ড্রেসিং-গাউন, হাত দুটো মুড়ে রেখেছে বুকের কাছে এবং মাথায় তার একটা দোমড়ানো খড়ের টুপি—তাতে একটি মাত্র চেরিফুল গোঁজা—এক সময়ে সেখানে ছিল এক স্তবক চেরিফুল, আজ ঠেকেছে একটায় এসে : এখন আছে কিছু ডাঁটা ও বোঁটা, ঝিকমিক করছে কাচের মতো।

ভারী সুন্দর বাঁকানো মোটা ভুরু দুটি কুঁচকে সে এক মনে দেখছিল—ঠেলাঠেলি করে মানুষ-জন ট্রামে উঠছে, পা-দানি থেকে লাফিয়ে পড়ছে এবং নেমে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। মহিলার ঠোঁট দুটি কেঁপে কেঁপে উঠছে—যেন লোক গুণছে। অথবা সে হয়তো কারুর অপেক্ষা করছে এবং দেখা হলে কি বলবে তাই মনে মনে তালিম দিচ্ছে। তার ফোলা ফোলা লাল চোখের পাতার আড়ালে জ্বলছে একটা নির্দয়, কঠিন এবং মর্মভেদী দৃষ্টি। সিগারেট-বেচা রাস্তার ছোকরাগুলোকে সে বিরক্ত হয়ে সরিয়ে দিচ্ছে, কয়েকবার কনুইয়ের গুঁতো বা পাছার ধাক্কায় ঠেলেও দিলে।

কে একজন তাকে নীচু গলায় জিজ্ঞেস করলে : "বোধ হয় তুমি কিছু সাহায্য চাও ?"

লোকটিকে সে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে যেন যাচাই করে নিলে—তারপর তেমনি মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল :

"এ রকম তুমি ভাবছ কেন ?"

"আমাকে ক্ষমা করো।..."

বেশ পরিচ্ছন্ন ছোটখাটো এক বৃদ্ধা, মাথায় লেস দেওয়া টুপি, তার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যাসট্রি বিক্রি করছিল। অদ্ভুত মহিলাটি তাকে জিজ্ঞাসা করল : "আপনি কি সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা ?"

"আমি দোকানীর ঘরের মেয়ে।"

"অ।... আচ্ছা এই শহরে কত লোক আছে ?"

"আমি ঠিক জানি না। তা অনেক হবে।"

"কি ভয়ানক—এত লোক !..."

"আপনি এ শহরে কি নতুন এসেছেন ?"

"আমি ? না। আমি এখান থেকেই আসছি।..."

সে একটু দেহটাকে আন্দোলিত করল এবং বৃদ্ধার দিকে সসম্ভ্রমে মাথাটা একটু হেলিয়ে সেই ভারী জুতো-পরা নোংরা পা দুটো ঘষটাতে ঘষটাতে চলতে সুরু করল সার্কাসের দিকে।...

সার্কাসের পেছনে বাগানের একটা বেঞ্চিতে এসে বসেছে সে এখন ; তার পাশে বিশালকায় গুরুভার-দেহ এক বৃদ্ধা লাঠিতে ভর দিয়ে গম্ভীর ভাবে নিশ্বাস নিচ্ছে ; মুখটা তার পাথরে-কুঁদা, চোখে গোল কালো চশমা। অঙ্গে ফার-কোটের অবশেষটুকু আছে মাত্র—শতছিন্ন সিল্কের ওপর পাঁশুটে রংয়ের ফারের বদলে অবশিষ্ট কিছু রোঁয়া।

পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলাম কর্কশ কণ্ঠে তীক্ষ্ণ কাটা কাটা কথাগুলো : "এ শহরের শেষ ভদ্রলোকটি মারা গেছে বিশ বছর আগে।..."

তারপর মহিলাটি চীৎকার করে বলে উঠল—কানে কালা বুড়িদের মত :

"বিচার ভবন পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। আমি দেখতে গিয়েছিলাম, শুধু দেওয়ালগুলো আছে। সব পুড়ে গেছে। ভগবানের শাস্তি !..."

বড় বড় জুতো পরা মহিলাটি একটু ঝুঁকে তার কানের কাছে উঁচু গলায় বললো : "আমার সব লোকগুলো জেলে। সব।"—

আমার মনে হলো বৃদ্ধা মহিলাটি যেন হাসছে।

* * *

খুব লোমশ, ছোটোখাটো একটি লোক—মুখটা প্রায় বাঁদরের মত, নাকটা থ্যাবড়া—হাঁটছে তড়িঘড়ি, ছোট ছোট দ্রুত পদক্ষেপে। তার চোখের কালচে নীল তারা দুটি যেন চিন্তায় বড় বড় হয়ে উঠেছে—বৃত্তাকারে তাকে ঘিরে আছে ওপেলের মতো ঝক্‌ঝকে চোখের শাদা অংশ। পরনে চীনের নানকিনী লম্বা কোট—মনে হয় ওটা তার নিজস্ব নয়; জামাটার সব প্রান্তগুলো অসমান ভাবে উল্টে আছে, কোথাও ঝুলে পড়েছে ঝালরের মতো—যেন কুকুরে টানাটানি করেছে। পায়ে তার জমাট পশমের জুতো—তার গোড়ালি গেছে ক্ষয়ে এবং তার মাথায় কোনো টুপিও নেই। এক গোছা পাকা চুল খাড়া হয়ে আছে মাথার ওপরে এবং খুব ঘন লালচে দাড়ি গজিয়েছে সারা মুখ ভরে—চোখের নীচ থেকে, গাল বেয়ে কান পর্যন্ত। বিড়বিড় করে কি যেন বলতে বলতে চলেছে হন্তদন্ত হয়ে, যেন কিছুটা চিন্তিত, প্রায়ই ভঙ্গী করে হাত নাড়ছে এবং আঙুলে আঙুল জড়িয়ে ধরছে।

লোকসভা ভবনের কাছাকাছি এক পার্কে সৈনিকদের সামনে সে বক্তৃতা দিচ্ছিল:

"তোমরা নিশ্চয় বুঝবে—তোমাদেরই বেশী করে এটা বুঝতে হবে: মানুষ তখনই শুধু সুখী—যখন এই কথাটা সে মনে রাখে যে, মানুষের জীবন বড় সংক্ষিপ্ত এবং সেই মতো নিজেকে সে খাপ খাইয়ে নেয়।..."

ক্ষীণ কণ্ঠে খুব নীচু গলায় কথা বলে লোকটি—যদিও তার চেহারা থেকে লোকে আশা করে সে গর্জন করবে। অনবরত সে এক পা থেকে আর এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছে; একটা হাত তার বুকে চেপে ধরা—এবং অন্য হাতের কব্জিটা এমনি ভঙ্গী করে নাড়ছে যেন ঐকতান পরিচালন করছে। হাত দুটোও খুব লোমশ, আঙুলের গাঁটের মাঝে মাঝে কালো চুলের চাপড়া। তার সামনে বেঞ্চিতে বসে তিনজন সৈনিক সূর্যমুখীর বিচি চিবোচ্ছে আর খোসাগুলো ছিটকে দিচ্ছে বক্তার পেটের ওপর, পায়ের ওপর। চতুর্থ সৈনিকের একটা গাল ফুটো, সে সিগারেট খাচ্ছিল আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছুঁড়ে দিচ্ছিল বক্তার নাকের দিকে।

"আমরা এই জনসাধারণ—আমাদের মধ্যে একটা উৎকৃষ্টতর জীবনের আশা জাগিয়ে দেওয়া বৃথা—এই মত আমি পোষণ করি। ওই আশা জাগিয়ে দেওয়া

একটা অমানুষিক ব্যাপার এবং একটা অপরাধ, এ যেন অল্প আগুনে দগ্ধে দগ্ধে মারা।..."

সিগারেটের শেষ অংশটুকুর ওপরে সৈনিকটি থুক্ করে থুথু ফেললে, তারপর দুই আঙুলে সেটা ছিটকে দিলে শূন্যে এবং পা দুটো টানটান করে জিজ্ঞেস করলে বক্তাকে: "তোমায় ভাড়া করেছে কে?"

"কি? আমাকে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—তুমি। কে ভাড়া করেছে তোমাকে?"

"ভাড়া বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ?"

"যা বলছি—তা-ই বোঝাতে চাইছি। বুর্জোয়ারা ভাড়া করেছে—না ইহুদীরা?"

ঘাবড়ে গিয়ে লোকটি চুপ করে গেল। একটি সৈনিক ঢিলে-ঢালা ভাবে পরামর্শ দিলে: "ওর পেটে একটি লাথি কষিয়ে দাও—বাস্।"

অন্য সৈনিকটি জবাব দিলে, "বলতে গেলে ওর কোনো পেটই নেই।"

খুদে লোকটি থমকে দাঁড়াল—হাত দুটো সড়াৎ করে একবার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার বের ক'রে আনল, জোড় করে চেপে ধরল শক্ত করে। বললে: "আমি নিজের কথাই বলছি। আমাকে কেউ ভাড়া করেনি। আমিও চিন্তা করেছি, পড়েছি, বিশ্বাস করেছি। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পেরেছি: মানুষ শুধু কিছু দিনের জন্যই মানুষ, তারপর সব কিছুই শেষ হতে বাধ্য এবং সে-ও ..."

এবার গাল ফুটো সৈনিকটি হুংকার দিয়ে উঠল: "দূর হ।—ভাগ্।"

পশমী জুতোয় ধুলো উড়িয়ে দিয়ে খুদে লোকটি মুখ ঘুরিয়ে এবার ছুটে পালাল। সৈনিকটি তার সঙ্গীদের কাছে মন্তব্য করলে:

"ও ভেবেছিল—আমাদের খুব ঘাবড়ে দিচ্ছে, একটা আস্ত হারামজাদা। যেন ওকে আমরা বুঝতে পারিনি। কিন্তু আমরা সবই বুঝি। বুঝি না?"

ওই দিনই সন্ধ্যের দিকে খুদে লোকটি ত্রোয়িৎস্কি পোলের কাছে এক বেঞ্চিতে বসেছিল: "আমার কথাগুলো বোঝবার চেষ্টা করো," বেঞ্চিতে বসা সঙ্গীদের সে বোঝাচ্ছিল।

"সব দিক বিবেচনা করে দেখলে, বেশীর ভাগ লোকই সরল মনের মানুষ—যাদের আমরা বলি নির্বোধ—আর তারাই সত্যিকারের জীবনের স্রষ্টা। বেশীর ভাগ লোকই নির্বোধ।..."

তার শ্রোতা ছিল পা-বাঁকা, চওড়া ভারিক্কি শরীর জাহাজের এক খালাসী—মুখ ভরা বসন্তের দাগ ; এক সৈনিক ; মোটা মতো এক মহিলা—পরনে নীল রঙের পোশাক ; মাথা ভর্তি পাকা চুল আরও জনা তিনেক লোক—বোধ হয় শ্রমিক এবং কালো চামড়ার জামা পরা এক ইহুদী তরুণ। ইহুদী তরুণটি উত্তেজিত ; লোকটির আসল রূপ টেনে বার করবার মতলবে সে নানা রকম প্রশ্ন করছিল : "তাহলে সর্বহারারাও নির্বোধ—নাকি ?"

"আমি বলছি তাদের কথা যারা চায় খুব অল্পই—চায় শুধু ভালভাবে একটু বেঁচে থাকার মতো একটা ব্যবস্থা।"

"মানে—বুর্জোয়া, নাকি ?"

"একটু থাম কমরেড।" হেঁড়ে গলায় খালাসীটি বললে, "ওকে বলতে দাও। ..."

খালাসীটির দিকে সকৃতজ্ঞে একটু মাথা নেড়ে খুদে লোকটি বলল, "ধন্যবাদ।"

"ও থাক—যা বলবার বলে যাও।"

"মানুষ বোকা—এ কেবল অনুমান মাত্র, কারণ প্রকৃতি তাকে যেটুকু বুদ্ধি দিয়েছে তাতেই সে বেশ সন্তুষ্ট এবং ওটার ব্যবহার কেমন ক'রে করতে হয় তা সে জানে।"

"ঠিক কথা," নাবিক বললে, "বলে যাও।"

"মানুষ সে অল্পদিনের জন্য এবং সে তা জানে ; একদিন তাকে কবরে গিয়ে শুতে হবে বলে সে কিন্তু কোনো ভাবেই উদ্বিগ্ন হয় না। ..."

"আমাদের সকলকেই মরতে হবে ; এ-ও তুমি খাঁটি কথাই বলেছ।" খালাসী বলে উঠলো আবার। চোখ ঠারলে চামড়ার জামা-পরা তরুণটির দিকে। এবং হেসে উঠলো এক প্রাণখোলা হাসি—যেন তার নিজের নশ্বরতার প্রত্যয় সম্পর্কে জগতের কাছে ঘোষণা করতে সে এখুনি প্রস্তুত।

বাঁদর-মুখো বক্তাটি নীচু গলায় এমন ভাবে ক্রমাগত বক্তৃতা দিয়ে চলেছে—যেন তার কথা বিশ্বাস করার জন্য সে তার শ্রোতাদের অনুনয় করছে।

"আশায় পরিপূর্ণ কিন্তু বিক্ষুব্ধ একটা জীবন মানুষ চায় না, রাতের তারাদের তলায় একটা ধীর, শান্তিপূর্ণ জীবন পেলেই সে সন্তুষ্ট।... আমি বলি—পৃথিবীতে এই ক'দিনের একটা জীবনে অসম্ভব কতকগুলো আশা জাগিয়ে তোলা মানে তাদের বিভ্রান্ত করা এবং সমস্ত কিছুকে তাদের কাছে জটিল করে তোলা। কী দেবে তাদের কমিউনিজম ?"

দু-হাতের চেটো হাঁটুর উপর রেখে খালাসীটি বলে উঠল, "অ!" তারপর সামনের দিকে একটু ঝুঁকে খাড়া হয়ে দাঁড়াল, বলল, "এবার তুমি আমার সঙ্গে এসো।"

"কোথায়?" দু-পা পেছিয়ে গিয়ে লোমশ খুদে লোকটি বলে উঠল।

"সে আমি বুঝবো। আর কমরেড, তুমিও এসো আমার সঙ্গে।"

"বিদেয় কর ওটাকে," অবজ্ঞা আর ঘৃণাভরা কণ্ঠে বলে উঠল তরুণটি।

"ইচ্ছে হলে আমার সঙ্গে আসতে পারো!" নীচু গলায় বললে খালাসীটি। তার বসন্তের দাগে ভরা মুখটা যেন আরও কালো হয়ে উঠলো এবং চোখ দুটো কঠিন ভাবে মিটমিট করতে লাগল।

বক্তৃতাবাজ লোকটি একটা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "আমি ভয় পাই না।"

একটা ক্রুশের চিহ্ন এঁকে মহিলাটি মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল, সেনাবাহিনীর লোকটিও তার রাইফেলের নলটা আঙুল দিয়ে একবার পরখ করে নিয়ে বিদায় নিল; ওদিকে অন্য তিনজন শ্রমিক এমন যন্ত্রের মতো এক সঙ্গে উঠে দাঁড়াল যেন ওরা একটি মাত্র ইচ্ছা-শক্তিতে বাঁধা। খালাসী এবং ইহুদী তরুণটি তাদের বন্দীকে নিয়ে পা বাড়াল পিটার-পল দুর্গের দিকে। কিন্তু দু'জন পথচারী—যারা ওদের সঙ্গে সঙ্গে পোলের ওপর পর্যন্ত এসেছিল তারা খুদে দার্শনিকটিকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগল।

"না হে," খালাসীটি প্রতিবাদ করে বললে, "এই খুদে লোমশ পুড্‌ল্ কুত্তাটাকে দেখিয়ে দিতে হবে—মানুষ কতটুকু সময় বাঁচে!"

"আমি ভয় করি নে।" পুড্‌ল্ আবার বলে উঠল নীচু গলায়, তাকালো পোলের তলার জলের দিকে। বললে, "আমি এইটে দেখে অবাক হচ্ছি যে তোমরা কত অল্পই বোঝ।"

হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে সুরু করলো পার্কের দিকে।

"দেখ দেখ, ও পালাচ্ছে!" খালাসীটি বললে, "বোকাটা সরে পড়ছে। হেই—পালাচ্ছ কোথায়?"

"যেতে দাও কমরেড, বুঝতেই পারছ ওর হাল।"

লোমশ খুদে লোকটির পেছনে খালাসীটি শিস্ দিয়ে উঠলো, তারপর হেসে উঠল: "তোর সর্বনাশ হোক! পালাচ্ছে দেখ—মুখে আর রা নেই। খুব সাহসী কুত্তা ··· একেবারে বুদ্ধু।"

*　　　*　　　*

ছোটখাটো বুড়ো মতো একটি লোক, চোখ দুটি তীক্ষ্ণ, মাথায় একটা পুরাতন বিবর্ণ তরমুজ খোলের টুপি, পরনে ফার-কলার দেওয়া লংক্লথের একটা কোট। লোকসভা ভবনের চারদিকে ভীড় করা জনতার মাঝখানে লাফ ঝাঁপ করে বেড়াচ্ছিল। হাতে তার আবলুস কাঠের হাতল দেওয়া একটা লাঠি। এক-একটা দলের সামনে গিয়ে ঘাড় কাৎ করে এবং লাঠির ডগাটা মাটিতে ঠুকে দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল—লোকজন কি বলছে। মুখটা তার গোলাপী রংয়ের, বলের মতো গোল এবং গোল গোল চোখ দুটো জ্বলছে নিশাচর পাখির মতো। বাজপাখির মতো নাকের নীচে খাড়া হয়ে আছে এক গোছা পাকা গোঁফ এবং চিবুকে এক গোছা ফিকে হলদে রংয়ের ছাগুলে দাড়ি। বাঁ হাতের তিনটে আঙুলে দ্রুত দাড়িটাকে পাক দিয়ে মুখে পুরে দিচ্ছে—ঠোঁটে চিবুতে চিবুতে আবার বার করে দিচ্ছে বাইরে—"ফুঃ!..."

লোকজনের ঠাসা ভিড়ের ভেতরে কাঁধের ঠেলা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে—যেন গা ঢাকা দিচ্ছে ওদের মধ্যে। তারপর হঠাৎ এক সময়ে ফেটে পড়ছে তার প্রতিবাদে মুখর আকর্ষণীয় কণ্ঠ: "আমি ভাল করেই জানি—কোন শ্রেণীটা বিশেষ করে আমাদের ক্ষতিকারক।... আমরা নিশ্চয় তাদের ধ্বংস করবো—চুরমার করে দেবো, হাড় গুঁড়িয়ে ধুলো করে দেবো।..."

সৈনিক, শ্রমিক, চাকর-বাকর এবং চরিত্রহীনার দল সব সময়ে তার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে—শুনতে শুনতে মুখ হাঁ হয়ে যাচ্ছে তাদের, যেন উদ্দীপক কথাগুলো গিলে খাচ্ছে। ওদিকে বক্তা বলতে বলতে লাঠিটাকে সোজা তুলে ধরে বুকের কাছে—আঙুলগুলো দ্রুত নড়তে থাকে লাঠির ওপরে—যেন বেহালা বাজাচ্ছে।

"যত্তো রকমের ওই প্রথম শ্রেণীর কেরানী আর কর্মচারী আছে—সব। তোমরাই জানো, আমাদের কাছে ওরা কি বিপদ, কি উৎপাত—ওই সব কর্ম-চারীদের চেয়ে বেশী অবিবেচক, বেশী নিষ্ঠুর আর কে আছে? আদালতের কর্মচারী, গারদের কর্মচারী, রাজস্ব কর্মচারী, কাস্টমের কর্মচারী, খাজনার কর্মচারী—তারা সর্বত্র। আর কি রকম যাদুকর সব! হ্যাঁ—ঠিক যাদুকরের মতোই ওদের বাক্সভর্তি যাদু মজুত আছে! ওরাই হলো পয়লা নম্বর—তাই ও সব কর্মচারীকে আমাদের শেষ করে ফেলতে হবে।"

ওর কথা শুনে একটি মেয়ে, বোধহয় কোনো পরিচারিকা হবে, মাথা ভর্তি লাল চুল, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো:

"জানতে চাই—আপনি নিজে কি ? আপনিও যদি একজন কর্মচারী না হন তো আমাকে গুলি করে উড়িয়ে দেবেন !"

সে তাড়া তাড়ি অভিযোগ অস্বীকার করল এবং একরকম চটেই জবাব দিল : "কখনো আমি গরীব মানুষদের বিরুদ্ধে কিছু করিনি—কখনো না ! আমি একজন গণক—ভবিষ্যৎ বক্তা : আমি জানি ভবিষ্যতে আমাদের কি হবে।..."

এই সময়ে তার কিছু শ্রোতা চীৎকার করে জানাল—তার বিদ্যের কিছু প্রমাণ সে দিক।

"না—ওসব গুহ্য ব্যাপার—সকলের সামনে তা করা যায় না।..."

তবু প্রশ্ন : "কি আমাদের ঘটতে যাচ্ছে—একটু বলুন।" তার উত্তরে সে মাটির দিকে চোখ রেখে বললে :

"খুব খারাপ হয়ে দাঁড়াবে—এখন যে ব্যাপারে তোমরা ঝুঁকি নিয়েছ তাকে যদি এখুনি খতম করতে না পারো তো খুবই খারাপ হয়ে দাঁড়াবে। খারাপ দাঁতকে গোড়া শুদ্ধ টেনে বার করো। সমস্ত কর্মচারীকে একেবারে কেটে শুইয়ে দাও। আর ওই শিক্ষিত লোকগুলিকেও—বুদ্ধিজীবীদেরও—ওরা আমাদের চোখে ধুলো দেয়, যুক্তি দেখায় ; ওদের ষোল আনা রোজগার করে দিই আমরা, আর আমাদের মাইনে দেয় এক পয়সা। হ্যাঁ ! শিক্ষিত এখন আমরা, তাই আমাদের কথা এখন ওদের শুনতে হবে ; ওদের ওপর আমরা এখন আইন চালাবো ! 'বিশুদ্ধ জল' নিয়ে খুব একটা বানানো প্রচার চালিয়েছিল ওরা—সর্বত্র সেঁটে দিয়েছিল বিজ্ঞাপন : 'জল না ফুটাইয়া পান করিবেন না !' হাঃ—হাঃ—হাঃ !"

লোকটা হাসছে না হাঁফাচ্ছে—বোঝা শক্ত, কারণ ওই 'হা হা' শব্দটুকু বুক নয়—বেরিয়ে আসছে যেন তার গোল মুখের ভেতর থেকে।

তারপর মুখভঙ্গী করে বিজয় গর্বে সে বললে :

"আচ্ছা—আমরা জল ফুটিয়ে খাই অথবা খাই না ?"

শ্রোতারা খুব একটা মজা পেয়ে গর্জন ক'রে উঠলো : "আমরা খাই না !"

"আমরা এখনো বেঁচে আছি কি নেই ?"

"বেঁচে আছি !"

"তা হলেই বোঝ ওদের আইনের হাল !—দেখছ তো ? ওদের সকলকে নিপাত করো !..."

তার কর্তব্য যে সে ভালভাবেই সম্পন্ন করতে পেরেছে এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হয়ে হঠাৎ সে ভীড থেকে ঠেলে বেরিয়ে, হাতের লাঠিটা দোলাতে দোলাতে চলে গেল। আবার অন্য একটা দলের কাছে এসে বক্তৃতা সুরু করে দিলে:

"দুটো শ্রেণী আছে—যারা আমাদের কাছে ভয়ংকর প্লেগের মতো।..."

সন্দেহ নেই—এ লোকটিকেও কোনো অন্ধকার কোণায় ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল জীবন, সেখানে গুটিসুটি মেরে কাটিয়েছে সে নিঃসঙ্গ বছরের পর বছর, জমিয়ে তুলেছে ক্রোধের স্তূপ—তারপর প্রতিশোধ নিতে বেরিয়ে এসেছে আজ।

* * * *

এটা স্পষ্ট যে বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ঘৃণা জাগিয়ে তোলার লোকের সংখ্যা খুব অল্প নয় এবং আমার মনে হয় তাদের বেশীর ভাগই এসেছে ঘরের চাকর-বাকর শ্রেণী থেকে—যেমন, বাড়ির দ্বারোয়ান, ভাণ্ডারী, রাঁধুনি এবং এই রকম সব। 'সার্কি মডার্ন'-এ অনুষ্ঠিত এক সভার পর মোটা মতো লাল মুখো একটি মেয়ে সৈন্যদের বলছিল—'প্রভুরা কি ভাবে জীবন কাটান।' কাহিনীতে তার বেশ চাতুর্য এবং সরসতা ছিল কিন্তু তার কথা গুলো ছিল এমন যে, প্রতি দশটার মধ্যে তিনটে শব্দ কাগজে লেখা যায় না। স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ এক ডাক্তারের কাহিনী, দাঁতের এক ইহুদী মহিলা-ডাক্তারের আচরণ, এবং এক অভিনয়-শিক্ষক কি ভাবে তার ছাত্রীদের অভিনয় শেখাতো—এসব যখন সে বলছিল তখন সৈনিকেরা হাসিতে ফেটে পড়ছিল এবং বেশ উপভোগও করছিল।

"এই সব ইতরকে কষে মার লাগাও," গলায় রুমাল বাঁধা রং ময়লা একটি সৈনিক কঠিন কণ্ঠে বলে উঠলো, "মার লাগাও শেষ না হওয়া পর্যন্ত।"

বছর চল্লিশ বয়েস—খোঁড়া মতো একটি লোক, হিজড়ের মতো গোঁফ-দাড়ি শূন্য অন্য একদল লোকের সামনে চেঁচাচ্ছিল:

"আমি জীবন কাটিয়েছি আস্তাবলে, ঘোড়া আর তার মলমূত্রের মধ্যে। আর ওনারা থেকেছেন চমৎকার সব ফ্ল্যাটে এবং নরম সোফায় শুয়ে শুয়ে খেলা করেছেন কোলের কুকুর নিয়ে। ও সব আর চলবে না, এই আমি বলে দিলাম! এখন কোলের কুকুর নিয়ে আমার খেলা করার পালা এবং ওনারা এখন আস্তাবলে গিয়ে কাজ করতে পারেন। কি বলেন?"

এক-চোখ কানা এক যুবতী, গোটা মুখটা তার বোধ করি সালফিউরিক জাতীয় এ্যাসিডে পুড়ে গেছে। অত্যন্ত সাংঘাতিক, নির্মম কণ্ঠে সে বলছিল:

"বাইবেল পড়ে দেখ— কোনো প্রভু আছে কি বাইবেলে ? অবশ্যই সেখানে সেরকম একটিও নেই। সেখানে বিচারক আছেন, ধর্মগুরু আছেন—কিন্তু কোনো প্রভু নেই। যে উপজাতির মধ্যে প্রভু ছিল, ভগবান স্বয়ং তাদের ধ্বংসের নির্দেশ দিয়েছিলেন—ধ্বংস করেছিলেন একটি একটি করে—স্ত্রীলোক, শিশু, এমন কি তাদের ক্রীতদাসরাও বাদ যায়নি। কারণ প্রভুদের মতামত ক্রীতদাসদেরও সংক্রামিত করেছিল এবং তারা আর মানুষ ছিল না।"

"যাও—নিজেকে এবার লটকে দাও ফাঁসীতে," ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন চীৎকার করে বলে উঠলো। কিন্তু মেয়েটি তার সুডৌল বক্ষদেশ দু হাতে চেপে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে বললো, "এগারোটি বছর এক মহিলার পরিচারিকা ছিলাম এবং আমি অনেক দেখেছি। .."

তার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে নিশ্চয়ই সে এমন অনেক দেখেছে যা অক্টেভ মিরাবো যখন তাঁর 'এক পরিচারিকার রোজনামচা' লেখেন তখন তাঁরও ছিল অজ্ঞাত। তার শ্রোতারা শুনছিল তার রহস্যোদ্ঘাটন—কারুর মুখে হাসি নেই, সকলে বিষণ্ণ এবং নিঃশব্দ। শুধু যখন সে চলে গেল—নাক-বোঁচা একজন বেঁটে-খাটো সৈনিক, ঘর্মাক্ত এবং উত্তেজনায় রক্তিম হয়ে মন্তব্য করেছিল :

"অকারণে মেয়েটার মুখটা নষ্ট হয়ে যায়নি দেখছি। .."

সত্যিই আঘাত খাওয়া মানুষ বড় সাংঘাতিক হয়ে ওঠে যখন দণ্ড দেওয়ার এবং প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার সম্পর্কে সে সচেতন হয়ে ওঠে। আমাদের বর্তমান সমাজ-সংস্কারকরা যদি 'নিশ্চিহ্ন কবার শ্রেণী'র মধ্যে এই সব লোকদের তালিকায় অগ্রাধিকার দেন তা হলে অলাভজনক হবে না বোধ করি।

৩১শ পরিচ্ছেদ ॥ হতাশা

অন্ধকারে কাচের শার্সিগুলো নীলাভ হয়ে উঠলো, আমার সঙ্গীর শীর্ণ শুকনো মুখটা যেন পাংলা কুয়াশার আড়ালে আবছা হয়ে গেল—বিশেষ করে তার গর্তে ঢোকা চোখ দুটোয় ছায়া পড়লো আরও গাঢ় হয়ে। এর সঙ্গে মিলে মিশে আরও সংহত হয়ে উঠল তার বন্য উদ্‌ভ্রান্ত চোখের দৃষ্টি। তাব বিষাদনিমগ্ন অনুযোগের কথাগুলো হয়ে উঠলো অধিকতর আন্তরিক। তার কর্কশ কণ্ঠস্বর মোলায়েম হয়ে এল। তার কেশবিরল দাড়ির এক গোছা চুল আঙুলে জড়িয়ে জড়িয়ে সে এমনি পাকিয়ে তুলল যে নিজেই সে কাৎরে উঠল। সে বলল : "প্রায় বছর দশেক আগে আমি একটা স্বপ্ন

দেখেছিলাম—দেখেছিলাম, একটা জাতি স্বাধীনতা-যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে। তখন আমি ছিলাম ওরেলের জেলখানায় এবং ১৯০৫ সালের স্মৃতি তখনো আমার মনে খুব সজাগ। তুমি তো জান ওরেলের বন্দীদের কি নিষ্ঠুর ভাবে মারধর করা হতো? একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে দেখলাম: লোকজনের একটা ছোট-খাটো ভীড়, তাদের মধ্যে বোরিসফ নামে এক মুদ্রাকর, আমার চেলা ছিল সে, —দেখলাম একটা ক্ষতবিক্ষত দেহের ওপর লাঠি দিয়ে খোঁচাখুঁচি করছে। আমি বোরিসফকে জিজ্ঞেস করলাম—কেন তারা ওই দেহটাকে খোঁচাচ্ছে?

'ও একটা শত্রু!'

'কিন্তু ও তো মানুষ, যতো হোক।'

'কী?' বোরিসফ চীৎকার করে উঠল এবং আমার দিকে একটা লাঠি উঁচিয়ে তার সাঙ্গপাঙ্গদের হাঁক দিলে, 'একেও লাগাও মার।'

"কিন্তু হঠাৎ লাঠিটা তার হাত থেকে পড়ে গেল এবং করমর্দনের জন্য সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে। তারপর নাচতে নাচতে ফিস ফিস করে পরমানন্দে বলতে লাগল: 'ওই ওদের দিকে তাকিয়ে দেখ। ওই যে ওরা আসছে। সব চুকেবুকে গেছে; ওরা আসছে।'

"দলে দলে অসংখ্য মানুষ, হেঁটে হেঁটে আসছে সব আমার দল; তাদের হাজার হাজার চোখে আমি একটা অপ্রাকৃত আলো দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম—ওদের ওই চোখেই আছে ওদের গুপ্ত সংকেত: জনতা 'পুনরুত্থিত' হয়েছে। আমি কি বলতে চাচ্ছি বুঝতে পারছ? 'পুনরুত্থিত'—আদর্শগত-ভাবে রূপান্তরিত। যে মুহূর্তে আমি এটা বুঝতে পারলাম সেই মুহূর্তে আমি যেন ওদের সঙ্গে মিলিয়ে গেলাম—যেন আমি জ্বলে উঠে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলাম।"

আমার অতিথি টেবিলে পেন্সিলের একটা টোকা মারল, কান পেতে শুনল আওয়াজটা এবং আবার টোকা দিল।

"এই যে আমি এখন সম্পূর্ণ জেগে আছি—দেখতেও পাচ্ছি বিজয়ী জনতাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে নিজেকে আজ আমার অপরিচিত বলে মনে হয়। ওরা আজও বিজয়ী কিন্তু ওদের মধ্যে সেই নতুন উপাদানটা আর দেখতে পাচ্ছি না—যা আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম এবং ওই উপাদানের মধ্যেই রয়েছে ওদের মূল সত্য—অর্থাৎ আদর্শগত রূপান্তরণ। ওরা বিজয়ী—আমাদের সমকক্ষ করে তোলার জন্য আমি আমার সমস্ত শক্তি ওদের পেছনে নিয়োগ করেছি—কিন্তু ওদের কাছে নিজে আমি এখনও রয়ে গেছি অপরিচিত। এ ভারী অদ্ভুত।"

সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো এবং শুনতে লাগল কানখাড়া করে। উপাসনার ঘণ্টা বাজছে গীর্জায় যেন দ্বিধায়, সসংকোচে। একটা মেসিন-গানের আওয়াজ হচ্ছে পিটার-পল দুর্গে: স্বাধীনতাকে রক্ষা করার যান্ত্রিক তালিম নিচ্ছে সৈনিক এবং শ্রমিকেরা।

"হতে পারে, অন্য অনেকের মতোই বিজয়লাভ যে কী আমি জানি না! আমার সব শক্তি শেষ হয়ে গেছে সংগ্রামে, প্রত্যাশায়! অধিগতকে ভোগ করার ক্ষমতা বা সামর্থ্য শেষ হয়ে গেছে, মরে গেছে। হয়তো এ শুধু দুর্বলতা, শক্তির অভাব। আসল কথাটা হলো এই যে, আমার চার পাশে কত হিংস্রতা এবং কত প্রতিশোধের কাণ্ড আমি দেখছি কিন্তু কোনো আনন্দ পাই নি—সেই আনন্দ যা মানুষকে আদর্শগত ভাবে রূপান্তরিত করে। এবং তাই, বিজয়ে আমার কোনো বিশ্বাসও নেই।"

সে উঠে দাঁড়াল, চারদিকে চোখ ফিরিয়ে একবার দেখল, মিটমিট করে তাকিয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে এবং আমার হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে: "নিজেকে বড় হতভাগ্য বলে মনে হয় আমার। আমেরিকায় পৌঁছে কলম্বাস যদি অসহ্য একটা অবস্থার মুখোমুখি হতো তা হলে তার যে হাল হতো—এও তেমনি।"

তারপর সে চলে গেল।

* * *

আজকাল অনেকেই ও রকম বোধ করছে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পাহারাদার কুকুরের যে হাল হয়—তেমনি সকলকে দেখেরগ গর্ করা এবং ডেকে ওঠা—যৌবনকাল থেকে ওতেই ছিল সে অভ্যস্ত এবং তার কর্তব্যের নিষ্ঠা সম্পর্কে ছিল অবিচলিত এক বিশ্বাস—যদিও এর জন্য পুরস্কার পেয়েছে সে লাথি ঝাঁটা মাত্র। তারপর হঠাৎ কুকুরটি বুঝতে পারল—এতদিন পাহারা দেওয়া বা রক্ষা করার মতো বাস্তবিক কিছুই ছিল না। তাহলে কেন সে তার ঘরে নৈতিক বাধ্যতার শেকলে বাঁধা থেকে সারা জীবন কাটিয়ে দিল এই কর্তব্যে? বেচারী বৃদ্ধ সৎ জন্তুটা একটা অবর্ণনীয় আঘাত তো পাবেই।...

ওই ধরনের আর একজন লোক বিপ্লব সম্পর্কে বলেছিল:

"রোমান্টিক প্রেমিকের মতো আমরা তাকে ভালো বেসেছিলাম; কিন্তু তারপর এমন একজন এসে হাজির হলো যে সাহস আর ঔদ্ধত্যের সঙ্গে আমাদের প্রিয়তমার ওপর করে বসলো বলাৎকার।..."

*　　　　*　　　　*

ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে রাশিয়ার জনপ্রিয় লোকজীবনের অভিজ্ঞতার মিলন বিষয়ে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

এক ধোপানী, ফিরিঙ্গি ব্যাধিতে চেহারা তার বিকৃত—ইতিমধ্যেই নাকের জায়গায় দেখা যায় শুধু একটা গর্ত, একদিন মহিলা-ডাক্তার ই. ইউ. ডি-কে বলেছিল: "মানুষকে সুস্থ করে তুললে সে যে কি খুশি হয়—তার কিছু অভিজ্ঞতা আমারও হয়েছে কমরেড। গতকাল ইলেকট্রিক সেনট্রাল স্টেশনে গিয়েছিলাম একজনের হার্নিয়া সারিয়ে, পুরস্কার পেয়েছি একটা পঁচিশ বাতির আলো।"

৩২শ পরিচ্ছেদ ।। স্বচ্ছ দৃষ্টি

আমাদের রেলগাড়ির কামরার পাশের বগিটা দুলে উঠলো এবং তার চাকার ডাণ্ডিটা বিরক্তিতে যেন আর্তনাদ করে উঠলো:

"রিগা—ইগা—ইগা—ইগা ..."

তারপর চাকাগুলো সমস্বরে যেন বলে উঠলো:

"সঙ্গী—চলো, জলদি—চলো, সঙ্গী চলো—জলদি চলো।"

আমার ভ্রমণ-সঙ্গী ছিলেন এক বৃদ্ধ—এমন ফ্যাকাসে এবং বিবর্ণ যে বোধ করি উজ্জ্বল সূর্যালোকে তাঁকে অস্পষ্ট ঠেকবে। তাঁকে দেখে মনে হয়—কুয়াশা আর ছায়া দিয়ে তিনি তৈরী; তার মুখের চেহারা বর্ণনাতীত—তাতে মিশে আছে ক্ষুধার চিহ্ন, ভারী দুটো চোখের পাতা বন্ধ, কপোল কুঞ্চিত এবং জট পাকানো দাড়ি যেন শণ দিয়ে তাড়াহুড়োয় তৈরী। একটা ধূসর রঙের দুমড়ানো টুপি সবটাকে এ বিষয়ে আরও লক্ষ্যণীয় করে তুলেছে। তাঁর গা দিয়ে বেরুচ্ছে ন্যাপথ্যালিনের গন্ধ। পায়ে পা জড়িয়ে বসেছিলেন সীটের এক কোণায়। একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে নখের ময়লা সাফ করতে করতে কর্কশ গলায় বিড় বিড় করে বললেন;

"সত্য হলো বিশ্বাসের আবেগে পরিপূর্ণিত একটা মতামত—আস্থা।"

"সব মতামতই কি তাই?"

"হ্যাঁ সবই।"

রিগা—ইগা—ইগা—ইগা।... চাকার ডাণ্ডিতে শব্দ উঠছে।

জানালার বাইরে হেমন্তের সকালের অস্পষ্ট আলোয় গাছের কালো কালো ডাল-পালাগুলো আন্দোলিত হচ্ছে; কচি কচি পাতায় মর্মরধ্বনি।

"ধর্মোপদেষ্টা জেরেমিয়া বলেছেন : 'বাপ খায় আঙুর আর টক গন্ধে শিরশিরিয়ে উঠলো ছেলের দাঁত। আমাদের ছেলেদের বেলায় কথাটা সত্যি, ওদের দাঁত উঠেছে শিরশিরিয়ে। আমরা খেয়েছি কড়া বিশ্লেষণের টকো আঙুর, আর ওরা তার পরবর্তী প্রত্যাখ্যান এবং অবিশ্বাস দুটোকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছে।"

ওভারকোটের প্রান্তটা হাঁটুর ওপরে জড়িয়ে নিয়ে এবং তেমনি দেশলাই কাঠি দিয়ে এক মনে নখ খুঁটতে খুঁটতে তিনি বলে চললেন :

"রেড আর্মিতে ঢোকার আগে আমার ছেলে আমাকে বললে : 'আপনি একজন সৎ মানুষ। আপনি আমাকে এইটে বলুন : আপনাদের কালের মানুষেরা অনেক বছর ধরে অনেক রকম সমালোচনায় জীবনের সব পুরানো ভিত্তি তত্ত্বগত ভাবে ধ্বংস করে দিয়েছেন ; তাহলে আজও আপনারা গোঁ-ধরে রক্ষা করতে চাচ্ছেন কোন বস্তুটাকে ?' আমার ছেলে খুব চতুর নয়, তার চিন্তার ধারা গড়ে উঠেছে অপটুভাবে, বইয়ের মতো ভারিক্কী চালে। কিন্তু ছেলেটা খুবই সৎ। লেনিনের থিসিস প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বলশেভিক হয়ে যায়। আমার ছেলে ঠিক কথাই বলেছিল—কারণ সে বিশ্বাস করতো প্রত্যাখ্যান এবং ধ্বংসের শক্তিতে। বাস্তবিক পক্ষে আমিও মেনে নিয়ে ছিলাম বলশেভিজমকে কিন্তু আমার হৃদয় তাকে গ্রহণ করতে পারেনি। প্রতিবিপ্লবী হিসেবে আমি যখন চেকায় ধরা পড়লাম—হাকিমের কাছে সে কথা আমি স্বীকার করেছিলাম। হাকিমটি ছিলেন খুবই অল্প বয়স্ক, বাবু-বাবু। স্পষ্টই বোঝা যায় আইনের ছাত্র, বেশ নিপুণ ভাবেই আমাকে জেরা করেছিলেন। উনি জানতেন—জুডেনিচের লড়াইয়ে আমার ছেলে মারা গেছে। তাই আমার সঙ্গে ব্যবহারও করছিলেন নম্র ভাবে। অবিশ্যি, আমার সব সময়ে মনে হচ্ছিল—উনি আমাকে গুলি করতে পারলে আরও খুশি হন।

"আমার ওই হৃদয় এবং যুক্তি-বোধের যে বিরোধ—তার কথা যখন তাঁকে বললাম তখন তিনি তাঁর সামনের কাগজপত্রে টোকা দিতে দিতে ভাবিত হয়েই বললেন : 'হ্যাঁ—আপনার ছেলেকে লেখা এক চিঠি থেকে তা আমরা জেনেছি, কিন্তু তাতে বর্তমান অবস্থার কোনো সুবিধে হয় না।'

'আপনারা আমায় গুলি করে মারবেন ?' জিজ্ঞেস করলাম।

"তিনি জবাব দিলেন, 'এই ঝঞ্ঝাটের ব্যাপারে আপনি যদি কোনো সাহায্য করতে না পারেন তো সেইটের সম্ভাবনাই বেশী।' একটু সপ্রতিভ হেসে

কোনো কিছু না রেখে-ঢেকেই তিনি বললেন মনে হয়—আমিও হাসছিলাম, কর্তব্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা আমার ভাল লেগেছিল। তাঁর সুবিধের জন্যেই আমার ফয়সালা একটা করে দিলেন শুধু একটি কথা বলে—যেন কথাটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বললেন: 'বোধ হয় আপনার পক্ষে মরাই ভালো—আপনি তাই ভাবেন না? নিজের মধ্যে এই রকম বিরোধ নিয়ে বাঁচা—এ বড় যন্ত্রণা-দায়ক।' এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও বললেন, 'আমায় ক্ষমা করুন এ কথা বলছি বলে। আপনার বিচারের সঙ্গে এর যথার্থ কোনো সম্পর্ক নেই।'

··· ইগা—রিগা—রিগা—ইগা।—চাকার ডাণ্ডি শব্দ করে চলেছে।

একটা হাই তুলে এবং শিউরে কেঁপে উঠে আমার সঙ্গী জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। বন্ধ শার্সির ওপরে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ঝরে পড়ছে।

"কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাকিম আপনাকে তো ছেড়েই দিয়েছে—তাই না?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। আমি এখনো বেঁচে।"

তাঁর শণের মতো দাড়িতে ভরা মুখটা আমার দিকে ফিরিয়ে একটু তাচ্ছিল্য ভরা হাসি হেসে এবং কিছুটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতেই বললেন;

"অনুসন্ধানের আগে কয়েকটা প্রশ্নে আমি তাঁকে পরিষ্কার ভাবে জিনিসটা বুঝবার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলাম—তাই। ···"

'সঙ্গী চলো—জলদি চলো, সঙ্গী চলো—জলদি চলো'—রেলগাড়ির চাকায় উঠছে দ্রুততালের শব্দ। বৃষ্টি জোরে নামল, চাকার ডাণ্ডি আরও জোরে শব্দ করে উঠছে: ইগুই ··· ইগুই ··· ইগুই ·· ইগুই। ··

৩৩শ পরিচ্ছেদ ॥ জীবন্ত ডিনামাইট

সোরমোভোর শ্রমিক মিটিয়া প্যাভলোফ ছিল আমার দেশের মানুষ। সম্প্রতি এলেৎজে সে টাইফাস রোগে মারা গেছে।

১৯০৫ সালে মস্কো অভ্যুত্থানের দিনে পিটার্সবার্গ থেকে বড় এক বাক্স ডিনামাইট এবং পনেরো মিটার বিকফোর্ড ফিউজ তার বুকে জড়িয়ে সে হাজির করেছিল। ঘামে ভিজেই হোক বা জোরে বাঁধার জন্যেই হোক—লোকটার বুকের পাঁজরায় চেপে বসেছিল ফিউজের তার। যাই হোক, আমার ঘরে ঢুকেই মিটিয়া শ্রান্তভাবে ঢলে পড়লো। তার মুখ হয়ে উঠেছে নীল, চোখ দুটো বেরিয়ে এসেছে ঠেলে—যেন দমবন্ধ হয়ে এখুনি মারা যাবে।

"তুমি একেবারে পাগল মিটিয়া ! তুমি বুঝতে পারলে না যে রাস্তাতেই তুমি শেষ হয়ে যেতে পারতে ? নিজেই একবার অনুমান করে দেখ—কি কাণ্ড ঘটতো তাহলে তোমার।"

কষ্টে নিঃশ্বাস নিতে নিতে অপরাধীর মতো সে বলল :

"হ্যাঁ, আমরা তাহলে ফিউজ তার আর ডিনামাইটগুলো হারাতুম।"

এম. এম. তিখভিনিস্কিও জোরে তার বুক ঘষতে ঘষতে খুব রূঢ় ভাবেই বকতে লাগল—আর মিটিয়া তখন দুচোখ আধ-বোজা করে জিজ্ঞেস করল :

"আচ্ছা—ওতে কতগুলো বোমা তৈরী হতে পারে ? আমরা কি হেরে যাবো ? প্রিয়েসনিয়া (মস্কোর একটা অঞ্চল) কি এখনও আমাদের দখলে ?"

কিছুক্ষণ পরে তিখভিনিস্কি বিস্ফোরকগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগল আর মিটিয়া সোফায় শুয়ে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমাকে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল :

"উনি বোমা তৈরী করেন ? উনি কি অধ্যাপক ? একদিন শ্রমিক ছিলেন ? সত্যি বলছ !"

তারপর হঠাৎ সে চিন্তান্বিত কণ্ঠে বললে, "উনি নিশ্চয় তোমাকে উড়িয়ে দেবেন না—না কি বল ?"

তার নিজের সম্বন্ধে একটি কথাও নেই—কি বিপদের হাত থেকে আজ সে রক্ষা পেয়ে গেছে সে সম্পর্কে একটি কথাও না।

৩৪শ পরিচ্ছেদ ॥ নাগরিক এফ. পপোফের চিঠি

"জীবনে বেঁচে থাকার সংগ্রাম যে অবধারিত—সুপ্রসিদ্ধ ডারুইন সে সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। সে সত্যকে মেনে নিয়েই—যারা দুর্বল অর্থাৎ যারা কাজকর্মে অক্ষম তাদের একেবারে বরবাদ করে দেওয়ার ব্যাপারে এখনও কিছুই করা যাচ্ছে না। ডারুইনের বহু শতাব্দী আগে সেই সুদূর প্রাচীন কালেও এমন সব ঘটনা ঘটত : বৃদ্ধদের ধরে সঙ্কীর্ণ গিরিসংকটে ফেলে দেওয়া হতো যাতে সেখানে তারা অনশনে মরে অথবা গাছের ওপর দিয়ে এমন ভাবে হাঁটতে বাধ্য করা হতো যাতে তারা পড়ে গিয়ে ঘাড় মটকে মরে। এ সব বিচার করে বলতে পারি যে, বিজ্ঞান আজ আমাদের প্রাচীন নৈতিক বিলাসকে অতিক্রম করে গিয়েছে। তবে অযথা নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েই অবশ্য আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি রাখছি : যে-সব লোক সামাজিক লাভজনক

কাজ করতে পারবে না তাদের মোলায়েম কোনো পন্থায় নিঃশেষ করে ফেলা উচিত ; দৃষ্টান্ত হিসাবে বলি, সুস্বাদু কোনো জিনিস—যেমন, মাংস অথবা মিষ্টি কেকের সঙ্গে স্ট্রিকনাইন বিষ মিশিয়ে অথবা সেঁকো যখন আরও সস্তা তখন ওই বিষ মিশিয়ে খাইয়ে দেওয়া উচিত। বেঁচে থাকার যে সংগ্রাম এখন সর্বত্র বিদ্যমান—তাকে এই ধরনের মানবীয় পন্থা মোলায়েম করে দেবে।

"এই একই পন্থা নির্বোধ, গ্রামের জড়বুদ্ধি, পঙ্গু এবং যারা ক্ষয়রোগে অথবা ক্যানসারের মতো দুঃসাধ্য রোগে ভুগছে তাদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা উচিত।

"বলা বাহুল্য, এই ধরনের আইন আমাদের ছিঁচকাঁদুনে বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণ করবে না ; কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শের কথা বিচার করে এখুনি তা বন্ধ করার উপযুক্ত সময়।"

৩৫শ পরিচ্ছেদ ॥ কবিতা ও শিকার

জুলাইয়ের মধ্যাহ্ন সূর্য প্রচণ্ডভাবে জ্বলছে পেতলের মতো আকাশে। গোটা সহরটা হাঁসফাঁস করছে গরমে, বোবা হয়ে গেছে—যেন নিস্তব্ধতায় সমাধিস্থ। মাঝে মাঝে স্তব্ধতাকে ভেঙে দিচ্ছে প্রলাপের মতো অস্পষ্ট আওয়াজ। একটা নাকি মিহি সুরে গানের কলি কয়েকটা কেঁপে উঠছে বিষণ্ণ তরঙ্গে :

'রূপালী নদীর সোনালী বালির তীরে
খুঁজে ফিরি এক রূপসী মেয়ের
পায়ের চিহ্নটিরে।...'

একটা মোটা হেঁড়ে গলা কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো :

"এত বেলায় তুমি করছ কি হে ?"

"এই একটু শিকারের মতো—"

"কটা হলো ?"

"তিনটে।"

"চেঁচামেচি করেনি ?"

"কেন করবে ?"

"তুমি বলতে চাও—তারা কোনো গোলমালই করেনি ?"

"কিচ্ছু না। ওরা সাধারণত গোলমাল করে না ·· ওদের নিজেদের একটা নিয়ম আছে। সেই নিয়ম মাফিক ওরা বুঝতে পারে—কোনোরকম গণ্ডগোল এসে পড়লে ফয়সালা একটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবেই।"

"ভদ্রলোক ?"

"না—অন্তত আমার তো তাই মনে হয়। খাদটা পার হয়ে ওরা সামনে এল—তাতে মনে হয় ওরা সাধারণ লোক।"

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা—তারপর তরঙ্গিত হয়ে উঠলো গানের বিষণ্ণ লহরী :

'উজ্জ্বল চাঁদ সঙ্গে আমার চলো ...'

"গুলি চালিয়েছ নাকি ?"

"কেন চালাবো না ?"

'অন্তরালে সে কোথায় লুকালো বলো ? ...'

হেঁড়ে গলা ঠাট্টা করে বললো :

"এখানে তুমি 'রূপসী মেয়ের' গান গেয়ে বেড়াচ্ছ আর ওদিকে তোমার ছেঁড়া জামা তোমাকেই সেলাই মেরামত করতে হবে। উজবুক আর কাকে বলে !"

"কটা দিন সবুর করো—সময় হলেই মেয়ে হাজির হবে। সব কিছুই হাজির হবে।..."

'হে মৃদুল হাওয়া, জানাও সঙ্গোপনে
কি কথা সে ভাবে অলস অন্যমনে। ...'

৩৬শ পরিচ্ছেদ ॥ নাস্তিকতা—বিবাহ—নাচ

বিরাট হল-ঘরের থামগুলো সব লাল শালুতে ঢেকে দেওয়া হয়েছে এবং তার ওপরে সাজানো হয়েছে নরম সবুজ বার্চ গাছের পাতা। পাতার ভেতর থেকে ঝল্‌কে উঠেছে সোনালী অক্ষরের লেখা :

'সর্বহারা দীর্ঘজীবী হোক।'...

জানালা দিয়ে বয়ে আসছে নবীন বসন্তের বাতাস। বাইরে চোখে পড়ে গাছের ছায়া আর মাথার ওপরে তারার দল। ঘরের ভেতরে এক কোণের দিকে কালো ছায়ার মতো একটি লোক তার দীর্ঘ শীর্ণ গলাটি হেলিয়ে দুলিয়ে লম্বা রোগা রোগা আঙুলগুলো দিয়ে ঘা দিচ্ছে পিয়ানোর পর্দায়। নাবিক এবং শ্রমিকের দল দেহে মোচড় দিয়ে পিছলে পিছলে যাচ্ছে মেঝের ওপর। তাদের হাত বেষ্টন করে রয়েছে নানা রংয়ের পোশাকে সজ্জিত তরুণীদের কটিতট, ওদের পা নড়ছে এদিক ওদিক—পায়ের তাল পড়ছে সশব্দে। সবটা ভয়ানক কলমুখর এবং উৎসবে উচ্ছল।

"গ্র্যাং রং নাচ—ওরে শয়তানরা !" হতাশ ভাবে চেঁচিয়ে উঠল বিশালকায়

এক যুবক। পায়ে তার শাদা জুতো, গায়ে নীল রংয়ের জামা , এক গোছা চুল কপালে এসে পড়েছে যেন বিদ্রোহ ভরে, ভুরু থেকে গাল পর্যন্ত একটা লম্বা কাটা দাগ। "থামো থামো! মানে ···'গ্র্যাং রং' আমি বলতে চাইনি—ওই যে সেই আর একটা কি নাচ। ওই যে কি বলো তোমরা? হাত ধরো—গোল হয়ে ঘোরো।"

ওরা চেঁচামেচি করতে করতে নাচের জন্য গোল হয়ে দাঁড়াল। তারপর একটা বিচিত্র বর্ণের লাট্টু যেন পাগলের মতো ঘুরতে লাগল, ওদের গোড়ালির চাপে মেঝেটা যেন আর্তনাদ করে উঠলো, বেলোয়ারী ঝাড়ের কাচের ঝুরিগুলো যেন সভয়ে ঠুন ঠুন করে উঠলো।

থামের পেছনে লাল রংয়ের নিশানটার আড়ালে নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে আশ্রয় নিয়েছে এক যুগল। নায়ক চওড়া কাঁধ তরুণ এক নাবিক—বুকের বোতাম খোলা, মাথায় লাল চুল, মুখে বসন্তের দাগ—পাশে তার কোঁকড়া চুল, নীল পোশাক পরা বেঁটেখাটো একটি মেয়ে। তার ছোট ছোট ধূসর চোখ দুটিতে বিস্ময়। বোধ করি এই সব-প্রথম মস্ত ভালুকের মতো এক তরুণ তার সামনে আনত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে, সহৃদয় চোখে তাকিয়েছে তার চীনে পুতুলের মতো টুকটুকে মুখটার দিকে। একটা শাদা ক্যামব্রিকের রুমাল ঘুরিয়ে সে নিজেকে বাতাস করছিল আর একভাবে চেয়ে ছিল মিটমিট করে। স্পষ্টই তাকে খুব খুশি মনে হচ্ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয়ও।

"ওলগা স্টেপানোভনা, আমাদের ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারটা আর একবার এসো আলোচনা করে নিই।" ·

"বাব্বাঃ—একটু থামো, এত গরম লেগেছে ·"

"গরমে কাবু হচ্ছ। ·· শোন, আমরা ধরে নিলাম ঈশ্বর আছেন। কিন্তু ঈশ্বর, সে তুমি যাই বলো, একটা কাল্পনিক ব্যাপার—আর আমি একটা বাস্তব সত্য, যার সম্পর্কে বোধ করি তুমি খেয়ালই করছ না। · "

"তা মোটেই না। ·"

"আমায় ক্ষমা করো। কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না—তোমার মতামতগুলো মোটেই প্রশংসার যোগ্য নয়। তোমার কল্পনার বস্তু তোমাকে একটা অজানা শূন্যতার মধ্যে, একটা অসহায়তার মধ্যে টানছে—অন্যদিকে এই যে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা মানুষ, যে তোমার জন্য আগুনের মধ্যে দিয়েও ছুটে যেতে প্রস্তুত। ··"

"দাঁড়াও—মেয়েদের সামনে সার দিয়ে দাঁড়াও!" সেই বিশালকায় তরুণ নেতা এই সময়ে প্রচণ্ডভাবে হুংকার দিয়ে উঠলো, তার বিরাট বাহু দুটো আন্দোলিত হলো মাথার ওপরে! "ছুটে যাও সবাই—প্রত্যেকটি থামের চারদিক ঘিরে আটজন করে—!"

"ওলগা স্টেপানোভনা, যদি অনুমতি দাও!"

মেয়েটির কটি বেষ্টন করে শূন্যে তুলে ধরলো নাবিক—পা দুটো তার ঝুলতে লাগলো শূন্যে। সেই অবস্থায় তাকে বয়ে নিয়ে গেল নাচের হুল্লোড় আর ঘূর্ণির মধ্যে।

খানিকবাদে আবার দেখা গেল—মেয়েটি জানালার কাছে বসে দম নিচ্ছে আর তার সঙ্গী দাঁড়িয়ে আছে সামনে, নীচু গলায় কথা বলছে খুব বুঝিয়ে সুঝিয়ে:

"আমরা অবশ্য একটা নতুন জাতির মানুষ, স্পষ্ট কথা বলি আমরা, সিধে মানুষ; আমরা আর যাই হই না কেন, আমরা পশুও নই—শয়তানও নই।.."

"আমি যেন ওই সব কথা কখনো বলেছি! ও রকম কথা আমি কখ্খনো বলিনি।.."

"আমায় বলতে দাও। গীর্জাতে গিয়ে বিয়ের জন্যে যদি জেদ করো—অবিশ্যি, ও নিয়ে গোলমাল করে লাভ নেই; কিন্তু এখানকার এই সব ছোকরারা আমাকে নিয়ে খুব ঠাট্টা করবে।.."

"সে কথা ওদের না বললেই হলো।..."

"মানে—লুকিয়ে বিয়ে করতে বলছ? আমি তোমার জন্যে নাস্তিকতার বিরুদ্ধে সে অপরাধও করতে প্রস্তুত।... যদিও এ কথা তোমাকে বলতে আমার দ্বিধা নেই ওলগা, আমাদের এখন—এই মুহূর্ত থেকেই নাস্তিকতার অভ্যাস করা ভালো। সত্যিই তাতে ভালো হতো। কোনো ভয় না করে আমাদের জীবনে নিজেদের ওপরেই শুধু আস্থা রাখা উচিত ওলগা স্টেপানোভনা। ও সব অনেক হয়ে গেছে! এখন শুধু নিজেকে ছাড়া আর কারুকে এবং কোনো কিছুকে ভয় করবার নেই।... কি কমরেড? কথা বলছ না যে! কী চাইছ তুমি—জিজ্ঞেস করতে পারি কি? বোধ করি এই?—"

সে একটা ঘুষি তুলে দেখাল—যার ওজন অন্তত সের দশেক হবে।

ঠিক তখনই হলের মাঝখান থেকে হুংকার দিয়ে উঠলো উৎসবের নেতা সেই দীর্ঘকায় তরুণ:

"মেয়েদের সামনে থেকে হটো পেছনে, হটো দু'পা—মাথা নোয়াও—এক—দুই! মেয়েরা তাদের রুচি মাফিক সঙ্গী বেছে নেবে। কোনো জুলুম চলবে না!—না!…"

৩৭শ পরিচ্ছেদ ।। চিন্তার সাদৃশ্য

চিন্তার বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায় কখনো কখনো: ১৯০১ সালে আরজামাসে পাদ্রী ফিয়োদর ভ্‌লাদিমিরস্কি চর্বিতচর্বন এই উক্তিটি করেছিলেন:

"প্রত্যেক জাতিরই আছে একটা বিশেষ ভাবগত আদর্শ—জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা দৃষ্টি। কোনো কোনো মহৎ চিন্তাশীল একে বলেছেন 'জাতির স্বভাবসিদ্ধ' বোধ-শক্তি। 'স্বভাবসিদ্ধ' কথাটা বোধ করি এই প্রশ্নই তুলে ধরে—'একজনের কেমন ক'রে বাঁচা উচিত।'—কিন্তু পক্ষান্তরে 'কিসের জন্য একজন বাঁচবে' এই প্রশ্নের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও যুক্তির একটা অস্ফুট যন্ত্রণা আমার মনকে বিদ্ধ করছে। আমি বলি, কার্যকরী উদ্দেশ্যের একটা দৃষ্টি আমাদের—রাশিয়ানদের আছে—যেটা এখনও অবিকশিত! কারণ আমরা এখনও সংস্কৃতির সেই শিখরে উঠতে পারিনি যেখান থেকে আমরা পূর্ণ মনুষ্যত্বের ইতিহাস-নির্দেশিত পথটা দেখতে পাব এবং সে-পথে অগ্রসর হব। আমার মত অবশ্য এই যে, আমরা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী এই প্রশ্নটা নিয়েই ক্লিষ্ট: 'কিসের জন্য আমরা বাঁচবো?' ইতিমধ্যে আমরা বেঁচে আছি অন্ধের মতো, হাতড়ে বেড়াচ্ছি অন্ধকারে এবং মরছি গোলমাল করে; তথাপি আমরা একটা জাতি—তার ইতিহাস আছে, তার ভবিষ্যৎ আছে। …"

এর পাঁচ বছর পরে, বোস্টনের প্রয়োগবাদী দার্শনিক উইলিয়াম জেমস এক মন্তব্য করেছিলেন:

"রাশিয়ার বর্তমান ঘটনাবলী সারা পৃথিবীতে তার সম্পর্কে একটা কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে। কিন্তু আমার কাছে সে তাতে আরও কম বোধগম্য হয়ে পড়েছে। আমি যখন রাশিয়ার লেখকদের লেখা পড়ি তখন তাঁদের সৃষ্ট দুঃসহ চিন্তাকর্ষক চরিত্রগুলোর সামনা-সামনি গিয়ে দাঁড়াতে হয় কিন্তু আমি জোর করে বলতে পারিনে যে, আমি তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি। ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় আমি দেখেছি—সেখানকার লোকজন যে কোনো বিষয়েই জ্ঞানলাভ করুক, তার যেটুকু আয়ত্ত হয়েছে তারই ওপর নির্ভর করে বাড়িয়ে চলেছে সব কিছু—যার একটা বাস্তব ও ভাবাদর্শগত অর্থ আছে! অন্যদিকে

আপনাদের দেশের মানুষদের সম্পর্কে আমার মনে হয়েছে—বাস্তবতা সম্পর্কে তাদের কোনো বাধ্যতা নেই, নীতিগত আনুগত্য নেই—বরং আছে প্রায় বিরোধ। আমি দেখতে পাচ্ছি—একটা অনুসন্ধান এবং বিদ্রোহের ভাব নিয়ে রাশিয়ার মন অত্যন্ত সতর্ক ভাবে বিশ্লেষণ করে। কিন্তু আমি সেই বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনে, দেখতে পাইনে—বাস্তবের অভিব্যক্তির তলায় কি তারা অনুসন্ধান করছে। একজনের এমন মনে হতে পারে যে, আঘাত দিতে, আবিষ্কার করতে এবং যা কিছু অপ্রীতিকর ও নেতিবাচক তাকে প্রকাশ করতে রাশিয়ার মানুষ নিজেকে খুব যোগ্য বলে মনে করে। বিশেষ করে দুটো বই আমার চোখে লেগেছে—একটা টলস্টয়ের 'রেজারেকশান'—অন্যটি ডস্টয়েভস্কির 'কারামাজোভ।' আমার কাছে মনে হয়েছে—ওই দুটি গ্রন্থের সৃষ্ট চরিত্র-গুলো সব অন্য জগতের অধিবাসী—যে জগতে সবই আলাদা, সবই ভালো। একটা দুর্ঘটনায় যেন তারা এই পৃথিবীতে এসে পড়েছে—এবং তার জন্যে তারা ক্ষিপ্ত, প্রায় অসম্মানিত বোধ করছে। তাদের মধ্যে একধরণের ছেলেমানুষি ও সরলতা লক্ষ্যণীয়। এই প্রসঙ্গে এক মহৎ রাসায়নিকের একগুঁয়েমীর গল্প মনে পড়ে যায়—তাঁর বিশ্বাস ছিল "সমস্ত কারণের মূলীভূত যে কারণ তা আবিষ্কারে তিনি সক্ষম। ভারী আকর্ষণীয় একটা জাতি আপনাদের ; কিন্তু আমার মনে হয় 'নেই মানুষের এক রাজ্যে' অনাবশ্যক একটা যন্ত্রের মতো আপনারা বৃথাই কাজ করে যাচ্ছেন। অথবা, এমনও হতে পারে যে, একটা অপ্রত্যাশিত কোনো কিছু দিয়ে পৃথিবীকে হতবাক্ করে দেওয়ার জন্য আপনারা বিধি-নির্দেশিত। ..."